শতরঞ্জি

উত্তরবঙ্গে জীবন-জীবিকা

বর্ষ ৫ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদক

সাকিল মাসুদ

শতরঞ্জি
উত্তরবঙ্গে জীবন-জীবিকা
বর্ষ ৫ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদনা পর্ষদ
নিখিলেশ রায়
কবি ও উপাচার্য, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত
নূরুননবী শান্ত
কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও লোকগবেষক, বাংলাদেশ

সম্পাদক
সাকিল মাসুদ

সহযোগী সম্পাদক
ঝুমা ব্যানার্জি, কলকতা, ভারত
তাপস মাহমুদ, রংপুর
অম্বরীশ ঘোষ, আলীপুরদুয়ার, ভারত

প্রচ্ছদ
বেনামিবাউল

মূল্য
৩০০/- $15

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৪খ্রি.

দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

বিপণন, বিজ্ঞাপন, মুদ্রণ ও সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, শতরঞ্জি
আইডিয়া প্রকাশন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০, বাংলাদেশ।
+৮৮ ০১৭২৬ ৯৭৬ ৯৮২ sataranji20@gmail.com

সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই ছোটকাগজে প্রকাশিত লেখার কোনো অংশের প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদকীয়

জীবনের বিবর্তন ও যাপনের মানোন্নয়নের প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন শহরতলিতে গড়ে উঠেছে দু-চারটি উঁচু ভবন, পোশাকে এসেছে কিছুটা আধুনিকতার ছাপ। তবে, ভাওয়াইয়ার ঢেউয়ে ভেসে চলে এই জনপদের স্মৃতি, সংস্কৃতি আর শিকড়ের গভীর টান। গ্রামগঞ্জের হাটবাজার, ক্ষেত-খামার কিংবা সাধারণ মানুষের বাসস্থানে এপার ও ওপার– দুই বাংলার উত্তরবঙ্গের দৃশ্যপট অভিন্ন।

এখনো এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে কৃষি, মজুরি, হকারি বা হাকডাক এবং ক্ষুদ্র লোকশিল্পের সঙ্গে। যেমনটা এপারে দেখা যায়, তেমনি ওপারেও। এপারের মানুষ যেমন নাপাশাক, সিদল, শোলকা প্রভৃতি খাবার খায় তেমনি ওপারের মানুষও খায়।

উত্তরবঙ্গে ভাষার উচ্চারণে কিছুটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা ভৌগলিক কারণে। তবে আব্বা, মাও, বাহে, তুই-মুই, যাঙ নাই, খাঙ নাই, পাঙ নাই... শব্দগুলো দু'পারের উত্তরবঙ্গে মানুষের মায়ের মুখের বুলি।

মূলত রাজনৈতিক ভাগের কাঁটাতারই আজ উত্তরবঙ্গকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। করতোয়া, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত তিস্তা-তোর্ষা অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই জনপদের মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক কাঠামোতে কালের প্রবাহে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের সেইসব প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রামকে ঘিরে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সংখ্যাটির প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। পাঠকদের আন্তরিক আগ্রহ ও ভালোবাসায় দ্বিতীয় মুদ্রণ করা হলো। এ ঘটনা সম্পাদকমণ্ডলির জন্য গভীর আনন্দের।

–সাকিল মাসুদ

সূ চি ক্র ম

উত্তরবঙ্গের লুপ্ত লোকজ পেশাজীবী সম্প্রদায় ▪ মো. মঈনুল হাসান ৫
বেশ্যাজীবন: প্রেক্ষাপট রংপুর ▪ নূরুননবী শান্ত ৩০
উপনিবেশিক রংপুর অঞ্চলের নারী শিক্ষা ▪ সুরাইয়া আক্তার ৪৩
রংপুরের পোড়ামাটির শিল্প: জীবিকায়নে বিকল্প পাঠ ▪ কালী রঞ্জন বর্মণ ৪৯
বাংলার মন্দির স্থাপত্য নির্মাণে দেশিয় রীতি ও উপনিবেশিক ভাবধারার সংমিশ্রিত প্রভাব: রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাভিত্তিক একটি পর্যালোচনা ▪ বহ্নি রানী রায় ৫৩
প্রসঙ্গ: উন্নয়ন– গোবিন্দগঞ্জে ইপিজেড ও সাঁওতাল ভূমি ▪ ড. এস. এ. তালুকদার ৫৯
বৃহত্তর দিনাজপুরের জীবন-জীবিকা ▪ তুষার শুভ্র বসাক ৬৬
উত্তরের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা ▪ সাঈদ সাহেদুল ইসলাম ৮৫
বদরগঞ্জে বিলুপ্ত প্রায় যুগী ▪ আশরাফুজ্জামান বাবু ৮৮
মিঠাপুকুরের ওঁরাও সম্প্রদায় ▪ কামরুজ্জামান দিশারি ৯০
তিস্তা বন্দরের ইতিকথা ▪ এ,এস,এম,হাবিবুর রহমান ৯৮
বৃহত্তর রংপুরের প্রান্তিক মানুষের জীবিকা: প্রেক্ষিত সুন্দরগঞ্জ ▪ কঙ্কন সরকার ১০২
বাজার ▪ সাজিদ রহমান ১১১
প্রতিবন্ধী জিতু রায়ের সফলতা ▪ স্বপন চৌধুরী ১১৫
হরিজন সম্প্রদায়: পথের ধারেই বেড়ে ওঠে ওরা ▪ সাহিনা সুলতানা ১১৮
বিয়ে সংস্কৃতি: রংপুর অঞ্চল ▪ ময়নুল ইসলাম ১২০

কাঁটাতারের ওপারে

উত্তরবঙ্গ-ইতিহাস, নামকরণ ও শিল্পের অনুসন্ধানে ▪ দেবদত্তা বিশ্বাস ১১৯
উত্তরবঙ্গের মৎসজীবীদের জীবন-জীবিকা: এক আলোকপাত ▪ পার্থ সারথি চক্রবর্তী ১৩৬
উত্তরবঙ্গের অন্যতম জীবিকা-পাটিশিল্প ▪ ডলি সাহা ১৪৪
উত্তরবঙ্গে প্রান্তভূমির জনজাতির জীবনযাত্রা ▪ কুণাল নন্দী ১৪৯
উত্তরবঙ্গে জীবন-জীবিকার পরিবর্তন: একটি রেখাচিত্র ▪ রণজিৎ কুমার মিত্র ১৫৩
হাক-ডাক-পেশা: জীবন জীবিকা ▪ দেবব্রত চাকী ১৫৮
লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গের যাযাবর জীবন ও তার সংস্কৃতি ▪ রবীন্দ্রনাথ পান্ডে ১৬২
হাটপুরাণ লোকপুরাণ ▪ সুবীর সরকার ১৬৯
প্রান্তীয় উত্তরের কিছু জীবিকার কথা ▪ অম্বরীশ ঘোষ ১৭৬
দেশভাগে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন সংগ্রাম ▪ রুমি নাহা মজুমদার ১৭৮
টোটোদের কথা ▪ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ১৮৪
মালদায় মতুয়া: নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোকায়ত ও নান্দনিক বিশ্লেষণ ▪ ড. জীবনকুমার সরকার ১৯১
টোটো জাতির জীবন ও জীবিকা ▪ অভিজিৎ সরকার ২০৫
উত্তরের শোলাশিল্প ▪ মনামি সরকার ২০৭
জীবন ও জীবিকায় তামাক ▪ অভিজিৎ দাশ ২১০

জীবন-জীবিকার বিবিধ পাঠ:

অভিবাসী শ্রমিক বনাম টেকসই উন্নয়ন ▪ মো: আহসান হাবিব ২১৫
নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতাদের সংগ্রামী জীবন ▪ মোস্তাজিরুর রহমান ২১৭
বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্ম বা পতিতাবৃত্তি ▪ দেলোয়ার হোসেন রংপুরী ২২৩
বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায়- মেথর ▪ জয়ন্তদেব ২৩৬

উত্তরবঙ্গের লুপ্ত লোকজ পেশাজীবী সম্প্রদায়

মো. মঈনুল হাসান

লোকজ পেশাজীবী শ্রেণি: বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশের অধিকাংশ মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের একটি অংশের প্রাচীন নাম ছিল 'পুণ্ড্র' অনার্য ভাষায় এই 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'কৃষিজাতি'। আবহাওয়াগত কারণে এই অঞ্চলে কৃষির বিকাশ অতিদ্রুত ত্বরান্বিত হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে জীবন ও জীবিকার তাগিদে এই অঞ্চলে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে। তবে এই অঞ্চলে যে পেশাজীবী শ্রেণিরই উদ্ভব ঘটুক না কেন সে পেশা কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কেন্দ্রিকই ছিল।

সাধারণভাবে লোকপেশাজীবী বলতে সেই পেশা বা পেশায় নিয়োজিত লোককে বুঝায় যারা সুদীর্ঘ কাল ধরে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পূর্ব পুরুষদের পেশা বা কর্মকে আঁকড়ে ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে বা জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক পেশা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে হারিয়ে গেছে কিংবা বলা চলে অনেক কর্ম/পেশা বর্তমান সময়ে এসে তাদের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সেই কর্মের ওপর নির্ভরশীল মানুষও বাধ্য হয়ে পূর্ব/পুরুষের দীর্ঘদিনের পেশা পরিবর্তন করেছে। তাই বর্তমান সময়ে এসে অতীতের অনেক পেশাজীবী শ্রেণিকে আজ আর তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ যা জীবিকার প্রধান অবলম্বন সময়ের বিবর্তনে তা এক সময় হয়ে পড়ে ইতিহাস। উত্তরবঙ্গে অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র পেশার উদ্ভব ঘটেছিল। পেশার পরিবর্তন শুধু এ অঞ্চলেই নয় বরং পৃথিবীর সব দেশেই ঘটছে এবং পেশা পরিবর্তিত হচ্ছে নানাবিধ কারণে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে পেশার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুততার সাথে। সময়ের চাহিদা মেটাতেও অনেক পেশার বিলুপ্তি ঘটছে। আসছে নতুন নতুন পেশা ও পেশাজীবী শ্রেণি। আলোচ্য প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গে জেলার লুপ্ত কিংবা লুপ্ত প্রায় কয়েকটি পেশাজীবী শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উত্তরবঙ্গ: 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে এর ব্যাপ্তি কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়। বৃহত্তর বঙ্গদেশের মতো একসময় উত্তরবঙ্গের আকৃতি-প্রকৃতিও ছিল দীর্ঘ প্রসারিত। কিন্তু ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের করালগ্রাসে উত্তরবঙ্গেরও অঙ্গচ্ছেদ ঘটে। লোকমুখে প্রচার ও বহুক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ' শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শব্দটির ব্যাপক পরিচিতি ঘটে।

কাজেই ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েও বলা যায়-রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং অবশ্যই সাংস্কৃতিক ও ভাষিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গ ভিন্ন মাত্রার পরিচয়বাহী।

দেশবিভাগের পূর্বে উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝাতো দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জিলিং, দেশিয় রাজ্য কোচবিহার, পূর্নিয়ার কিছু অংশ, অবিভক্ত নদীয়ার একাংশ, আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপের কিছু অংশ। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা নদী মূলত উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ অংশের বিভাজন রেখা। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের এই পরিসীমা খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। বর্তমান সময়ে উত্তরবঙ্গ বলতে ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের বেশ কিছু জায়গাকে বুঝায়। প্রথমত বাংলাদেশের রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহ বাংলাদেশীয় উত্তরবঙ্গ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের ছয়টি জেলা *(কোচবিহার, জলাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর)* ভারতীয় উত্তরবঙ্গের আওতাভুক্ত। আলোচনার সুবিধার্থে এই প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গ বলতে বর্তমান রংপুর বিভাগকে বুঝানো হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গের পেশাজীবী হিসেবে এখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় লোকজ পেশাজীবীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. গোয়ালী সম্প্রদায়ঃ গোয়ালী বাংলাদেশে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। হিন্দু সমাজে সদগোপ নামে পরিচিত গাভী পালক সম্প্রদায়। অতীতে এদের মূল পেশা দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার বিক্রি ছিল। গোয়ালী শব্দটি মূলত এসেছে গোয়ালা শব্দ থেকে আর গোয়ালা শব্দটি হচ্ছে গোপাল শব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতের যুগেও তাদেরকে গোপাল ও আহির এই দুই নামে অভিহিত করা হতো। এরা তিনটি প্রধান অসবর্ণ গোত্রে বিভক্ত। এই গোত্রগুলো হচ্ছে আলিস্মন, ভরদ্বাজ ও সচ্চিদানন্দ। এই গোত্রগুলো আবার গোপ, ঘোষ, দাগা প্রভৃতি উপগোত্রে বিভক্ত।[১]

গোয়ালাদের এই উপগোত্রগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গোয়ালী সম্প্রদায়। গোয়ালী সম্প্রদায়ভুক্তরা নিজেদের গোরক্ষণাথের ভক্ত হিসেবে পরিচয় দেয়। গোয়ালা বা গোয়ালীদের জীবিকার সাথে গৃহপালিত জীবজন্তু জীবিকা নির্ভরশীল কারণ গোয়ালা ও গোয়ালীদের পেশার সাথে গৃহপালিত জীবজন্তু জড়িয়ে আছে। আর গোয়ালীদের ধারণা মতে গৃহপালিত এই সমস্ত জীবজন্তুকে বিবিধ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে গোরক্ষণাথের উপর।

১ সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.), বাংলাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন/২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.১০৫।

তাই গোয়ালী সম্প্রদায় গোরক্ষণাথকে ভক্তিভরে পূজা, অর্চনা করে তুষ্ট রাখার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস গোরক্ষণাথকে যদি তুষ্ট রাখা যায় তাহলে গৃহপালিত জীবজন্তুর কোনো ক্ষতি হবে না বরং গোরক্ষণাথের কৃপায় গৃহপালিত জীবজন্তুর মঙ্গল সাধিু হবে সাথে সাথে গৃহস্থদেরও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

উত্তরাঞ্চলের রাজবংশী ও পলিয়া কৃষককুল গোরক্ষণাথকে গো-রক্ষক দেবতা রুপে পূজা করে। যদিও বর্তমান সময়ে গোরক্ষণাথের পূজা তেমন একটা চোখে পড়ে না। গোরক্ষণাথকে গো-রক্ষক দেবতা হিসেবে পূজা বা ভক্তি করার কারণ হচ্ছে, তারা মনেকরতো যে, গোরক্ষণাথ তাদের পূজায়/ভক্তিতে সন্তুষ্ট হলে তাদের গোয়ালের গরুকে বা গৃহপালিত পশুকে সব ধরনের রোগ বালাই থেকে রক্ষা করবে। গোরক্ষণাথের প্রতীক হিসেবে একটি কাঠের মূর্তি তেল-সিন্দূর মাখিয়ে গোয়াল ঘরে রেখে নানা উপকরণ দিয়ে পূজা করা হয়। এ পূজায় এককুলা ধান নিবেদন করতে হয়। সাধারণ কৃষক সমাজেও গোরক্ষণাথের পূজার প্রচলন ছিল।

পণ্ডিতদের মতে গোরক্ষক হিসেবে গোরক্ষণাথের নাম এলেও তিনি নাথ সম্প্রদায়ের আদি গোরক্ষণাথ নন, লৌকিক দেবতা মাত্র। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা বলেও তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়। গো-বৎসের রক্ষক হিসেবেও বৌদ্ধরা তাঁর পূজা করে থাকে।[২]

গোয়ালী সম্প্রদায় সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে গোয়ালী সম্প্রদায় নিজেদেরকে মধ্যম শ্রেণিভুক্ত বলে মনেকরলেও হিন্দু সমাজের অন্যান্যরা তাদের নীচু শ্রেণি বলে মনে করেন এবং তাদের সাথে সেভাবেই আচরণ করে থাকে। গোয়ালীদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের প্রধান। পরিবারের পুরুষেরা বাইরে কাজ করে আর নারীরা সাধারণত ঘরের কাজ করে থাকে। এই সম্প্রদায়ভুক্তরা আর্থিকভাবে খুব বেশি স্বচ্ছল নয় এবং লেখাপড়ার দিক দিয়েও এই সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা খুব একটা অগ্রসর নয়। যা তাদের অস্বচ্ছলতার অন্যতম প্রধান কারণ। নিকট অতীতেও গোয়ালী সম্প্রদায়ের লোকেরা পেশা নির্বাচনে পৈতৃক পেশাকেই বাঁছাই করতো।

গোয়ালী সম্প্রদায়ের পেশাটি ছিল মূলত মৌসুমি পেশা। মৌসুম শেষে যখন তাঁদের এই কাজ থাকতো না তখন তারা অন্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সাধারণত বৎসরে দুইবার ধান তোলার মৌসুমে বিশেষ করে

২. সিরাজুল ইসলাম(সম্পা.), বাংলাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন/২০১১, খ্রিস্টাব্দ, পৃ.১০৬-১০৭।

আউস ও আমন ধানের মৌসুমে গোয়ালীরা গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হতো। গোয়ালীরা গৃহস্থের বাড়িতে এসে গোয়াল ঘরের দরজায় সিন্দূরের ফোঁটা দিয়ে গোয়াল ঘর ও বাইরের উঠান ঝাড় দিত এবং গোয়াল ঘরের দরজায় বসে গোরক্ষণাথকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তিভরে একধরনের গান বা পাঁচালী পরিবেশন করতো। যা গোয়ালীর গান নামে এক সময় খুবই সুপরিচিত ছিল। ছিল বলছি কারণ এই গান এখন আর তেমন শোনা যায় না বললেই চলে। বর্তমানে এই গানটি প্রায় বিলুপ্তর পথে। গোয়ালীর গান হচ্ছে উত্তর বাংলার গ্রামের গান। এই গানের মধ্যে শহুরে কোনো প্রভাব নেই। নিকট অতীতে আশি কিংবা নব্বই-এর দশকেও গ্রামের পথে পথে গোয়ালীর মন্দিরার টুং টুং শব্দ ও বিশেষ ভঙ্গীমা ও সুরে গাওয়া এই গান শোনা যেতো। কিন্তু বর্তমানে এই গান আর শোনা যায় না বললেই চলে। সমাজ থেকে আজ এই গান প্রায় বিলুপ্তির পথে। সাধারণত গোয়ালীরা সকাল বেলা ধুঁতি, গেঞ্জি পড়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়তো। তাদের সাথে থাকতো মন্দিরা, বাঁশের তৈরি বিশেষ লম্বা ধরনের ঝাড়ু এবং ভাঁড়-বাঁকুয়াতে ছোট ছোট ধামা কখনও কখনও অবশ্য ধামার পরিবর্তে বস্তাও বহন করতে দেখা যেতো। গান পরিবেশন শেষে গৃহস্থ খুশি হয়ে গোয়ালীকে ধান/চাল কিংবা গৃহস্থের উৎপাদিত শস্য দিতো, গোয়ালী খুশি মনে তাই গ্রহণ করতো। অনেক সময় গৃহস্থ খুশি হয়ে গোয়ালীকে খাদ্যশস্য দেয়ার পাশাপাশি নগদ অর্থও প্রদান করতো।

গোয়ালীদের আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সওয়ালীও বলা হতো। বর্তমান সময়ে গোয়ালীদের খুব একটা চোখে না পড়লেও তারা যে সমাজ থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। বরং গোয়ালীরা বর্তমান সময়ে এসে আর এই পেশাকে গ্রহণ করছে না। বলা চলে এই সময়ে এসে গোয়ালী পেশাই আজ বিলোপের পথে। কারণ এই পেশার মধ্যে সম্মানের কিছু নেই। বরং আছে অসম্মান। তাই বর্তমানে সময়ের প্রয়োজনে, যুগের ও জীবিকার তাগিদে তারা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছে। বলা চলে জীবিকার তাগিদেই গোয়ালীরা পুরাতন ঐতিহ্যকে ধরে না রেখে বাস্তবতাকেই মেনে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আত্মসম্মানবোধের ও উন্নত জীবন-যাপন করার আকাঙ্ক্ষা। ফলে গোয়ালী সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম পূর্ব-পুরুষের এই পেশাকে আর পেশা হিসেবে হিসেবে নিতে আগ্রহী হচ্ছে না। তাদের কাছে এই পেশাটা নিম্নশ্রেণির এবং

মর্যাদাহীন পেশা। ফলে পরিবর্তনের হাওয়ায় ভেসে তারা পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়ে নতুন পেশা গ্রহণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটাই বাস্তবতা, এককালের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন পেশা এভাবেই হারিয়ে যাবে আর হারিয়ে যাওয়া পেশার স্থান দখল করে নেবে অন্য কোনো নতুন পেশা। আর আজকের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এটাই বাস্তবতা। গোয়ালীর পেশা বৈচিত্রময়, গোয়ালীর এই পেশার সাথে একধরণের গান জড়িত। যা গোয়ালী গান নামে পরিচিত।

গোয়ালীর গানে গৃহস্থদের জন্য নানা নিয়ম-কানুন, মঙ্গল-অমঙ্গল ও স্বপ্নের কথা ফুঁটে উঠতো। যে কোনো গানের পূর্বে গুরুকে বন্দনা করার রীতি বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে। গোয়ালীরা তাদের গানে বিভিন্ন রকম বন্দনা তথা সূচনা সংগীত ব্যবহার করতো। এরকম একটি সূচনা সংগীত/ বন্দনা গীত হচ্ছে:

আরে সর্বেশ্রেষ্ঠ দাতা তিনি কবিতোবাহন
গোয়াল বন্দি, দুয়োর বন্দি, বন্দি প্রভুর পা'য়
ঘর বন্দি, বাড়ি বন্দি, বন্দি চারিধার
ছোট-বড় গাভী বন্দি গোরক্ষণাথের পা'য়
যাক ভাল এসব কথা দিলেম সমাপোন।[৩]

গোয়ালীরা বন্দনা গীত পরিবেশন করার পর গোরক্ষণাথের মহাত্মসূচক আরো বিভিন্ন রকমের পাঁচালি পরিবেশন করতো। সেখানে যেমন ফুটে উঠতো গৃহস্থের জন্য বিভিন্ন উপদেশমূলক কথা তেমনি উঠে আসতো গৃহস্থের ধন-সম্পদ যেন রক্ষা পায় সেজন্য বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনামূলক কথা। এসবই পরিবেশন করা হতো গোরক্ষণাথকে উদ্দেশ্য করে।

গোয়ালীর গানের কথাগুলো একেবারেই অন্য রকম। অন্য কোনো গানের সাথেই এই গানের কথা, সুর কিংবা গায়কীর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গানে গৃহস্থের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা থাকে। এই গানের মাধ্যমে যদিও গোরক্ষণাথের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয় তারপরও এই গানে গোয়ালীরা গৃহস্থকে গানের কথার মাধ্যমে বেশ কিছু কাজ করতে স্পষ্টভবেই নিষেধ করে থাকেন। এছাড়াও গোয়ালীর গানে গোয়াল ঘরের জন্য কিছু আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়ে থাকে। যা পালন করলে গরুর জন্য মঙ্গল হবে বলে একধরনের লোকবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এরকম গোয়ালীর গান হচ্ছে:

** চার জাতির নারীর কথা করি বিবরণ

---

৩. তথ্যদাতা: রঘুচন্দ্র মালী, বয়স: ৬০ বছর, পেশা: কৃষি, শিক্ষাগুযোগ্যতা: নিরক্ষর, ঠিকানা: গ্রাম: রনজিতেরষর, ডাক:নাজিম খান, থানা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নাজিমখান বাজার, তারিখ: ০৭/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

শঙ্কিনী নারীর কথা বলি যে এখন
হস্তানী, পোদ্দানী, শাঙ্কিনী, চিন্তামনী নারী
শঙ্কিনী নারী মাগো শঙ্কার দিকে মন
ইয়ার মধ্যে দেখো এ্যালা কোনো নারী কেমনি
পর পুরুষক না দেখিলে উপাসের লক্ষণ
হস্তানী নারীর চলন হস্তিরই মুন
ঐ নারীটা আন্দে বাঁড়ে স্বামীর আগে খায়
লাফে লাফে পাও ফ্যালে শিঙ্গারই গর্জন
ভরনও কলসির পানি তলাসে শুকায়
ধপে ধপে হাটে নারী চতুর পার্শ্বে চায়
আসনও ছাড়িয়া নারী মাটিত বসি খায়
সে নারীটা অভাগীনী স্বামীকে করেন ক্ষয়।
নিশ্চয়ই জানিবেন নারী লক্ষী ছাড়া হয়
উষ কপালী, চিরল দাঁতি বলা নাহি যায়
আউলিয়া মাথার ক্যাশ মা ঘোড়েন পাড়ায় পাড়ায়
সোনার পাইসা কামাই করলে তবু আখপ্যার নয়
নিশ্চয়ই জানিবেন নারী স্বামী হারা।
যাক ভালো এসব কথা দিলাম সমাপন
যাক ভাল এসব কথা দিলাম সমাপন
পোদ্দানী নারীর কথা বলি যে এখন
চিন্তামনী নারীর কথা করি বিবরণ
পেদ্দানীর পায়ে পদ্ম হাতে কু-মণ্ডল
চিন্তামনী চিন্তা করে সংসারীর কারণ
লক্ষ লক্ষ গরু ছাগল রাখে পালে পাল
কীভাবেতে কীহবে মা ভাবে মনে মনে।
যাক ভাল এসব কথা দিলাম সমাপন।[৪]

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে হয়তো গোয়ালীদের পেশা ও তাদের গান প্রাসঙ্গিক নয় কিন্তু এই গান একসময় গ্রাম-বাংলার প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতেই গোয়ালীরা পরিবেশন করতো। তাই গ্রামীণ সংস্কৃতির এই ঐতিহ্য রক্ষায় এই গান ও এর গায়কদের নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনেকরি।

৪. সাক্ষাৎকার: রামচন্দ্র মালী, বয়স: ৫৫ বছর, পেশা: শ্রমিক, শিক্ষাগুযোগ্যতা: পঞ্চম শ্রেণি, গ্রাম: মমিন, ডাক: জোড়সয়রার হাট, থানা: রাজারহাট, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: রামচন্দ্র মালীর বাড়ি, তারিখ: ১৫/১১/২০১৬ খ্রি.।

আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে গোয়ালীর গানগুলো যদি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে এই অঞ্চলের শতশত বছরের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য গোয়ালীর গান/পাঁচালী হারিয়ে যাবে চিরতরে এবং পরবর্তী প্রজন্ম কখনও জানতে পারবে না আমাদের অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এ গান সম্পর্কে।

২. ভূঁইমালী সম্প্রদায়ঃ ভূঁইমালী বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের অন্যতম একটি পেশাজীবী সম্প্রদায়। বর্তমানে এই পেশাজীবী সম্প্রদায়ের পেশার কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব টিকে আছে। ভূঁইমালী নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সমাজে তাঁরা সবসময়ই ছিল অবহেলিত। এই সম্প্রদায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনগ্রসর। তাদের অনগ্রসরতার পেছনে শুধু যে তারা নিজেরাই দায়ী তা কিন্তু নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের এই অনগ্রসরতার দায় কোনো ক্ষেত্রেই এড়াতে পারে না। ভূঁইমালীরা বংশপরম্পরায় বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়ে আসছে। অতীত থেকেই তারা সবক্ষেত্রে বঞ্চিত। বর্তমান সময়ে এসেও তাদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতিরমানের কোনো বিকাশ ঘটেনি। একটি অনগ্রসর সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সমাজ গঠনে তাঁদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ভূঁইমালীরা মূলত পূর্বে জমিদার, জোতদার কিংবা অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের বাড়িতে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। অর্থাৎ কৃষির সাথে তাঁদের সরাসারি সম্পৃক্ততা ছিল। ভূঁইমালীদের পেশায় যেমন বৈচিত্রময়তা আছে, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যেও বৈচিত্রময়তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

ভূঁইমালীদের বাংলার অন্য অঞ্চলে বলে হাড়ি। মূলত হাড়ি হচ্ছে হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু। হিন্দু সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে মুচি, চামার, ডোম, ভূঁইমালীদের অবস্থান।[৫] পূর্ববঙ্গে কখনও কখনও ভূঁইমালীদের 'সিফি-পুত্র'ও বলা হয়ে থাকে। এক মুনির নামে এই নামকরণ করা হয়েছে।[৬] হাড়িদের ঐতিহ্যগত পেশা ঝাড়ু দেয়া ও শুকরপালন হলেও হাড়ি উপবর্ণভুক্তরা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। হাড়ি বর্ণভুক্ত সম্প্রদায়রা চারটি উপবর্ণে বিভক্ত উপবর্ণগুলো হচ্ছেঃ ভূঁইমালী, কাহার, মেহতার এবং দাই।[৭] এই চারটি উপবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের পেশা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যেমন- দাইরা ফুলহাড়ি নামেও

৫. J.A. VAS, Eastern Bengal and Assam District Gayetteers, Rangpur, Allahabad Printed at the pioneer press, 1911, p. 47.

৬. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (৩য় ভাগ), ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসেম্বর/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৯।

৭. L.S.S OÕMalley, Bengal District Gayetteers, Birbhum, Government of West Bengal, 1996, p. 41.

পরিচিত এরা ধাত্রী পেশায় নিয়োজিত, কাহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা পালকি বাহক হিসেবে কাজ করে, মেহতার সম্প্রদায়ভুক্তরা ঝাড়ুদার হিসেবে কাজ করে এবং ভূঁইমালী সম্প্রদায়ভুক্তরা কৃষি কাজ করে থাকে। হাড়ি সম্প্রদায়ভূক্ত ভূঁইমালীরা সুদূর অতীতে এক সময় নিজেদের শূদ্র হিসেবে পরিচয় দিলেও কোনো এক সময় তারা শূদ্র বর্ণ থেকে অধঃপতিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুতে পরিণত হয়। শূদ্ররা দুটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত যথাঃ সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র। সৎ শূদ্র হচ্ছে তারা যাদের নিকট থেকে উচ্চতর জাতের লোকজন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতো। আর যাদের সংস্পর্শকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিজেদেরকে অপবিত্র বলে বিবেচনা করতো তাদেরকে অসৎ শূদ্র বলা হতো। ভূঁইমালীরা অধঃপতিত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির শূদ্রে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের অন্ত্যজ জাতি বা অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। তাদের এই অধঃপতিত হওয়ার কারণ হিসেবে বয়োঃজ্যেষ্ঠ ভূঁইমালীরা এক অদ্ভূত তথা রূপক কাহিনি বর্ণনা করেন। তাদের তথ্য মতে পার্বতীশিবের অনুমতি নিয়ে পৃথিবীতে তাঁর ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। পার্বতীর আমন্ত্রণে হিন্দু সমাজের সব বর্ণের লোকেরাই এসেছিল। এই আপ্যায়ন অনুষ্ঠান চলাকালে এবং এক আনন্দঘন পরিবেশে এক দুর্ভাগা ভূঁইমালী নাকি বলেছিল আমার ঘরে এমন সুন্দরী স্ত্রী থাকলে আমি তাঁর চাকর হয়ে সারাজীবন স্ত্রীর সেবা করতে কোনো কার্পণ্য/আপত্তি করতাম না। তার এই মনোবাসনা বা তাঁর এই কথা শিবের কাছে পৌঁছলে শিব এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে সেই ভূঁইমালীর স্ত্রী করে দেন। সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে ভূঁইমালী সব ভুলে যায় কিন্তু শিব তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দিলে সেই ভূঁইমালী তাঁর স্ত্রীর চাকর হিসেবেই পরবর্তীতে স্ত্রীর সেবা করতে থাকে। ভূঁইমালীদের মতে তখন থেকেই তাঁরা সুন্দরীর প্রেমে পড়ে অধঃপতিত হয়ে যায়।[৮]

ভূঁইমালী সম্প্রদায়ের লোকেরা আর্য ও মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশে এসে তাঁরা ঢাকা, রংপুর, ফরিদপুর, নোয়াখালি, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে ভূঁইমালীদের কী হিসেবে দেখানো হবে তা নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে মুভেদ দেখা দেয়। পরবর্তীতে অবশ্য ভূঁইমালীদের আধা-হিন্দু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই আদমশুমারিতে রংপুর অঞ্চলে ভূঁইমালীদের সংখ্যা দেখানো হয় ৩৭৭১ জন।[৯] বর্তমানে বাংলাদেশে ভূঁইমালীদের সংখ্যা কত তা

৮. সাক্ষাৎকার: ক্ষিতিশচন্দ্র মালী, বয়স: ৬৫ বছর, পেশা: শ্রমিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা: পঞ্চম শ্রেণি, গ্রাম: চাকিরপশার পো: চাকিরপশার, থানা: রাজারহাট ,জেলা : কুড়িগ্রাম।

৯. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ

নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ ১৮৭২ সালের পর দেশ বিভাগের পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী সময়ে যে সমস্ত আদমশুমারী হয়েছে সেখানে ভূঁইমালীদের আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে গণনা না করে ভূঁইমালীদের হিন্দু হিসেবে গণনা করায় তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যায় না। আর সেকারণেই বর্তমানে সারা বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভূঁইমালীরা বসবাস করলেও তাদের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়।

ভূঁইমালীরা সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রেই পারিবারিক পেশায় নিয়োজত ছিল। পূর্বে তাঁরা জামিদার, জোতদার কিংবা অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে কৃষির উৎপাদনের সাথে জাড়িত ছিল। ফসল উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যেতো। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত করা, জমিতে ফসলের চারা লাগানো, ফসলের পরিচর্যা করা এবং ফসল মালিকের বাড়িতে নিয়ে আসা প্রতিটি ধাপেই তারা জড়িত ছিল। ফসল উৎপাদনের বিনিময়ে ফসল ঘরে উঠার পর তাঁরা ফসলের সুনির্দিষ্ট একটি অংশ পেতো। এইটিই ছিল ভূঁইমালীদের প্রধান পেশা। এছাড়াও অনেক ভূঁইমালী জমিদার বাড়িতে বাগানের মালির কাজও করতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পেশা লুপ্ত হয়ে গেলে তাঁরা জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। অনেকেই বিভিন্ন পূঁজা পার্বণ কিংবা উৎসব অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের বিয়েশাদিতে ভূঁইমালী বাদকদের নিয়োগ করা হয়। সানাই নামে বাঁশীর মতো দেখতে এক যন্ত্র দিয়ে বিকট শব্দ বের হয়। ওরা সানাই খুব ভালো বাজায় এছাড়াও এরা ঢোল, ঢাকও খুবই ভাল বাজাতে পারে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এইসব অনুষ্ঠানে যারা বাদ্য বাজায় তারা সকলেই কিন্তু ভূঁইমালী সম্প্রদায়ভূক্ত নয়। ভূঁইমালী মহিলাদের প্রায়ই ধাত্রী কিংবা পারিবারিক কাজ করতে দেখা যায়। তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেতে ভূঁইমালীর অনেকেই রিক্সা-ভ্যান চালানো কিংবা অন্যত্র গিয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেতে বাধ্য হয়েছে। প্রাপ্ততথ্য মতে, ফুল ভূঁইমালীরা ফুল পচ্ছন্দ করে এবং তা দিয়ে মালা গাঁথা এদের কাজ। পরবর্তী কালে বিয়েসহ প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য শোলার মুকুট, কাগজের ফুল ও প্রতিমা-চিত্র অঙ্কন করাকেও পেশা হিসেবে তারা গ্রহণ করেছে।[১০] শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তাদের দারিদ্র্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া পুঁজির

(৩য় ভাগ),ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসেম্বর/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৯।

১০. সাক্ষাৎকার: বীরেনচন্দ্র মালী, বয়স: ৫০ বছর, পেশা: শ্রমিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সপ্তম শ্রেণি, গ্রাম: মল্লিকবেগ পো: নাজিমখান, থানা: রাজারহাট ,জেলা : কুড়িগ্রাম।

স্বল্পতা হেতু তারা কোনো ব্যবসাও করতে পারছে না। আবার ব্যবসা করলেও অন্ত্যজ সম্প্রদায় বা অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে অনেকেই তাদের দোকান থেকে কেনাকাটা থেকে বিরত থাকে। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশিরভাগ ভূঁইমালীই অস্বচ্ছল থেকে যাচ্ছে।

ভূঁইমালীরা আবার দুইটি গোত্রে বিভক্ত যথাঃ বড় ভাগীয়া ও ছোট ভাগীয়া।[১১] এরা দুইটি গোত্রে বিভক্ত হলেও কোনো গোত্রের সাথেই কোনো গোত্রের কোনো মিল নেই। এই দুই গোত্রের মধ্যে বিয়েশাদী হয় না ও কেউ কারো সাথে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক পর্যন্ত রাখে না। আবার এই দুই গোত্রের কাজ আবার দুই ধরনের। এক গোত্রের কাজে অন্য গোত্রের লোকেরা কখনও হস্তক্ষেপ করে না। তাদের ভাষায় এই দুই গোত্রের কাজই বিধাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ বড় ভাগীয়াররা সাধারণত কৃ ষক, গায়ক, বাদক ও পালকির বেহারা হিসেবে কাজে করে। দ্বিতীয় শ্রেণি অর্থাৎ ছোট ভাগীয়াররা হচ্ছে ধাঙ্গর। এরা সাধারণত ময়লা পরিষ্কার করার কাজ করে থাকে। পুরুষ-নারী উভয়ই এই কাজ করে। এই শ্রেণিকে সমাজের সকলেই খুবই নিচু করে দেখে। ময়লা পরিষ্কার করার পর গোসল পর্যন্ত না করে এরা বাড়িতে ঢোকে।

সুদূর অতীত থেকেই ভূঁইমালী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নামের শেষে ভূঁইমালী শব্দটিকে পদবী হিসেবে ব্যবহার করে আসলেও বর্তমান সময়ে অনেক ভূঁইমালী পদবী পরিত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন পদবী গ্রহণ করছে। এরমাধ্যমে তাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল স্রোতধারার সাথে মিশে যাওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভূঁইমালীদের সমাজ ও সংস্কৃতি তথা তাদের জীবনধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বর্তমান সময়ে ভূঁইমালীদের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে। তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ উৎঘাটন করা গেলে বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে নতুন এক মাত্রাযুক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

একদিকে সামাজিকভাবে অবহেলা অপরদিকে জীবন জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত ভূঁইমালী সম্প্রদায় শত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নিজের স্বতন্ত্র বজায় রাখতে নিরন্তন চেষ্টা করে চলেছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎড়াই এবং বিবর্তনের পরও ভূঁইমালী সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সামাজিকভাবে অবহেলিত এবং জীবন-জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত এই সম্প্রদায় নিজের স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টা করলেও সময়ের কাছে হার

১১. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (তৃতীয় ভাগ),ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসেম্বর/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬০।

মেনে তাঁরা তাদের পৈত্রিক পেশা হারিয়ে জীবিকার চাহিদা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। পেশার পরিবর্তন হলেও তাদের আর্থিক অবস্থার কিংবা সামাজিক মর্যাদার তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বর্তমানে বিশ্বায়নের এই যুগে আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন, ভূঁইমালীদের স্বীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা এবং অসচেতনতা তাদের স্বকীয়তা লোপের অন্যতম কারণ। নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে যেমন ভূঁইমালীদের কর্তব্য রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্বও আছে অবহেলিত পশ্চাৎপদ এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাহলেই সুরক্ষিত হবে বাঙালির চিরায়ত মানবিক চেতনার। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূঁইমালীদের পেশা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হলেও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে টিকে থাক এই পেশাজীবী সম্প্রদায় এই কামনা করি।

৩. কলু/ তেলিঃ বর্তমান প্রজন্মের কাছে 'কলু' শব্দটি অনেকটাই অপরিচিত। কলু একটি পেশাজীবী সম্প্রদায়। সাধারণত কলুরা বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে যুক্ত হলেও বর্তমান সময়ে এই পেশাজীবীদের খুব একটা চোখে পড়ে না। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে এই পেশা বিলুপ্তির পথে। তাই এই পেশার সাথে যুক্ত পেশাজীবীরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে। বিভিন্ন প্রকারের তৈল বীজ থেকে ঘানির মাধ্যমে ভোজ্য তেল উৎপাদন ও সেই তেল বিক্রির সাথে নিয়োজিত এক শ্রেণির পেশাজীবী সম্প্রদায়কে কলু বা তেলি বলে। কলু ও তেলি দুইটি ভিন্ন শব্দ হলেও শব্দ দুইটির অর্থের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। 'কলু' একটি দেশিয় শব্দ। হিন্দিতে বলে 'কোলহু'। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও নদীয়া জেলা এবং বাংলাদেশের নাটোরসহ কিছু কিছু এলাকায় কলুকে 'খলু' বলা হয়। 'কলু' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে তৈল ব্যবসায়ী জাতি বিশেষ। [১২]আর তেলি/তেলী শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে তৈল উৎপাদক, তৈল ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। [১৩]আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কলু ও তেলী মূলত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তেলের সাথেই এদের সম্পর্ক। কলুরা ঘানিতে সরিষা, তিল, তিসি, সয়াবিন, সরগুজা (গুজি), সূর্যমুখী, ভেন্না, শুকনো নারিকেল, রেড়ি ও মান্দার তুলাবীজ পিষে তেল নিষ্কাশন করতো।

১২. আহমদ শরীফ (সম্পা.),বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, মে/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ,পৃ.১০৫

১৩. আহমদ শরীফ (সম্পা.),বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, মে/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ,পৃ.২৬৫

আর তেলিরা সেই তেল বিক্রি করতো। তবে অতীতের মতো আজও দেখা যায়, যারা কলু তারাই তেল বিক্রেতা। একই ব্যক্তি বা একই পরিবার উভয় কাজেই করে।[১৪] এটি বাংলাদেশের অতি প্রাচীন একটি পেশা। তেলিরা সাধারণত বংশনুক্রমিকভাবে এই পেশার সাথে যুক্ত। গরুর সাহায্যে ঘানিতে পিষে বিভিন্ন ধরনের তেল বীজ হতে তেল তৈরি করা এই পেশাজীবীদের কাজ। এই কলু/তেলিরা নিজেদের উৎপাদিত ভোজ্য তেল গ্রামের হাটে-বাজারে কিংবা ফেরি করে বিক্রি করতো। তারা তাদের উৎপাদিত তেল মাটির হাড়িতে সংরক্ষণ করতো। হাড়ি থেকে তেল উঠানোর জন্য তালের বিচির খোল দিয়ে তৈরি করা বাঁশের হাতলের ওরং ব্যবহার করা হতো।

মুসলমানদের মধ্যে যারা তেল প্রস্তুত করেন ও বিক্রি করেন তারা কলু এবং হিন্দুদের মধ্যে যারা তৈল প্রস্তুত করেন তাদের বলা হয় তেলি। তবে কলুদের মধ্যে যারা অবস্থাসম্পন্ন হয়ে অন্যদের দিয়ে তেল প্রস্তুত করে ব্যবসা করেন তারাও পরিচিত হচ্ছেন তেলি নামে। বলা হয়ে থাকে কলুরা ছোট জাতের। সাধারণত নিজেদের জাতের বাইরে এদের বিয়েশাদি হয় না। কলুরা হলো সঙ্কীর্ণমনা ও গোঁড়া ফরাজি। পুরুষানুক্রমিকভাবে যারা কলু তারা অন্য শ্রেণির কাছে অবজ্ঞার পাত্র। ময়মনসিংহে কলুদের একটি শ্রেণি আছে তাদের বলা হয় বক-কলু। এরা খুবই দরিদ্র। গরু দিয়ে ঘানি টানার বদলে তারা নিজেরাই নিজেদের ঘানি টানে। তাদের সম্পর্কে লোকে বলে যে, বউ ঝগড়াটে হলে কলু তাকে সায়েস্তা করার জন্য ঘানি টানতে লাগিয়ে দেয়। সব রকম বীজ থেকেই কলুরা তেল প্রস্তুত করে।[১৫]

কালের বিবর্তনে এই পেশা এবং সেই সাথে পেশাজীবী সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত প্রায়। বহুকাল ধরেই এই কলু সম্প্রদায় দেশের মানুষের ভোজ্য তেলের যোগান দিয়ে এসেছে আর সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন তেলের চাহিদা পূরণের জন্য এই তেলিদের কাছেই ভিড় করতেন। তখন প্রতিটি গ্রামেই তেল বীজ হতে তেল তৈরির জন্য বেশ কিছু ঘানি ছিল। এমনকি যাদের অনেক সম্পত্তি ছিল তাদের বাড়িতেও নিজস্ব ঘানি থাকতো। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তেল তৈরির ঘনিগুলো আজ আর যন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে হারিয়ে যাচ্ছে বা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও অল্প কিছু ঘানি ও এর উপর নির্ভরশীল তেলি/কলু কোনো রকমে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে

---

১৪. সিরাজুল ইসলাম (প্র.সম্পা.), বাংলাপিডিয়া, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন/২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪১২।

১৫. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (৩য় ভাগ), ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসেম্বর/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১০৪।

টিকে আছে। মূলত দেশে বিদ্যুৎ ও যন্ত্রচালিত ঘানির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কলু/তেলিদের বংশানুক্রমিক পৈত্রিক পেশা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়েও তেলিদের ঘনিতে তৈরি তেলের চাহিদা আছে যার কারণে ধুঁকে ধুঁকে হলেও অল্প কিছু তেলি/কলু পেশাজীবী তাদের পৈতৃক পেশা কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছে। যা এই অঞ্চলের লোকপেশাজীবীদের গৌরব কিছুটা হলেও ঘোষণা করে চলেছে।

৪. ছাপড়-বন্দ/ছৈয়াল/ঘরামিঃ 'ঘরামি' মূলত একটি পেশার নাম। সাধারণত যে ব্যক্তি বা যে সমস্ত ব্যক্তি বাঁশ, বেত, ছন, মাটি, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে কাঁচা ঘর-বাড়ি তথা 'পর্ণকুটির' নির্মাণ করে তাঁদের 'ঘরামি' (ঘর + আমি, আমী) বলে।[১৬] অঞ্চলভেদে ঘরামিদের ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন বরিশাল অঞ্চলে তাঁদের 'ছইওয়াল' (ছদি, সং + ওয়ালা) বলে।[১৭] কুড়িগ্রামে অঞ্চলে সাধারণত ঘরামিদের 'ছাপড়-বন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। ঘরামি পেশা মূলত লোকজ প্রযুক্তি নির্ভর একটি পেশা। ঘরামি, ছাপড়-বন্দ, কিংবা ছৈয়াল যে নামেই তাদের অভিহিত করা হোক না কেন এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাপ্ত এবং সহজলভ্য উপাদান সামগ্রী ব্যবহার করে ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকে। অর্থাৎ যে অঞ্চলে যে উপাদান সহজলভ্য সে অঞ্চলের সেই উপাদান ব্যবহার করে তার ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকে। 'ঘরামি' পেশা অনেক প্রাচীন একটি পেশা। মানুষ যখন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি-ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করে মূলত তখনই এই পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

ঘরামি বা ছাপড়-বন্দরা সাধারণত স্থানীয় লোক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ, প্রকৃতির সাথে মিল রেখেই ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে থাকে। তাদের তৈরি ঘর-বাড়ির উপাদান যেমন সহজলভ্য ঠিক তেমনিভাবে তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার সমূহও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। তারা হাতিয়ার হিসেবে সাধারণত দা, কুড়াল, কাঁচি, খুন্তি, কোদাল প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। ঘরামিরা একটি ঘরের অবকাঠামো থেকে শুরু করে ঘরের দরজা, জানালা সবকিছুই তৈরি করে থাকে। বংশপরম্পরায় ঘরামি কারিগরেরা তাদের এই পেশা টিকিয়ে রেখেছিল। সাধারণত ঘরামিরা প্রবীণ ব্যক্তিদের কাজ দেখে, তাদের সাথে

---

১৬. আহমদ শরীফ (সম্পা.),বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, মে/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.১৭৮।

১৭. ওয়াকিল আহমদ (সম্পা.), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-০৭ লোকসংস্কৃতি, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬৬।

দীর্ঘদিন এক সাথে কাজ করে ঘরামির কাজে দক্ষ হয়ে উঠতো। কারণ এই কাজ শেখার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। দক্ষ ও প্রবীণ ঘরামিদের সাথে কাজে করেই একজন নতুন ঘরামি তার দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পেতো। আজ থেকে দশ/বিশ বছর আগেও দক্ষ ঘরামির খুবই কদর ছিল।

একজন দক্ষ ঘরামি সাধারণত বাঁশ, ধান কিংবা গমের খড়, কাঁশিয়া, পাট কাঠি, পাটের দড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করে চাহিদা অনুযায়ী যে কোনো প্রকারের ঘর তৈরি করে দিতে পারতো। পূর্বে গ্রাম-গঞ্জে এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে ঘর তৈরি করা হতো। এমনকি ঘরের ব্যবহার ভেদেও তাদের তৈরি ঘরের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ঘরামিরা রান্নাঘর, গোয়ালঘর, মানুষের থাকার ঘর, বৈঠকখানা, গোলাঘর অর্থাৎ সবধরনের ঘরেই তৈরি করতো। ঘরের ব্যবহার ভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে অনুরূপভাবে ঘরের ছাউনি ভেদেও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন একচালা বা ছাপড়া ঘর, দোচালা ঘর, চৌচালা ঘর, আটচালা প্রভৃতি। ঐতিহ্যবাহী ঘরামিরা শৌখিন মানুষের চাহিদামতো বিভিন্ন নকশা ও কারুকার্যমণ্ডিত ব্যয়বহুল আটচালা বিশিষ্ট দ্বিতল ঘর ও তৈরি করতো।

ঘরামি ও তখনকার দিনে তাদের তৈরি ঘর-বাড়ি সম্পর্কে ওয়াল্টার হ্যামিল্টন লিখেছেন, "এই ছনের ঘরগুলো ভীষণ রকমের দাহ্য। বছরে দুবার না হোক, একবার তো আগুনে পুড়বেই। আর আগুনে ঘর পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে বাড়ি-ঘরের মালিকদের মনোভাব একেবারে নিস্পৃহ। এ যেন ভবিতব্য। এই উদাসীনতাই যেন এশীয়দের বৈশিষ্ট্য। আগুন যখন লাগবেই এই ভাবনা থেকে বাড়িঘরের মালিকরা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র মাটির ঘড়ায় ভরে ঘরের মেঝের মাটির নিচে পুঁতে রেখে দেন। বাঁশ কিংবা চাটাইয়ের অভাব নাই বলে, পোড়া ঘর নতুন করে আবার বানাবার সময় আগের বাড়ির চেয়েও সুন্দর করে বানাবার চেষ্টা করে। ছাপর-বন্দ বা ঘরামিরা কোনো এলাকায় যখন নানারকম নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়, তখন ধরেই নেয়া হয়, আগুন লাগতে আর দেরি নাই।"[১৮] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সারা বছরই ঘরামিদের কাজ থাকে না, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে যে সময়ে ঝড়-বৃষ্টি থাকে না কিংবা বর্ষার আগে আগে এই পেশাজীবীদের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। সে হিসেবে এই পেশাকে একটি মৌসুমি পেশা বললেও খুব ভুল বলা যাবে না।

বংশপরম্পরায় ঘরামিরা তাদের পেশা টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বর্তমান

১৮. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (প্রথম ভাগ), ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসেম্বর/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৯।

সময়ে শহর থেকে গ্রাম সবস্থানেই ঘর-বাড়ি নির্মাণের পদ্ধতি ও সামগ্রীর মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে। ফলে এই লোক পেশার সাথে এই পেশাজীবী শ্রেণির বিলোপ সাধিত হয়েছে। ঘরামিরা তাদের পৈত্রিক পেশা ছেড়ে দিয়ে জীবনধারনের জন্য নিজেদেরকে অন্য পেশায় নিয়োজিত করেছে। এখন ঘর নির্মাণে বাঁশ, ছন এর পরিবর্তে টিন, ইট প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ঘরামি লোক পেশাজীবী শ্রেণি তাদের পেশার বিবর্তন ঘটিয়েছে জীবিকার তাগিদে, বেঁচে থাকার জন্য ও সময়ের প্রয়োজনে। ঘরামিদের তৈরি গ্রামীণ সেই ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য বিলীন হবার পাশাপাশি ঘরামি পেশাও বিলুপ্ত প্রায় পেশায় পরিগণিত হয়েছে।

৫. হাজ্জাম/ বাঙ্গরি: নিকট অতীতেও বাংলায় মুসলমান ছেলেদের খুৎনা করানোর কাজটি এক বিশেষ পেশাদার শ্রেণি দিয়ে করানো হতো। আর যারা এই মুসলমান ছেলেদের সুন্নতে খুৎনা করাতো তারা হাজ্জাম নামে পরিচিত ছিল। স্থানভেদে কোথাও তারা 'ওস্তা' কোথাও বাঙ্গরি নামে পরিচিত। কুড়িগ্রাম অঞ্চলে যারা এক সময় এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল তাদেরকে বাঙ্গরি বলা হতো। এই পেশাজীবী সম্প্রদায় ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণত বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশাজীবী সম্প্রদায় তাদের পেশাকে টিকিয়ে রেখেছিল। হাজ্জামদের পেশা ছিল একটি মৌসুমি পেশা। ধারণা করা হয় যে, মুসলিম শাসনকর্তা ফকরুদ্দিন মোবারক শাহে্র শাসনামলে খুব সম্ভবত এই অঞ্চলে হাজামদের আগমন ঘটে। অনুমান করা হয় যে, ফকরুদ্দিন মোবারক শাহে্র শাসনামলে গৌড় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা মুসলমানদের মধ্য থেকেই এই অঞ্চলে হাজামদের আগমন ঘটে। সাধারণত চৈত্র/বৈশাখ মাসের দিকে আট থেকে দশ বছর বয়সী ছেলেদের সুন্নতে খুৎনা করা হতো। এই সময়ে হাজ্জামদের ব্যস্ততা প্রচণ্ড রকমের বেড়ে যেতো। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুর ঘুরে ছেলেদের সুন্নতে খুৎনা করাতো আবার অনেক সময় হাজ্জামদের বাড়িতে গিয়েও ছেলেদের সুন্নতে খুৎনা করা হতো। অথবা হাজ্জামকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসা হতো। বাঙ্গরিরা খুনার কাজে ব্যবহৃত সব জিনিসই নিজেদের সাথে নিয়েই চলাফেরা করতো। খুৎনা কাজের জন্য বাঙ্গরিরা ক্ষুর, বাঁশের তৈরি চিমটা, চুলার পোড়া মাটি এবং কাপড় পুড়ে যে ছাই হয় তা ব্যবহার করতো। এছাড়াও অনেক সময় পোড়া মাটির মিহি চূর্ণ, গোবরের বা খুঁটোর ছাই, হলুদ মিশ্রিত সরিষার তেল ইত্যাদি এ কাজে ব্যবহৃত হতো। আর যার মুসলমানি করা হতো তাঁকে কাঠের একটি পিঁড়িতে বসিয়ে পেছন দিক থেকে একজন হাঁটুর ফাঁক দিয়ে দুই হাত ঢুকিয়ে দুই পা চেপে ধরতেন আর

হাজ্জাম ক্ষুর দিয়ে দক্ষ হাতে অতি দ্রুততার সাথে মুসলমানি করিয়ে অন্যান্য কাজ সেরে ফেলতেন। খুনার কাজ হচ্ছে একটি লোকজপেশা যেখানে স্থানীয় প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল। এই পেশা বংশানুক্রমিক পেশা। এই পেশায় মুসলিম পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ করা যায়। হাজ্জামরা মুসলমানি করার বিনিময়ে নগদ অর্থ লাভ করতেন। আবার অনেকেই অর্থের পরিবর্তে ধান/চাল দিতেন। হাজ্জামরা এ কাজ শেষে পারিশ্রমিক ও পারিতোষিক উভয়েই পেতেন। আমাদের এই অঞ্চলে হাজ্জামদেরকে যাই দেয়া হোক না কেন একটি নতুন গামছা ও লুঙ্গি দেয়া আবশ্যক ছিল।

মুসলিম সমাজে খুৎনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এই কাজের সাথে জড়িত হাজ্জামদের তেমন কোনো মূল্য দেয়া হতো না। মুসলিম সমাজে হাজ্জামদের স্থান ছিল অতি নগণ্য। সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো লোক হাজ্জামের ঘরে বিয়ে করে না ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। অতীতে অন্য দেশের মতো চিকিৎসা শাস্ত্র ও শল্য চিকিৎসার সঙ্গে হাজ্জামদের সম্পর্ক ছিল। এজন্য তাদের ভেদি বলা হতো। এরা মানুষের দাঁতের পোকা তুলতো, বালকদের মুসলমানি করাতো। দেশের অনেক জায়গায় ওরা হলো আবদাল অর্থাৎ ষাঁড়কে বলদ বানাতো। অন্য কোনো কাজ না থাকলে হাজ্জামরা চাষাবাদের কাজ করতো। হাজ্জামের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা দাঁত ব্যথা হলে ঝারফুঁক করত, কানের ময়লা খশাতো কিংবা যেকোনো ব্যথা বেদনার ঝাঁড়ফুঁক করতো। আবার পেট ব্যথা বা অন্যান্য রোগের জন্য ঔষধ তারা দিতো।[১৯]

বর্তমান সময়ে অভিভাবকেরা আর বাঙ্গরির কাছে সুন্নতে খুৎনা না করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে এ কাজটি করিয়ে নেন। ফলে যারা একদিন সুন্নতে খুৎনা করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন আজ তারা তাদের পেশা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা পেশা পরিবর্তন করে বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করে জীবিকার সন্ধান করছেন। এই অঞ্চলের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই পেশাজীবী লোকদের।

৬. গাড়িয়াল: আবহমান গ্রাম বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাহন হচ্ছে গরুর গাড়ি। একসময় মালামাল ও দূরদূরান্তে যাত্রী পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ বাহনটি আর চোখে পড়ে না বললেই চলে। কালের বিবর্তনে পরিবেশ বান্ধব এই বাহনটি আজ বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। যারা এই গরুর গড়ি চালাত তাদের বলা হতো গাড়িয়াল। গাড়িয়ালী পেশাটিও ছিল কিছুটা বংশানুক্রমিক

১৯. জেমস ওয়াইজ (মূল) ফওজুল করিম (অনুঃ), পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (১ম ভাগ), ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ডিসে/২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৮৮-৮৯।

পেশা। অনেকেই বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যন্ত্রচালিত যানের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে গরুর গাড়ির সাথে সাথে এই গাড়ির চালক অর্থাৎ গাড়িয়ালদেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর।

এই কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ও এই এলাকার সহজ-সরল, দরিদ্র সাধারণ মানুষের কৃষি কেন্দ্রিক জীবিকা অন্যতম প্রধান পেশা হয়ে উঠেছিল। উত্তরাঞ্চলের মেঠো পথে কৃষিজাত পণ্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণের জন্য একমাত্র বাহন ছিল গরু কিংবা মহিষের গাড়ি। শুধু কৃষিজাত পণ্যই নয় বরং যাত্রী পরিবহনেরও এই গরুর গাড়ির ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মতো। একসময় প্রতিটি অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের একটি না একটি গরুর গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি কৃষি কাজের প্রয়োজনে কিংবা অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাজেও ব্যবহৃত হতো। তাছাড়া যাতায়তের জন্য একসময় এইসব গরু কিংবা মোষের গাড়ির ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। এই গরুর গাড়িতে করেই গ্রাম্য বধূরা বাপের বাড়িতে নাইয়োর যেতো। কিংবা বিয়ে করতে যাওয়ার সময়েও এই গরুর গাড়ি ছিল উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বাহন। অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী বাহন ছিল এই গরুর গাড়ি। আর এই গরুর গাড়ির চালকের পরিচয় ছিল 'গাড়িয়াল' হিসেবে। গরু-মোষের গাড়ির চালক 'গাড়িয়াল' নির্দিষ্ট কোনো জাতির নয়। পেশা হিসেবেই গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজে হিন্দ-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল। গাড়িয়াল কোনো জাতিগত পেশা নয় বরং এটি হচ্ছে বৃত্তিগত একটি পেশা। অবস্থাসম্পন্ন লোকদের নিজেদের গাড়ির পাশাপাশি নিজেদের গাড়িয়ালও ছিল। সেই গাড়িয়াল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক সেই গাড়ি চালাতো। আবার অনেক গাড়িয়ালের নিজস্ব গরুর গাড়ি ছিল। তারা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যাত্রী কিংবা মালামাল পরিবহন করতো। কিন্তু সময় বদলেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে গরুর গাড়ি বর্তমান সময়ে লাভবান না হওয়ায় গরু ও মোষের গাড়িগুলো সমাজ থেকে ধীরে ধীরে উঠে যেতে যেতে আজ লুপ্ত প্রায়। সেই কারণেই এই পেশার সাথে যুক্ত 'গাড়িয়াল'ও হারিয়ে গেছে সমাজ থেকে। এই পেশা হারিয়ে গেলেও রয়ে গেছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াইয়া গানে। এখনও উত্তরের পথে প্রান্তরে গাড়িয়ালদের গাড়িয়ালী জীবন নিয়ে রচিত সেই বিখ্যাত গান-

'ওকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়ি তুই

চিলমারীর বন্দরে...'

শুনতে পাওয়া যায়। তবে এখনও গ্রামগঞ্জে দুই-একটি গরু কিংবা মোষের গাড়ির দেখা মিললেও পূর্বের সেই ঐতিহ্য কিংবা আভিজাত্য আজ আর নেই বললেই চলে।

জীবিকার প্রয়োজনেই মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হয়। গাড়িয়ালকে ধান-পাট কিংবা অন্যান্য কৃষিপণ্য বোঝাই গরুর গাড়ি নিয়ে দূরের গঞ্জে-বন্দরে যেতে হয়। কিংবা নাইয়োরী তথা যাত্রী নিয়ে দূর-দূরান্তরে যেতে হয়। বিচিত্র এই গাড়িয়ালী জীবন আজ এখানে তো কাল ওখানে। ছুটেচলাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গাড়িয়ালের জীবন কেমন তা এই গানের মধ্যেই ফুটে উঠেছে-

'বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ওরে ঐ মতো মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরেরে
ওকি গাড়িয়াল মতই চলোং রাজপন্থে'।

পূর্বে গাড়িয়ালী পেশা ছিল অনেক বৈচিত্রময়। গাড়িয়ালদের জীবনও ছিল তাদের পেশার মতো অনেক বৈচিত্রপূর্ণ। ঘর অপেক্ষা বাইরেই অর্থাৎ পথে ঘাটেই তাদের সময় কাটত বেশি। উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রধান লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গানে গাড়িয়াল প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র হচ্ছে গাড়িয়াল ভাই। গাড়িয়ালের গাড়িয়ালী জীবনের দুঃখ, ব্যথা, গাড়িয়ালী জীবনের কথা, গাড়িয়ালের প্রেম-বিরহ এই ভাওয়াইয়া গানে চিত্রিত হয়েছে। এরকমই একটি বিরহমূলক গাড়িয়াল ভাইয়ের গান হচ্ছে-

'ও মোর গাড়িয়াল গেল দূর দ্যাশেরে
আরে ও বিধিরে একলা বাড়ি ছাড়ি
আগে পাছে কাঁইও নাই মোর
ও মতই অল্প বয়সের নারী বিধিরে।'

এই গানে গাড়িয়ালের এক অল্প বয়স্কা কিশোরী নববধূর প্রেমাকুতি ফুটে উঠেছে। জীবিকার তাগিদে গাড়িয়াল যে গাড়ি নিয়ে কোথায় যাবে আর কবেই বা ফিরে আসবে তার কোনো ঠিক নেই। তার গৃহে হয়তো সে নব বিবাহিতা অল্প বয়স্কা রমণী রেখে এসেছে তার জন্য হয়ত গাড়িয়ালের মন কান্দে। কিন্তু জীবিকার তাগিদে তাকে দূর দেশে যেতেই হবে। বাড়িতে বসে থাকলে তার জীবন চলবে না। নব বিবাহিতা বধূ গাড়িয়ালের বিরহে কাতর। সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু বিরহ ব্যাথায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

এই ভাওয়াইয়া গানে বিরহী নারীর মর্ম ব্যাথার কথাই ফুঁটে উঠেছে। যা গাড়িয়ালী জীবনের বিরহের প্রতীক মাত্র। তবে গাড়িয়ালী পেশার বিলুপ্তির সাথে সাথে এই পেশার সাথে যুক্ত এই অঞ্চলের বিবিধ সংস্কৃতি হয়ে গেছে আজ ইতিহাস। আজ সবকিছুই ঠাঁই নিয়েছে স্মৃতির পাতায়।

৭. মইষ্যালঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবিকার অন্যতম একটি বড় অংশ ছিল পশুপালন। এক একটি পরিবারে শত শত গরু মহিষ ছিল। আর এই সমস্ত গরু মহিষগুলো দেখাশুনা করার জন্য একাধিক লোক থাকত তাদের বলা হতো মইষ্যাল বা রাখোয়াল। এই মইষ্যালরা গরু মহিষগুলোকে চরাতে নিয়ে যেত দূরবর্তী কোনো নদীর চরের উন্মুক্ত প্রান্তরে কিংবা জঙ্গলের ধারে অর্থাৎ যে অঞ্চলে মহিষের খাবার বেশি থাকতো সেগুলোকে তারা সেখানেই নিয়ে যেতো। এভাবে তারা পরিবার, বাড়ি-ঘর ছেড়ে মহিষ চড়ানোর কাজে মহিষগুলোর সাথে মাসের পর মাস অতিবাহিত করতো।

বাথান বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামাঞ্চলে গবাদিপশু প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মিত বিশেষ ধরণের আবাসস্থল। 'বাথান' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা থেকে আগু, এর অর্থ গবাদিপশুর বাসস্থান, যেখানে রেখে তাদের পালন ও পরিচর্যা করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে গোয়ালা বা গোপ তথা দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে দেবদেবীরদের সম্পর্ক গড়ে তোলার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কিংবদন্তি অনুসারে দেবী মনসা ছদ্মবেশে বাথানে অবতরণ করেন এবং গোয়ালার কাছে আশ্রয় চান। রাখাল বা বাথানিয়া সম্প্রদায় গ্রামের গবাদিপশু সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে সংশ্লিষ্ট গবাদিপশুর মালিকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ বিভিন্ন দ্রব্যাদি গ্রহণ করতো। সাধারণত শস্য ও পশুসম্পদ ছিল রাখাল ও মালিক পক্ষের মধ্যে বিনিময় মাধ্যম। পুরানো আমলে বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় প্রায় সর্বত্র বাথানের প্রচলন ছিল। উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যাপকভাবে জমি চাষাবাদের ফলে গোচারণ ভূমির স্বল্পতার কারণে বাথান ব্যবস্থাটি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। সাধারণত, সরকারি খাস জমির পাশেই বাথান গড়ে উঠতো। কিন্তু ক্রমশ খাসজমি কমে আসায় বাথানের সংখ্যাও হ্রাস পায়।[২০]

মইষ্যালী জীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। মইষ্যালদের মহিষ নিয়ে পাড়ি দিতে হয় বিপদ সঙ্কুল পথ। সেই পথে আছে দস্যুর ভয়, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তবুও মইষ্যালকে মহিষ নিয়ে দূরে বাথানে যেতে হয়। কেননা মহিষ চড়ানোই তার একমাত্র জীবিকা। বাব-মা, ভাই-

২০. সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক),বাংলাপিডিয়া নবম খন্ড,ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন/২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২১৪-২১৫।

বোন, প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র-কন্যার মুখে অন্ন তুলে দেবার প্রয়োজনেই সমস্ত বিপদ হাসি মুখে বরণ করতেই জীবিকার তাগিদেই প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হয়। এই বিচ্ছেদ হচ্ছে খুবই কষ্টের। এই বিচ্ছেদ বেদনাই মইষ্যালী ভাওয়াইয়ায় ফুটে উঠে এভাবে–

‘ধিক ধিক ধিক মইষাল রে
আরে ও মইষাল ধিক তোমার হিয়া
কোন পরাণে যাইবেন মইষাল
আমাকে ছাড়িয়া মইষাল রে।

মোর ধরিছে হিয়া
আর কত দিন রাখিব যৈবন
অঞ্চলে বান্ধিয়া মইষাল রে।’

মইষ্যালরা তাদের জীবিকার তাগিদে দূর দূরান্ত থেকে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে মহিষের পাল নিয়ে বাথানগুলোতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতো। তারা নিস্তব্ধ দুপুর/পড়ন্ত বিকেলে কিংবা জ্যোস্না স্নাত রাতে দোতরার সুর তুলে নিজেদের নিঃসঙ্গতা/একাকিত্ব ভুলে থাকার জন্য গান গাইতো।

৮. কাহার/বেহারাঃ পালকি শব্দটি সংস্কৃত ‘পল্যঙ্ক’ বা ‘পর্যঙ্ক’ থেকে উদ্ভূত। পালি ভাষায় এই যানের নাম ‘পালাঙ্কো’। হিন্দি এবং বাংলায় এটি পালকি নামেই পরিচিত। আর এটি হচ্ছে চাকাবিহীন মানবচালিত যান। আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সাধারণত ধনিক ও অভিজাত শ্রেণি বিলাসবহুল যান হিসেবেই পালকিকে ব্যবহার করতো। চাকাবিহীন যান হওয়ায় কয়েকজন ব্যক্তি ঘাড়ে করে পালকি বহন করতো। আর এই পালকি বহন করার জন্য এক শ্রেণির পেশাজীবীর উদ্ভব ঘটেছিল যাদের ‘বেহারা’ আবার স্থান ভেদে কোথাও এদের ‘কাহার’ বলা হতো। কাঁধে পালকি বয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের পেশা। তবে তাদের এ পেশা জাতিগত পেশা ছিল না। এটি ছিল বৃত্তিগত পেশা।

পালকি বিভিন্ন আকৃতি ও ডিজাইনের হয়ে থাকে। পালকির আকৃতি অনুযায়ী এর বাহকের সংখ্যা নির্ভর করতো। সাধারণত একসাথে পালকিতে বড়জোড় দু’জন আরোহী বসতে পারতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাত্রীর সংখ্যা নয় বরং আরোহীর মর্যাদা ও পালকীর চলার গতির ওপর বাহকের সংখ্যা নির্ভর করতো। সাধারণত দুইজন থেকে শুরু করে ষোলোজন পর্যন্ত বেহারা পালকী বহন করতো। সম্ভ্রান্ত পরিবার কিংবা রাজা, জমিদার, নায়েব,

গোমস্তাদের নিজস্ব পালকি থাকতো এবং সেই সব পালকীর বেহারারা ছিল বেতনভুক্ত কর্মচারী। এছাড়াও কিছু স্বাধীন বেহারা ছিল যারা পালকি বহন করে যাত্রী পরিবহণ করতো এবং যাত্রীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতো। সময়ের প্রয়োজনে উন্নততর যানবাহন আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন পালকির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ঠিক তেমনিভাবে হারিয়ে গেছে হুম-হুম-হুম না, শব্দের ছন্দে ছুটে চলা বেহারা/কাহার পেশাজীবী গোষ্ঠী।

পেশাজীবী বেহার/কাহাররা মূলত পালকি বহন করতো। এটি জাতিগত পেশা নয় বরং বৃত্তিগত পেশা। নানা জাতের মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল। পালকি বাহক হিসেবে সাধারণত বাউড়ি, বাগদি (দুলো), মাল, হাড়ি, ঘাসি, রবিদাস আদিবাসীরা কাজ করতো। কাহারের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শিবিকা বাহক, বেহারা, হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ।[২১] কাহারদের বেহারা নামেও অভিহিত করা হয়। বেহারার অর্থ পালকি বাহক, কাহার।[২২] অনেকের মতে ইংরেজি 'বিয়ারার' শব্দ থেকে বেহারা নামের উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু বেহারাদের মাহারা নামে ডাকা হয় এবং মুসলিম বেহারাদের ডাকা হয় দুলিওয়ালা বা সওয়ারিওয়ালা নামে।[২৩] তারা শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে লিখেছেন-কাহার বলে নির্দিষ্ট কোনো জাতি নেই। ভারতের তপশিলভুক্ত জাতির তালিকাতে কেওড়া জাতি অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু কাহার নামে কোনো জাতির উল্লেখ নেই অর্থাৎ কাহার কোনো জাতি নয়। বরং এটি একটি বৃত্তিগত পেশা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাংলা ভাষার অভিধান'-এ কাহার শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে- কাহার সং-স্কন্ধবার, হি. কাহার, বাং কাহারক-যারা কক্ষে করিয়া শিবিকা বহন করে, যানবাহক। হরিজনদের মধ্যে যারা পাল্কী বহন করে তারা কাহার, বাগদীদের মধ্যে যারা পালকী বহন করে তারা বাগদি কাহার নামে পরিচিত। অর্থাৎ পালকি বাহকেরা মূলত কাহার নামে পরিচিত। 'বঙ্গীয় শব্দ কোষে' হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাহার শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রদান করেছেন যার একটি হলো 'কাওরা' (কেওরা) এবং অপরটি হচ্ছে 'শিবিকাদি বাহক হিন্দু জাতি বিশেষ'। নেসফিল্ড কাহারদের জলবাহক ('ক'/কে = জল) বলে তাদের মৎসজীবী বলেই মনে করেছেন। <u>স্যার গ্রেভস্ হগটন</u> সংস্কৃত শব্দ স্কন্ধ + ভার থেকে অপভ্রংশে 'কাহার' নাম

২১. আহমদ শরীফ (সম্পা.), বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মে/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১১৬।

২২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, এম.এ (সঙ্কলিু), সংসদ বাংলা অভিধান, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, জুন/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫২৬।

২৩. সিরাজুল ইসলাম (প্র.সম্পাদক), বাংলাপিডিয়া তৃতীয় খন্ড, ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন/২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬৭।

এসেছে বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ যারা স্কন্ধে ভার বহন করে।[২৪]

পালকি বাহক অর্থাৎ কাহার বা বেহারাদের পেশা কীভাবে পালকি বাহক হলো সে সম্পর্কে কাহারদের মধ্যে একটি কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। সেই কিংবদন্তী থেকে যা জানা যায় তা কিছুটা এমন- 'হিমালয় কন্যা পার্বতীর সাথে শিবঠাকুরের বিয়ে। কিন্তু অতদূর পথ শিবঠাকুর যাবেন কীভাবে ? তাঁর বাহন ষাঁড় বা বৃষের পিঠে চড়ে গেলে লোক হাসাহাসি করতে পারে। যাওয়ার জন্য পালকি ঠিক হলো কিন্তু তা বয়ে নিয়ে যাবে কারা ? নন্দী অনেক ভাবনা চিন্তা করে একটা উপায় বের করে দুর্গাকে বললেন, মা তোমার দেহের ময়লা থেকে যেসব কৃষ্ণকায় পুরুষদের জন্ম হয়েছে, ওরা খুব বলিষ্ঠ, ওদের বললে ওরাই পালকি বয়ে নিয়ে যাবে। তাই ঠিক হলো। শিব ঠাকুরও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর বাউরিরা শিবঠাকুরকে বিবাহ বাসরে পৌঁছে দিয়ে আসলেন।'[২৫]আর তখন থেকেই বাউরি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই পালকিবহন করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

বর্তমান সময়ে পালকি বাহক বাউরি সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। একই সামাজিক মর্যাদায় অন্যান্য বর্ণের অনুসৃত ধর্মের মতোই কাহারদের ধর্ম। ধর্মীয়ভাবে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতোই তারা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মীর পাশাপাশি মনসা পূজাও করে থাকেন। তবে তাদের অধিকাংশই শিব বা শক্তির পূজারী এবং তাদের মধ্যে বৈষ্ণবদের সংখ্যা নূন্যতম। সামাজিক বিচারে কাহারগণ কুর্মি ও গোয়ালা বর্ণের সমকক্ষ।

পালকি বহনের কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কেননা সামনে ও পিছনের বাহকদের সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়। আর এই তাল বজায় রাখার জন্য পালকি বাহকেরা নিজেদের তৈরি এক ধরনের ছন্দ ব্যবহার করতো। যা তাদের শ্রমকে কিছুটা লাঘব করতো এবং পায়ের তাল মেলাতে সহায়তা করতো। পালকি বহনের কাজ সাধারণত বয়স্কদের কাছ থেকে নবীনরা শিক্ষা গ্রহণ করতো।

পালকি বহন সুনির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের কাজ নয়। সাধারণত নিম্নবর্ণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য পেশার পাশাপাশি এই পেশাকে গ্রহণ করেছিল। নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়ের লোকেরা অবস্থার প্রেক্ষিতে এই পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। পালকি বাহকদের পরিচয় দিতে গিয়ে জেমস ওয়াইজ চন্ডালদের, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় হরিজন ও কাহারদের, ড. হাজরা মাহার, উড়িয়া,

২৪. প্রদ্যোত ঘোষ, বাংলার জনজাতি (১ম খন্ড), কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৮৫।
২৫. শুকদেব পরামানিক, লৌকিক স্থলযান: পালকি, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৯৯।

হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের এবং বঙ্কিমচন্দ্র ভোঁজপুরীদের উপজীবিকা হিসেবে পালকি বহনের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে বর্তমান এই আধুনিক সমাজে যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতির ফলে বাহন হিসেবে পালকির ব্যবহার লুপ্ত হয়ে গেছে। সময়ের সাথে পালকি যেমন হারিয়ে গেছে, ঠিক তেমনি হারিয়ে গেছে হুম-হুম-হুম-না, শব্দের ছন্দে ছুটে চলা কাহার/বেহারা পেশাও। তবে পেশার পরিবর্তন যে শুধু এখানেই ঘটছে তা কিন্তু নয়। বরং সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীর সব দেশেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পেশার পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে প্রধানত আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এছাড়া সময়ের চাহিদা পূরনে ব্যর্থ হয়েও লুপ্ত হচ্ছে অনেক পেশার। মূলত এসব কারণেই বেহারা/কাহার পেশাও বর্তমান সময়ে তার উপযোগীতা হারিয়ে ফেলে লুপ্ত হয়ে গেছে সমাজ থেকে।

৯. করাতি: করাতি একটি প্রাচীন পেশাদার শ্রেণি। বড় বড় গাছ কেটে তা থেকে নির্মাণ উপযোগী কাঠ প্রস্তুত করাই ছিল মূলত তাদের কাজ। কাঠ চেরাই-এর জন্য ব্যবহৃত করাত থেকেই এই করাতি নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। করাত এবং করাতির অর্থ করা হয়েছে এভাবে করাত হচ্ছে কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চিরিবার দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ আর করাতি বলা হয়, করাতদ্বারা কাঠ চেরা যাহার পেশা।[২৬] একসময় গ্রামাঞ্চলের পথে প্রান্তরে এই পেশাদার শ্রেণির পদাচরণ ছিল। কাঁধে বাঁশের খাপে ঢুকানো বড় দাঁতওয়ালা করাত, আর ঝোলার ভিতরে রান্না করার সরঞ্জামাদি ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। করাত ছাড়াও করাতিরা কুড়াল, দড়ি, হাতুড়ি, বাটাল, বাইশ, রান্দা ও খিল জাতীয় যন্ত্রপাতি তাদের কাজের জন্য ব্যবহার করতো।

সুনির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায় নয় বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পেশার সাথে যুক্ত ছিল। করাতিদের প্রায় সব অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যেতো। যদিও সারা বছরই করাতিরা গাছ কেটে কাঠ প্রস্তুত করতো। তবুও বিশেষ করে যে মৌসুমে বৃষ্টি হয় না। সেই সময়ে তাদের কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যেতো। তারা কাঠ চেড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তো।

গাছ কেটে ব্যবহার উপযোগী কাঠ প্রস্তুতের জন্য অর্থাৎ গাছ চেড়াইয়ের জন্য তারা গাছের শক্ত ডাল কিংবা বাঁশ আর রশি দিয়ে একটি শক্ত কাঠামো তৈরি করতো। সেই কাঠামোর উপর রাখা হতো গাছ। গাছের উপর অবস্থান করতো একজন/দুইজন করাতি। আর গাছের নিচে থাকত প্রয়োজন মতো

২৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, এম.এ (সঙ্কলিত), সংসদ বাংলা অভিধান, ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, জুন/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫২৬।

তিন/চার জন করাতি। লম্বা হাতলযুক্ত করাত দিয়ে উপর নিচে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে করাত টেনে গাছ চিড়ানো হতো। ছায়াযুক্ত কোনো স্থানে কাঠামো তৈরি করে করাতিরা এই কাজ করতো। তবে বর্তমানে করাতিদের গাছ চিড়ানোর এই দৃশ্য আর চোখে না পড়লেও এক সময় বড় বড় গছ কিংবা আসবাবপত্রের তৈরির উপযোগী কাঠ তৈরির জন্য এই করাতিদের উপরই সম্পূর্ণরুপে নির্ভর করতে হতো।

বর্তমান সময় হচ্ছে যন্ত্র নির্ভর। আর এই যন্ত্রকেই নির্ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। আর এই যন্ত্রের ছোঁয়াও লেগেছে গাছ চেরাইয়ের ক্ষেত্রে। ফলে হারিয়ে গেছে একসময়ের ব্যস্ততম করাতিদের পেশা। আর কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে করাতের সেই ছন্দময় শব্দ। আধুনিক করাতকলগুলো কেড়ে নিয়েছে গ্রাম-বাংলার করাতিদের পেশা। এই পেশাজীবীদের আর চোখে পড়ে না। আধুনিক করাত কল আর কালের বিবর্তন এবং জীবন-জীবিকার তাগিদেই করাতিরা তাদের পেশা বদল করেছে বাধ্য হয়েই। বর্তমানে আধুনিকতার দাপটের কাছে পরাজিত হয়েই হারিয়ে গেছে গ্রাম বাংলার এক সময়ের এই করাতি পেশা।

১০. পাঙ্খাওয়ালা: বিদ্যুৎ চালিত পাখার ব্যবহার শুরুর পূর্বে বিভিন্ন অফিসে কিংবা অভিজাত শ্রেণির মানুষের বাড়িতে গরমকালে টানা পাখা ব্যবহারের রীতির প্রচলন ছিল। আমাদের এই অঞ্চলে দুই একটি জমিদার বাড়িতে এবং কিছু সরকারি অফিসে এর প্রচলন ছিল। আর যারা এই পেশার সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে সাধারণভাবে পাঙ্খাওয়ালা বলা হতো। এই পাঙ্খাওয়ালা পেশা বিশেষ কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। সকল শ্রেণির মানুষই এটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো। অফিস-আদালতে পাখা টানার জন্য একটি পেশার উদ্ভব হয়েছিল। অফিস-আদালতে যারা পাখা টানার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন তাদের বলা হতো পাঙ্খাপুলার।

সাধারণত ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে টানা পাখা ঝুলিয়ে দেয়া হতো। ঘরের আয়তনের উপর ভিত্তি করেই টানা পাখার আকার নির্ভর করতো। সাধারণত একটা কাঠের কাঠামোর উপর মোটা কাপড় দিয়ে টানা পাখা তৈরি করা হতো। অনেক সময়ই কাঠের পরিবর্তে বেত ও বাঁশ ব্যবহার করা হতো এবং কাপড়ের উপর বিভিন্ন ধরনের নকশা করা হতো। টানা পাখার সাথে একটি মোটা দড়ি লাগানো থাকতো। এই দড়ির এক প্রান্ত পাখার সাথে এবং অপর প্রান্ত ঘরের বারান্দায় কিংবা পাশের ঘরে থাকতো। যেখান থেকে পাঙ্খাওয়ালা বা পাঙ্খাপুলারেরা লম্বা দড়ি টেনে টেনে পাখার বাতাস করতো।

সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর, সভ্যতাও আজ উন্নত হয়েছে অনেক। বর্তমান সময়ে গরমে বৈদ্যুতিক পাখা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে পুরাতন সেই টানা পাখার ব্যবহার লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সেই সাথে সম্পূর্ণ ভাবেই লুপ্ত হয়ে গেছে এককালের কষ্টকর পাঙ্খাওয়ালা বা পাঙ্খাপুলার-এর পেশা।

মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে বা জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাকে অবলম্বন করেছে। সেদিক থেকে সে হয়েছে বৃত্তিজীবী বা পেশাজীবী। আর এই পেশা নির্ধারণের পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রকৃতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি। অর্থাৎ স্থান ও কাল ভেদে মানুষের পেশা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এমনকি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের পেশাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। হয়তো একটি পেশার বিলুপ্তি ঘটেছে সৃষ্টি হয়েছে নতুন আর একটি পেশা। পেশাকেন্দ্রীক যে সম্প্রদায় রয়েছে তাঁকে বলা হয় পেশাজীবী সম্প্রদায়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশে পেশাজীবী সম্প্রদায় নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। আর সেকারণেই হয়তো পেশাজীবী সম্প্রদায় নিয়ে খুব বেশি মৌলিক গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়টি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। হয়তো বিভিন্ন পেশার বিলুপ্তি কিংবা বংশানুক্রমিক পেশা পরিবর্তনই এর অন্যতম প্রধান কারণ।

বেশ্যাজীবন: প্রেক্ষাপট রংপুর

নূরুননবী শান্ত

২০১২ সালের দিকে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের বেশ্যাদের খোঁজে ছুটে বেড়াতে শুরু করলাম। পুলিশের এক বড় কর্তার পরামর্শে রংপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের রিডারের শরণাপন্ন হলাম। রিডারের কাছে জেলার অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও এসব কাজে জড়িতদের তথ্য থাকে বলে জানিয়েছিলেন ডিআইজি সাহেবের স্টাফ অফিসার। রিডার সাহেবকে বললাম, 'আপনার কাছে কি এই শহরের বেশ্যাদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইতে পারি?' রিডার মুচকি হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'আমার কাছে তো সব ক্রিমিনাল ইনফরমেশন পাবেন! খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি, সন্ত্রাস– এইসব পাবেন। দেহব্যবসা নিয়ে তেমন কিছু তথ্য তো আমার কাছে থাকে না। আমি তো অপরাধ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য রাখি।' তিনি আমাকে শহরের মেয়রের বাড়ির পিছনের একটি ঠিকানা দিয়ে সেখানে খোঁজ করে দেখতে বললেন।

মেয়রের বাড়ির পিছনে ছিল দরিদ্র নির্যাতিত নারীদের এক পুনর্বাসন কেন্দ্র। এখন নেই। বেশ্যা সম্পর্কে পুলিশের ধারণা আমাকে একটুও আহত করলো না। পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেলাম সামান্য। দৃষ্টভঙ্গি দ্বান্দ্বিক বটে।

এক. বেশ্যাবৃত্তি ক্রাইম।

দুই. বেশ্যাবৃত্তি ক্রাইমের আওতায় পড়ে না।

খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, সন্ত্রাস ইত্যাদি ক্রাইম। কিন্তু নির্যাতিত হয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা নারীদের বেশ্যাসম গণ্য করা কি ক্রাইম, না ক্রাইম নয়? মানে এই ভাবনাটা: ধর্ষণ একটি অপরাধ; ধর্ষণের মতো অপরাধের শিকার একজন নারী বেশ্যা! এসপির কার্যালয়ে গিয়ে রিডারকে একটা শিক্ষা দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। সময় কই? কীই বা হবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাহাস করে? বেশ্যা খুঁজে পেতে হবে আমাকে। বেশ্যা দেখতে কেমন? কেন সে বেশ্যা? বেশ্যা কি সমাজের অচ্ছুৎ বাসিন্দা? একজন বেশ্যা নিজেকে কীভাবে বিচার করে?

যার সাথেই কথা বলি, তিনিই চোখ টেরা করে আমাকে দেখেন। আমার মুলব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। শেষে একজন বন্ধুকে বুঝিয়ে বলতে পারলাম আমার উদ্দেশ্য। এ অঞ্চলে বেশ্যাবৃত্তির উপর নির্ভর করে যাদের সংসার

চলে, যাদের সন্তানেরা ‘সবার জন্য শিক্ষা’র আওতায় আসতে পারে, তাদের জীবন-যাপনের ধরন জানতে হবে আমাকে। বন্ধু আমার মধ্যে বেশ্যাদের প্রতি মানবিক দরদ আবিষ্কার করেন। তার সাথে কয়েকজন বেশ্যার সখ্য আছে জেনে আমি আশ্বস্ত হই।

সেদিন মাঝরাত পেরিয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথ ধরি। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি কুৎসিত মেকাপে ঢাকা জীর্ণ কয়েকটা মেয়ে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ এরশাদ পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে। চুপচাপ অপেক্ষা করছে, হঠাৎ একটা গানের কলি বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে, গা মোচড়াচ্ছে- এই কি বেশ্যাদের চেহারা? বেশ আলাদা করা যাচ্ছে আত্মীয়া ও পরিচিতাদের থেকে।

পরের দিন রিঙ্কুর সাথে আলাপ। আমাদের পাড়ার স্মার্ট ছেলেদের একজন। রিঙ্কু আমার হাত ধরে কিছুতেই ছাড়ে না। বলে, ‘বেশ্যা লাগবে কেন? আমিই আপনের সাথে ঘুরবো। আপনে আমার সাথে একটা রাত কাটায়ে দেখেন, অন্তত একটা ঘণ্টা, ভুলতে পারবেন না। অনেক মজা দেবো। কসম করে বলতে পারি, ভাবি আপনাকে এত সুখ দিতে পারবে না’।

আমি পালাবার চেষ্টা করি। হাত টেনে ধরে রিঙ্কু। আবার আমারও কৌতুহলও জাগে। জিজ্ঞেস করি, ‘কীভাবে? তুমি না ছেলে!’ রিঙ্কু মেয়েদের চেয়েও মোহনীয় ভঙ্গিতে হেসে ওঠে। বলে, ‘লোকে আমাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে, আপনি আমার মর্ম বুঝলেন না’।

আমি বললাম, ‘আমার টাকা নাই’। রিঙ্কু বললো, ‘সব খরচ আমার, আপনে খালি একবার রাজি হন’।

আমি হাসলাম। রিঙ্কু বললো, ‘মাঝে মাঝে এমন হয়, জানেন, মাঝ রাতে অস্থির লাগে, রাস্তায় হাঁটি, পেটানো শরীরের পুরুষ খুঁজি। নিজেকে কামড়ে, কেটে টুকরো টুকরো করতে ইচ্ছে করে। আমি আঁতকে উঠি। ‘হবে এখন একদিন’, বলে ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে মিশে যাই।

রিঙ্কু কি বেশ্যা? ছেলেরাও বেশ্যা হয় তাহলে। শহরের কয়েকটা জায়গায় একদল বন্ধুসহ রিঙ্কুকে আড্ডা দিতে দেখেছি অনেকবার। হাঁটার সময় ওদের সবার পাছা দুলে দুলে ওঠে। কিন্তু এরকম একবারও মনে হয়নি ওদের সম্পর্কে আগে। রিঙ্কুর বন্ধুরাও কি বেশ্যা? নাকি সমকামী?

বেশ্যাদের পরিচিত সেই বন্ধুর কথা পরে বলি। আগে কমলের (ছদ্মনাম) কার্যক্রম বলে নেওয়া দরকার।

রেল কারখানা ঘিরে জেগে থাকা সৈয়দপুর শহরের বেশ্যাদের সহবত

শেখান কমল। কীভাবে কাস্টমারদের কনডম ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায়, কী করলে এইডসের ঝুঁকিমুক্ত থাকা যায়, যৌবন ঝুলে যাওয়ার আগেই কী বিকল্প পেশায় নিয়োজিত হওয়া যায়...! এইসব শিক্ষা দেন তিনি বেশ্যাদের। বেশ্যাদের সন্তানদের লেখাপড়াও শেখান তিনি। শুধুমাত্র মায়ের অভিভাবকত্বে বেশ্যাদের সন্তানদের ভর্তি করিয়ে নিতে প্রাণমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সাথে, শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে তাকে বাহাস করতে হয়।

মানবাধিকার, শিশু অধিকার নিয়ে লম্বা বক্তৃতা দিতে দিতে কমলের গাল ওনার পুনর্বাসন কেন্দ্রের বেশ্যাদের মতোই অমসৃণ, ফাটা ফাটা হয়ে উঠেছে। কমল বেশ্যা সমাজের প্রতি মহান দায়িত্ব পালন করছেন বলে বেশ্যারা তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তিনি আমার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। বলেন, "বেশ্যা বলেন, ক্যান? যৌনকর্মী বলাটাই শোভন হয়। বিশ্বব্যাপী যৌন ব্যবসা স্বীকৃত। দে আর সেক্স ওয়ার্কার। ইউ শুড নট এড্রেস দেম উইথ হিউমিলিয়েটিং টার্ম। কল গার্ল শব্দটাও ঠিক না। আপনি যৌন তাড়না বোধ করলেন। একজন পেশাদার মেয়েকে কল করলেই তো সে আসতে বাধ্য না। শি হ্যাজ দ্য রাইট টু ডিসাইড নট টু বি ফাক্‌ড। ইউ হ্যাভ টু নেগোশিয়েট। তার সাথে আপনার শোভন আচরণ করতে হবে। আপনি তার যৌনতা পয়সা দিয়ে কিনবেন। সে তো ব্যবসা করে। তার অধিকার আছে আপনার কাছে সম্মান পাওয়ার। দেহপসারিণী বললেও মনে হয় যেন একটা মেয়ে জঘন্য পাপকাজে ডুবে আছে। ঠিকাছে, সে পাপ করে। কার সাথে করে। হু ইজ দ্য শেয়ার হোল্ডার অফ হার সিন? আপনি। মানে কাস্টমার। একজন পুরুষ। নারী কাস্টমারের কথা শুনেছেন কখনো? আপনার চাহিদাও তো পাপ, নয় কি? আপনি একটা পণ্য কিনবেন। আর একজন বেচবে। আপনি না কিনলে সে তো জোর করছে না! সে কোথায় বেচবে তখন? এমন ঘটনা কি শুনেছেন যে একজন বেশ্যা জোর করে কাউকে কাস্টমার হতে বাধ্য করেছে? পাপ তো ক্রেতার সামান্যও কম নয়। শুধু বিক্রেতা কেন দায়ী হবে! শোনেন, ভাই, নো প্রোসটিটিউট, নো খানকি, নো মাসি, নো পতিতা, নো বেশ্যা, নো কল গার্ল, নো চোদনখাকি, নো নটি, নো মেয়ে মানুষ, নো চামড়া, নো কাঁচামাল; অনলি যৌনকর্মী। সেক্স ওয়ার্কার। নিষিদ্ধ পল্লী কথাটাও ভুল। ওটা হবে সেক্স ট্রেড সেন্টার। যৌন ব্যবসা কেন্দ্র। দেহ ব্যবসায় কথাটাও ডাজ নট সাউন্ড সিভিল। ইয়েস, ইউ শুড আইডেন্টিফাই দেম এজ সেক্স ওয়ার্কার। হ্যাঁ, এইটা ভালো না। কিন্তু খারাপ কি খালি এই একটা কাজই? যৌনকর্মীরা, দে আর হিউম্যান বিং। আর দশটা লোকের যেমন পাপ-পুণ্য

আছে, ওদেরও আছে।"

কমলের ঠোঁটের দুই কোণায় থুতু জমতে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। একজন নার্স চা এনে দিলেন। কমলের দপ্তরের দেয়ালে কনডম ব্যবহারের সঠিক নিয়মের সচিত্র পোস্টার। সুস্থ যোনির দম আটকানো ছবি আছে। আবার গা শিউরে তোলার মতো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিস আক্রান্ত যোনির বিভৎস ছবিও আছে। নার্স মেয়েটির হাতে একটি ফ্লিপচার্ট। যৌনরোগ নিয়ে তিনি যৌনকর্মীদের শিক্ষাদান করবেন। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর যৌনকর্ম।

কমল বললেন, সেশনে বসবেন? আমি খানিকক্ষণ বসলাম। যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব আলোচনা হচ্ছে। মন দিয়ে পাঠ নিচ্ছেন তিরিশজন বেশ্যা। প্রশ্নোত্তর পর্ব আমার কান গরম করে দিচ্ছে। কিন্তু যৌন বিশেষজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে বসে আছি।

এই কেন্দ্রের পোশাকি নাম ড্রপ-ইন সেন্টার। একটি এনজিওর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। এর উদ্দেশ্য বেশ্যাদের মাধ্যমে এইচআইভি এইডস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা, বেশ্যাদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা এবং আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের বিকল্প পেশায় উদ্বুদ্ধ করা। ২০০৪ সালে এটা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এলাকার মানুষের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। প্রভাবশালীদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও অনেকেই এটাকে বেশ্যালয় বিসেবেই বিবেচনা করতো। সদর দরোজার সামনে ভিড় জমাতো বখাটেরা এবং কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তো। প্রশাসন ও পৌরসভার নেতাতের সহায়তায় আস্তে আস্তে এই ড্রপ-ইন সেন্টার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

অন্তত দুজন বেশ্যার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপের বাসনা প্রকাশ করলাম, কমলের কাছে। কমল একটা আঁটোসাঁটো ঘরে আমার বসার ব্যবস্থা করলেন। একজন বয়স্ক বেশ্যা এলেন। কমলের কেন্দ্রের আউটরিচ কর্মী। সহবত শিখতে আসা বেশ্যাদের সর্দার। মাসি। সৈয়দপুরের সুপরিচত মুখ। তাকে বললাম, 'সবাইকে তো স্বাভাবিক নারী ও শিশু মনে হচ্ছে। আপনি এই পেশায় আছেন, আপনাকে দেখে ভাবতেই পারছি না'।

মাসি বললেন, 'চলেন, আপনাকে একটা জায়গা দেখাই। আপনের মান-সম্মান না গেইলে আমার সাথে হাঁটতে পারেন'। তাঁর সাথে হাঁটতে হাঁটতে ব্রডগেজ রেল লাইনের ধার ধরে একটি মাজার পেরিয়ে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ঘিঞ্জি কলোনির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কলোনির দেয়াল ঘেঁষে বাঁশঝাড়। তার তলে গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে

জনাদশেক যুবক। পাশেই ফসলের ক্ষেত। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে আরেক পা বাঁকা করে ক্ষেতের আলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোরী। মাসি বললেন, 'ওই যে, দ্যাখেন স্যার, দুপুরের পরেই এই মেয়েটাকে ওরা লাইনের ধারে শোয়াবে। কত আর দেবে? দশজনায় মিলে বড়জোর একশ টাকার দুইটা নোট! অনেকবার ধরা পড়লো মেয়েটা। বাপের মাথায় হাত দিয়ে কলোনির লোকের কাছে কথা দিলো– আর এ কাম নেহি করবে, কিন্তু নেশা জন্মে গেইছে! গায়ের জ্বালাও মিটলো, টাকাও কামাই হইলো'।

বললাম, 'তাই বলে দশজন?' মাসি বললেন, 'এই শালা জারুয়ার বাচ্চাগুলার ক্ষ্যামতাও তো মুরগির মতো। গায়ের উপ্রে ওঠে, ঢুকায়া দেওয়ার আগেই শালাদের মাল আউট...। টাকা ফালায়া চলি যায়, মেয়েটা ছটফট করতে করতে টাকা হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠে, দৌড়ে কলোনীতে ঢোকে। কী করবে? অভাব। স্বভাবও আছে। বাপটা তো শালা গাঞ্জা খায়া উবুত হয়া পড়ে থাকে'।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অল্প বয়সী একটা ছেলে মাসিকে সালাম দেয়। মাসিও তার কুশল জিজ্ঞেস করেন। রেল লাইনের উল্টোদিকে নিচু জমিগুলো দেখিয়ে বলেন, 'এইসব জায়গায় মাসে-দুইমাসে জিন্দা হোক, মরা হোক একটা না একটা বাচ্চা পড়ে থাকে। মেয়েগুলা কী করবে? কাস্টমাররা কনডম নিতে চায় না। অসভ্যের জাত এক একজন। ভেতরে মাল না খসাইলে বোলে টাকা উসুল হয় না। মেয়েগুলা লাইনের ধারে বাচ্চা খালাস করে ফালায়ে রাখে যায়...। গেল বছরের ঘটনা বলি, একটা বাচ্চার কান্না শুনে মাজারে আসা এক লোক তাকে উঠায়া নিয়ে গেল। শুনছি বোলে নিজের মেয়ের মতোন মানুষ করতেছে। জগতে কত রকম মানুষ আছে যে স্যার'।

অতীতের কথা শুনি মাসির কাছে। সৈয়দপুরে বিরাট পাড়া (বেশ্যাপল্লী) ছিলো। এই তো জিয়াউর রহমানের আমলেও। তারপর সেটা উঠে গেলো। মাসির তখন ভরা যৌবন। পাড়ার মেয়েগুলো অমানবিক কষ্টের মধ্যে পতিত হলো। একজন দালালের সহায়তায় তার ঠাঁই হলো একেবারে দক্ষিণের বানিশান্তা পল্লীতে। কিন্তু নানান ঘটনার পাঁকে পড়ে তিনি ২০০০ সালের দিকে আবার সৈয়দপুরেই ফিরে এলেন। মাসি বললেন, 'আমি না থাকলে তো কত মেয়েই ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিতো। আমি ওদের বুঝাই, যার কেউ নাই, কিছু নাই, তার আবার ইজ্জত কী? আয়, এই কাম করি বাঁচি থাকা তো যায়! পরে মনে হইছে, আমি ঠিক করি নাই। মরে গেইলেই ভালো। যারা গোপনে আমাদের কাছে আসে, তারাই দিনের বেলায় আমাদের দিকে আঙুল তাকায়া

হাসাহাসি করে। ফতোয়াও দেয়। আমরা খারাপ মেয়ে। আমরা বেশ্যা। ঘুষ নেওয়া লোকেরা ভালো, ঘুষ দেওয়া লোকেরাও ভালো। একটা খুনির দিকেও সমাজের লোক সমীহের ভাবে তাকায়। মাস্তান-ডাকাত মরে গেলে তাদেরও জানাজা হয়। আমরা মরে গেলে লাশটা খাওয়ার মতো শকুনও আর দ্যাশে নাই।'

মাসির দিকে তাকালাম। তার মুখে রাগ, ক্ষোভের চিহ্ন নেই; হাসি ঝুলে আছে। তার কথাগুলো নতুন যে শুনলাম তাও নয়। এসব নিয়ে পত্রিকার এক-দুইটা প্রতিবেদন পড়েছিলাম। তবু আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হতে থাকলো।

মাসিকে বললাম, 'কমল সাহেবের কেন্দ্রে কয়েকজন বাচ্চা মেয়েকে দেখলাম। কীভাবে সম্ভব?' মাসি বললেন, 'এখন স্যার মুখ দিয়ে করায়ে নেয় বেশি। পায়ের ফাঁকের মধ্যেও করে। কারো কারো ফাটি-ফুটি রক্তারক্তি হয়। অজ্ঞান হয়্যা যায়। গরিবের তো চিকিৎসাও নাই। চিকিৎসা করাতে গেলে ধর্ষণের কেস দিতে বলে। নিজেরই মান যায় যায় হয়। ঘাও এমনিই শুকায়া যায়। আস্তে আস্তে মানায়া যায়'।

কয়েকটা মুখ মনে পড়লো, কত আর বয়স। স্তন পুরো গঠিতই হয়নি। তবু সে রাস্তায় নেমেছে। শুধুই কি অভাব আর অত্যাচারে তাড়িত হয়ে? কয়েকটা মেয়েকে তো আলাদা করে নিয়ে এলে সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান বলেই বিবেচনা করতে হবে। এক কমলের কেন্দ্রেই নাম রেজিস্ট্রি করেছে ৫ শয়েরও বেশি বেশ্যা। ছোট্ট ঘিঞ্জি শহর সৈয়দপুরেই ১ হাজারেও বেশি মেয়ে যৌনতা বিক্রি করে। হয়ত তারও বেশি। নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় হিসেব রাখাও কঠিন। মাসি বলেন, 'আপনার চেয়েও ভদ্র মানুষ দেখছি। ঘরে সুন্দর বউ। সেও আমাদের কাছে আসে। ক্যান আসে জানেন? কয় বোলে, বউ কাপড় খোলে না। ব্লু ফিল্মের মেয়েদের মতো ডগি স্টাইল বোঝে না। চোষে না। কীরকম বেজন্মা চিন্তা করে দেখেন স্যার। সেই জন্যে বউ দিয়ে হয় না। পরকীয়াও করে। তাতেও হয় না। বেশ্যা লাগে। তবে স্যার আপনার কাছে মিথ্যা বলব না। এই বেজন্মারাই আমাদের নারায়ণ। দ্যাশে হাত বেজন্মা বাড়বে আমাদের ব্যবসা ভালো হবে। আমাদের কামাইয়ের ভাগ অনেকেই খায়। আমরা আছি বলে অনেক মাস্তান স্টাইল করে চলে, আমাদের টাকায়। পুলিশের কনস্টেবল বেনসন সিগারেট খায়, আমাদের টাকায়। আমাদের মতো বেশ্যাদের হাতেও টাকা থাকে বলে সৈয়দপুর শহরেও তো বড় বড় ঝকঝকা মার্কেট তৈরি হইছে।'

বেশ্যার সন্তানের বয়স বাড়ে ক্লেদুতা, অশ্লীলতা, আর খিস্তির রাজ্যে।

যেমন, তিথির (ছদ্মনাম) কোলে ছয়মাসের সন্তান। তবু তাকে সৈয়দপুরের এই হোটেলে সেই হোটেলে ভাড়ায় যেতে হয়। বাচ্চাটা কাঁদে। পাশে শুয়ে বা দরোজার বাইরে দালালের কোলে। মাকে ভোগ করতে থাকে অচেনা খদ্দের। বাচ্চার জন্য কম রেটেই দেহ বেচতে হয়। কম হলেও, নিজের পেটের জ্বালা মেটে, বাচ্চার দুধ কেনা যায়। এই বাচ্চা তার মাকে খানকি হিসেবে চিনতে চিনতে বড় হয়। সমাজে খানকিদের জায়গা নেই, খানকি মানে খারাপ মেয়ে মানুষ, জানতে জানতে বড় হয় বেশ্যার সন্তান। তার মায়ের জায়গা জাহান্নামেও হবে না জানতে জানতে এক সময় নিজেও জাহান্নামের পথে পা বাড়ায়।

কমলের চেষ্টায় কোনো বেশ্যা পেশা বদল করতে চেয়েও সমাজের লোকের সহায়তা পায়নি। এক বেশ্যা খুব ভালো দর্জির কাজ শিখেছিল। বেশ্যা ছিল বলে তার কাছে কেউ বস্ত্রের অর্ডার দিতে চায় না। আর বেশ্যারও সাইকো সমস্যা হতে থাকে। থেকে থেকে তার শরীরের ভেতরে অভ্যাসজনিত প্রবণতা তাকে স্বাভিকতায় ফেরার রাস্তা থেকে চ্যুত করে। 'একবার বেশ্যাগিরি শুরু করে ভালো মেয়ে হয়্যা যাওয়া, এতো সোজা না', মাসি বলেছিলেন।

কিন্তু কেবলই কি গরিব, অসহায় মেয়েরাই বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেয়?

এবার আমি রংপুর শহরে বেশ্যা খুঁজতে থাকি। এক চাইনিজ হোটেলে আমার সেই বন্ধু, যার সাথে বেশ্যাদের সখ্য আছে, পরিচয় করিয়ে দেয় এক দালালের সাথে। এরকম দালাল রংপুরেই আছে জনা পঞ্চাশেক। আনুমানিক হিসাব। দালালই জানায়। কেউ গ্রাম থেকে শহরে এসে রিকশা চালাতে চালাতে বেশ্যার দালাল হয়ে ওঠে। কেউ হোটেল রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারার কাজ করতে করতে বেশ্যার সেক্রেটারি হয়ে যায়। গোপনে। কেউ জানে না। টাকা না পেলে পুলিশ পেঁদায় বেশ্যার দালালি করার অপরাধে। টাকা পেলে পুলিশ হোটেলগুলোকে প্রটেকশন দেয়। দালালদের সাথে হেসে হেসে কথা বলে।

যাহোক, বেশ্যাবৃত্তির স্বীকৃতি নেই। সুতরাং এটা নিয়ে প্রকাশ্য কথা বলা নিষেধ। এ বিষয়ক ডকুমেন্ট কারো কাছে নেই। সুতরাং বেশ্যা আর দালালদের দেয়া তথ্যের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। সৈয়দপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম মিলে বেশ কয়েকজন বেশ্যা আমার সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছিলেন। চারজন মাত্র দালাল স্বীকার করেছেন তাদের পেশার কথা। তাদের দেওয়া তথ্যগুলো পরিবেশন করে নিই।

রংপুর শহরে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত আছে পাঁচশয়েরও বেশি নারী।

তাদের মধ্যে ৪০% আসেন লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম জেলা থেকে। ৪০% আসেন নীলফামারী-পঞ্চগড়-দিনাজপুর থেকে। বাকি ২০% রংপুরে বসবাস করেন। বাড়ি ভাড়া নিয়ে। মেসে। রংপুরের স্থানীয় যেমন আছেন, তেমনি বরিশাল-যশোরের আছে, আছে ঢাকা হতে আগত মেয়ে। গাইবান্ধা এলাকার বেশ্যাদের রংপুরের সাথে যোগাযোগ নেই। তারা যায় বগুড়ায়। গাইবান্ধাতেও খদ্দের কম মেলে না। জনা কুড়ি পুরুষ (হিজরা ও সমকামী) বেশ্যাও আছে রংপুরে। তাদের খদ্দেরও পুরুষ। নারী খদ্দের নেই।

রংপুর অঞ্চলের বেশ্যাদের বয়স ১২ থেকে ৫৫। পথশিশুদের (মেয়ে) অল্প বয়সে বেশ্যা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বয়স্ক বেশ্যারা ওরাল সেক্স বিক্রি করে বেশি। এ সময় কায়দা করে দাঁতের সাথে কনডম আটকে নেয়। বয়স্ক বেশ্যারা দালালিও করে, শিশু ও কিশোরীদের বেশ্যাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে সুযোগ পেলেই। তখন তাদের পরিচিতি হয় খালা বা মাসি। যার আন্ডারে বেশি বেশ্যা, সেই ততো ক্ষমতাশালী মাসি। মাসিদের সাথে দালাল, পুলিশ ও মাস্তানদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি হয়। হোটেল বয়, রিকশাওয়ালা, ড্রাইভার ছাড়াও দালাল আছে। মাস্তানরা খদ্দের ধরিয়ে দেয়। তখন তারা বেশ্যা ও খদ্দের উভয় পক্ষের কাছেই বখরা নেয়। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো বখরা পায় না। নেশাখোর ও জুয়ারু স্বামীও দালালের ভূমিকা পালন করে। বেশ্যাদের বন্ধু-বান্ধবীরাও দালালি করে; তবে তারা বখরা নেয় না। পরিচিত বেশ্যার প্রতিবেশিও খদ্দের ধরে দিয়ে থাকে; এই পদ্ধতি লালমনিরহাটের এক বেশ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হয়ত আরো আছে। আমি জানি না। নীলফামারীর সৈয়দপুরে দেখলাম, বাবা-মাও কয়েকজন বেশ্যার পেশাদার সহায়ক।

এক পরিবারের চার সদস্যের থাকার জন্য একটাই ঘর। সেই পরিবারের মেয়ে একমাত্র ঘরে খদ্দের তুলেছে দিনের বেলাতেই। আর অসুস্থ বাবা চৌকাঠে বসে, পাহারা দিচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে এই লেখকের।

গত শতকের আশির দশক পর্যন্ত বেশ্যালয় ছিলো রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও সৈয়দপুরে। গাইবান্ধার তুলসিঘাট ও অধুনাবিলুপ্ত কামারগানি বন্দরেও ছোট ছোট বেশ্যালয় ছিল। এ অঞ্চলের প্রধান বেশ্যালয়গুলো উচ্ছেদ হয় ১৯৮৫-১৯৮৬ সালের দিকে। তখন বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের ছায়ায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের পুনর্জাগরণের সময়। যারা খদ্দের ছিলো, তারাই অদৃশ্য প্ররোচণা পেয়ে লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধার বেশ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের ফুলকি বেশ্যালয়ের চতুর্দিকে বাড়িতে গিয়েও পড়েছিল।

বেশ্যাদের আতঙ্ক আক্রান্ত করেছিল, সাধারণ মা-বোনদেরও। বেশ্যাজীবন যে বেছে নেয়, সে যে কারো না কারো বোন, কারো না কারো মা। সে কেউ না হলেও মানুষ তো বটে। তার খদ্দেররাও মানুষ বটে।

বেশ্যাদের জীবনে সে এক ভয়ঙ্কর সময়। এটা কে না জানতো যে বেশ্যালয়ের বেশিরভাগ বাসিন্দা নারী ও শিশু। কিন্তু প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা দেয়নি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আর হেসেছে এরশাদ শাহীর পুলিশ। বেশ্যারা চেষ্টা করেছে পালিয়ে যেতে। শিকার হয়েছে শারীরিক নির্যাতনের, ছিনতাইয়ের লুটের, ধর্ষণের। দুর্বৃত্তরা শকুনের রূপে খুবলে খেয়েছে বেশ্যাজীবন। এই তো, গেলো শতকের আশির দশকের মাঝামাঝিতে। যতদূর মনে পড়ে, কেবল সৈয়দপুরেই স্বাভাবিক উচ্ছেদ হয়েছিল। বাকি সব জায়গায় যা হয়েছে, তাকে এক কথায় বলা চলে সাবোটেজ। হায়রে, বেশ্যালয় পোড়ালেই বুঝি বেশ্যাবৃত্তি থেমে থাকে? খরার তাপে ক্ষেতের ধান পুড়ে গেলেই বুঝি মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি মরে যায়?

রংপুর অঞ্চলের বেশ্যালয়গুলো উচ্ছেদ করার পর সমাজের ভদ্রলোকেরা হয়ত ভেবেছিলেন যে বেশ্যাবৃত্তিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাস্তবতা হলো, এরপর বেশ্যাদের ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে ভাড়া বাসায়, রাস্তায়। তিন দশক পরের চিত্র হলো, এটা এখন চিহ্নিত করাই সম্ভব নয় যে, কে বেশ্যা আর কে বেশ্যা নয়। সাধারণ মেয়েদের কুপ্রস্তাব পাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ্যাদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই আবাসিক হোটেল নির্ভর। রংপুর শহরের অদূরে পাগলাপীরের বিনোদন কেন্দ্র ভিন্নজগতের বিলাশবহুল মোটেলেও বেশ্যাদের নিয়মিত যাতায়াত আছে। শহরের সুরভি উদ্যান, চিড়িয়াখানা, মাহিগঞ্জের তাজহাট, নাচনিয়ার বিল এসব জায়গাও বেশ্যাদের অভয়ারণ্য। ৩০% বেশ্যা বাসাবাড়িতেই যৌনতা বিক্রি করে। বাকি ২০% ভ্রাম্যমান। কখনো ট্রাকের পেছনে, কখনো পাবলিক টয়লেটের আড়ালে, পার্কের গাছের নিচে, শহরতলীর ফসলের ক্ষেতে, বস্তির কানাগলির মাথায়, পরিত্যাক্ত ভবনের ভেতরেও চলে আদিম এই ব্যবসা। একজন দালাল শহরের ব্যস্ততম সড়কের ধারের একটি মসজিদের পাশের একটি চারতলা ভবন দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে এক খালা থাকে। দিনের বেলা এখানে কারমাইকেল কলেজের রিমা আসে, লালমনিরহাটের বাংলাবাজার আর কুড়িগ্রামের ছিনাই থেকে কয়েকটা মেয়ে আসে খালার আত্মীয়া পরিচয়ে। ব্যবসা হয় শুধুই দিনের বেলা আর বিষ্যুদবার রাতে।' রিমার (ছদ্মনাম) সাথে পরে আমার কথা হয়। সেকথা পরে বলবো।

খদ্দেরদের ৫০ ভাগই ড্রাইভার। ট্রাক ড্রাইভারদের বেশ্যাপ্রীতি রংপুরেও বিখ্যাত। ৪০% খদ্দের পর্যটক। তারা বেড়াতে (খুব কম) বা কর্মোপলক্ষ্যে হোটেল-মোটেলে রাত কাটান। বয়-বেয়ারারাই বেশ্যা যোগাড় করে দেয়। তবে ১০% খদ্দের স্থানীয় পুরুষ। রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে কোটিপতি ঠিকাদার। পয়সাওয়ালারা ছাত্রী পছন্দ করে বেশি। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বেশ্যা হলে শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ খদ্দেরদেরই সেবা দেয়।

হ্যাঁ, রংপুর শহরের বেশ্যাদের ২০% নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সন্তানদের, ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে, প্রসাধনী ও পোশাক কেনার টাকা সংগ্রহ করতে এরা দেহ বেচে। রিমার কথা বলি। কারকাইকেল কলেজের কাছে লালবাগের এক মেসে থাকে। প্রথমবার নিজের যৌনতা বিক্রি করেছিলো পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা যোগাড় করার জন্য। প্রথম খদ্দের ছিল গৃহশিক্ষক। বিস্তারিত পরে বলি। যাইহোক, ৫০% বেশ্যাই আসে হত-দরিদ্র পরিবার থেকে। তাদের উপার্জনের টাকায় সংসার চলে। গ্রামের লোকেরা জানে যে, তাদের গ্রামের মেয়ে ঢাকায় গার্মেন্টসে কিংবা অন্য কোথাও চাকরি করে।

রংপুরের বেশ্যাদের শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রী। অনেক ছাত্রী গরিব পরিবারের। তারা যৌনতা বিক্রির টাকা গ্রামের বাড়িতে পাঠায়। মা-বাবাকে বলে, প্রাইভেট পড়ানোর বেতন থেকে পাঠালাম। বিলাসিতা থেকেও কেউ কেউ এই রাস্তায় নামে। রিমার কথা বলি। রিমার বাবা দিনাজপুরের বিরলের এক গ্রামের বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। একই স্কুলের আরেক তরুণ শিক্ষক রিমাকে প্রাইভেট পড়াতেন। কোনো সম্মানি নিতেন না। এসএসসি পাশের (এ+) পর রিমা ভর্তি হলো দিনাজপুর মহিলা কলেজে। কিন্তু দিনাজপুর শহরে মেয়ের থাকা-খাওয়ার খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না গরিব শিক্ষক বাবার পক্ষে। পরিস্থিতির সুযোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন সেই নিখরচার গৃহশিক্ষক। বিনিময়ে মাঝে মাঝেই দিনাজপুরে এসে হোটেলে ডেকে নিয়ে ভোগ করতে শুরু করলেন রিমার দেহ। এভাবেই রিমা এইচএসসিতেও এ+ পেয়ে পাশ করলেন। ২০১০ সালে ভর্তি হলেন অনার্সে। কারমাইকেল কলেজে। তারপর মেসের এক সিনিয়র বান্ধবীর মাধ্যমে নিজেই সন্ধান পেয়ে গেলেন বিশাল যৌনতার বাজারের। রিমা এখন পেশাদার বেশ্যা। সাধারণত দিনের বেলাতেই তার ব্যবসা। তবে বৃহস্পতিবারে অনেক সময় রাতও কাটাতে হয় বাইরে, বাড়ি যাবার নাম করে। যৌনতা বেচার টাকায় ওর নিজের তো বটেই, ছোট তিন ভাই-বোনের লেখাপড়ার খরচও

মিটে যাচ্ছে দিব্যি। রিমার মতো দরিদ্র পরিবার থেকে আসা বেশ কয়েকজন নারী শিক্ষার্থীকে জীবন-যাপনের সহজ ও রোমাঞ্চকর বেছে নিতে হয়েছে। মানুষ তো দেখে বাইরের লেবাস। খুব গোপনে কার কতটা রক্তপাত হয় কে তার খোঁজ রাখে।

রংপুরের বেশ্যাদের শতকরা ১০ ভাগ গৃহিনী। সেইসব গৃহিনী যাদের স্বামী পরবাসে। কিংবা স্বামী বেকার। কর্মে অক্ষম অসুস্থ স্বামীর দায়ও নিয়েছেন কেউ কেউ। কারো কারো স্বামীর জুয়া খেলার বা নেশার টাকা যোগাড় হয় বেশ্যাবৃত্তির কল্যাণে। স্বামীই বাধ্য করেছেন কাউকে যৌনতা বেচতে। বাকি ২০% বেশ্যা হয় গরিব বিধবা নারী (বাল্য বিবাহের শিকার হয়েছিলেন), অথবা স্বামীর যৌন ক্ষমতা নেই, শ্রমজীবী (নির্মাণ শ্রমিক, পরিচ্ছন্ন কর্মী, হোটেল/রেস্টুরেন্টের আয়া) নারীও আছেন, আর আছেন গৃহহারা পরিবারের নারী। লিঙ্গ প্রতিবন্ধীরা বেশিরভাগই বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে যায়।

দালালদের তথ্য যা পাওয়া গেলো, তাতে দেখা যাচ্ছে ৬০% দালালই হচ্ছেন হোটেল-রেস্তোঁরার কর্মীরা। রিকশাওয়ালা আছেন ১০%। আশেপাশের গ্রাম থেকে শহরে এসে বেশ্যার দালালি যারা করেন তারা মোট সংখ্যার (আনুমানিক) ২০%। আর বান্ধবী, স্বামী, স্বামীর বন্ধু, নিকটাত্মীয় আছেন ১০%। একজন পুলিশের কন্সটেবলও আছেন দালালদের দলে। দালালদের কাজ সবচেয়ে সোজা। শুধুমাত্র বেশ্যা ও খদ্দেরের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। একেকজন দালালের কাছে ২০-৩০ জন বেশ্যার মোবাইল ফোন নম্বর আছে। একই বেশ্যার সাথে অলিখিত চুক্তি আছে একাধিক দালালের। তবে পর্যটক খদ্দেরদের জন্য মদ, গাঁজা, ইয়াবা যোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব দালালদের কাঁধে পড়ে। দালালরা সবসময় নিজে মাদক সংগ্রহ করে দেয় না। বিক্রেতাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে দেয় খদ্দেরকে। খদ্দেরদের সঙ্গ দিতে গিয়ে অনেক বেশ্যাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

লালমনিরহাটের অভাবি গ্রামগুলো, কুড়িগ্রামের ছিনাই, রাজারহাট, উলিপুরের চর, তিস্তা, নীলফামারীর ডিমলা, ডালিয়া, চিলাহাটি, সৈয়দপুর, গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর এবং বদরগঞ্জের খোলাহাটি ও পার্বতীপুর থেকেও মেয়েরা যৌনতা বেচতে রংপুরে আসে। এক বেশ্যার হাত ধরে আরো একজন এই পেশা গ্রহণ করে। দালালেরাও বেশ্যা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে।

একজন বেশ্যার হরেক নাম থাকে। এক দালালের কাছে এক বেশ্যার মোবাইল নম্বর নিয়ে তার কাছে ফোন দিই। ভিন্ন ভিন্ন নম্বর থেকে। তাকে সম্বোধন করি কখনো সিলভি, কখনো মিতা আবার একবার মুন্নি নামেও।

তিনি সব নামেই রেসপন্স করেন। বেশিরভাগ বেশ্যার নাম তিন অক্ষরের শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিউলি, রূপালি, আয়শা, রিনা, রাণী, মুন... এরকমই রংপুরের বেশ্যাদের নাম। একই নাম ধারণ করে আছে একাধিক বেশ্যা। দালালরা জানায়, কোনো বেশ্যাই তার আসল নাম বলে না।

লাভলী তার স্বামীর মাধ্যমেই বেশ্যাবৃত্তিতে আছে। তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আগের মতো আলাদা বেশ্যাপাড়া থাকলেই ভালো হতো, নাকি এখন যেমন চলছে সেটাই ঠিক আছে?' সরাসরি কোনো উত্তর দিলো না লাভলি। বললো, 'এখন এই জগত ছড়ায়ে গেছে। একবার এক কন্ট্রাকটর আমাকে নিয়ে গেছিল বগুড়ার বিরাট এক হোটেলে। তার দুইদিন পরে সেই কন্ট্রাকটরের ছেলের সাথে গেলাম ভিন্নজগতে। সেই ছেলেকে চিনেও কিছু বলতে পারি নাই। আর বলেই বা কী হবে? আমি তো ব্যবসা করি। বাপ-ছেলে একই রেজার দিয়ে দাড়ি কামাইলে রেজারআলার কী করার আছে? আমার কাছে দুইজনেই কাস্টমার। তবে, আলাদা পাড়া থাকলে তো সবাই চিনবে। সেইটা সমস্যা, আবার ভালো। গরিব বেশ্যাদের জন্য বেশি ভালো। পাড়া থাকতেও পারে। সেইটা সরকার বুঝবে'। লাভলির ছেলে শহরের নামী স্কুলের ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ছেলে জানে?'। লাভলির উত্তর, 'না'। তারপর খাকিনক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যিই ভয় পাই। ছেলে একবার বুঝতে পারলে আমার মরে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না'।

লাভলি আমাকে আরেক বেশ্যার কাহিনি শোনায়, 'আমার এক পরিচিত অল্প বয়সে বিধবা হইছিলেন। আপা এই কাজ করেই তার ছেলেকে ডাক্তারি পড়াইছিলেন। ছেলে জাপানে যায়া একটা মেয়েকে বিয়ে করে। সেই মেয়েকে নিয়ে কোনোদিন রংপুরে আসে নাই। বউকে নাকি বলছে, তার মা মারা গেছে। আপা আমার কাছে অনেক কান্দে। কিন্তু আমি বলি, এইটাই ভালো হইছে। ছেলেটা তো বড় মানুষ হইছে'।

বেশ্যার মাতৃত্ব কোনো অংশেই আলাদা কিছু নয় তাহলে!

রংপুরের বেশ্যাদের দর যথেষ্ট চড়া। বেশ্যার বয়স ও রূপ ভেদে ১০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা, একবার। রাস্তার বেশ্যারা নেয় ৫০ থেকে ৫০০ টাকা, একবার। সারারাতের দর ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার, সেইসাথে থাকা-খাওয়া। ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার দর (ব্যবসায়ীরা এরকমভাবে বেশ্যা ভাড়া করেন) ২৫ হাজার-৫০ হাজার + যাতায়াত+ থাকা-খাওয়া। বিদেশে নিয়ে গেলে দর (বড় ব্যবসায়ী/ কন্ট্রাক্টর খদ্দের) ভিসা খরচ বাদে ৫০ হাজার

থেকে ১ লাখ টাকা। তবে খদ্দের না পেলে গরিব বেশ্যা ২০ টাকাতেও বিক্রি হয়। একই বেশ্যার খদ্দেরের সংখ্যার উপরেও দাম-দর নির্ভর করে। কোনো কোনো বেশ্যার বিনে পয়সার খদ্দেরও আছে। বেশ্যাসমাজে সেই খদ্দেরদের 'নাঙ' বলা হয়। একজন বেশ্যার সঙ্গে আলাপ হলো যার ৫ জন মাত্র বাঁধা খদ্দের। তাতেই তার বেশ চলে যায়।

বেশ্যার রোজগার করা টাকার ভাগাভাগি আছে। ধরা যাক এক হাজার টাকার খদ্দের ঠিক হলো। বাড়িওয়ালাকে দিতে হবে ২০০ টাকা। দালাল ১০০ টাকা। পুলিশ ১০০ টাকা। পাড়ার মাস্তান ১০০ টাকা। অর্থাৎ বেশ্যার কামাই ৫০০ টাকা। তবে এই ভাগাভাগির চিত্র সবক্ষেত্রে একই রকম নয়। অনেক সময় বেশ্যা পুরোটাই পায়। অনেক সময় এক টাকাও কামাই হয় না বখরা দিতে গিয়ে। স্থানীয় বাজারে বৃহস্পতিবারের রাতে বেশ্যাদের চাহিদা বেশি। দালালরা বৃহস্পতিবারের নাম দিয়েছে 'বেশ্যাবার'। বেশ্যাবারে কামাই একটু বেশিই হয়। আবার, ঝুঁকিও বেশি থাকে। পুলিশ হাতে-নাতে ধরে ফেললে সব টাকা কেড়ে নেয়। মাস্তানরাও তাই করে। অনেক সময় রাস্তার বেশ্যা ধরা পড়ে গণধোলাইয়ের শিকারও হয়।

একজন দালাল অনেকক্ষণ মাটিতে হিসাব-নিকাশ করে জানালেন রংপুর বিভাগের ৮ জেলা মিলে প্রায় ৩০ হাজার মেয়ে এই লাইনে আছে। আর দালাল আছে কমপক্ষে এক হাজার।

রংপুরে বেশ্যাজীবন বয়ে চলেছে সমাজের ছায়ার অন্তরালে, আদিম গতিবেগে। হয়ত আবহমান কাল ধরেই। ভবিষ্যতেও বেশ্যাবৃত্তি বজায় থ াকবে বলেই ধারণা করা যায়। আমাদের এত কাছের এইসব ঘটনা আমরা কেউ কিছু জানি না, যদিও চাইলেই এই জীবনধারার স্বরূপ চিনে নেওয়া সম্ভব।

(লেখাটি ২০১২ সালে তৈরি হয়েছে ৪ জন দালাল ও ২১ জন বেশ্যার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।)

লেখক: কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, ফোকলোর তত্ত্বিক।

উপনিবেশিক রংপুর অঞ্চলের নারী শিক্ষা

সুরাইয়া আক্তার

আবহমান কাল থেকে দেখা যায় যে বাংলায় এমনকি ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে নারী শিক্ষা ছিল এক দুঃখজনক অধ্যায়। সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেয়েদের শিক্ষা ছিল অবহেলিত। বলা যেতে পারে ইংরেজ শাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জরিত বাংলার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নারী শিক্ষার কিছুটা সুযোগ লাভে সমর্থ হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চল রংপুরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগে পর্যন্ত সরকারিভাবে তার কোনোও প্রভাব পড়েনি। সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা উল্লেখ থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় নারী শিক্ষার খুব বেশি প্রচলন ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে। ব্রাহ্মণেরা পুরুষদের শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হলেও নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। মুসলমানদের বেলায় অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহে পর্দার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্ম বিষয়ে কিছু জ্ঞানলাভ করতেন। আরবি ও ফারসি সুর তুলে অর্থ না বুঝে কোরআন মুখস্থ করার মধ্যে মুসলমানদের নারী শিক্ষা বিস্তৃত ছিল।

বাংলার নারী শিক্ষা গুরু ও সম্প্রসারণে মিশনারিরাই ছিলেন অগ্রগামী। কারণ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারী শিক্ষার প্রতি কোনোও দৃষ্টিপাত করেনি। সরকারিভাবে সর্বপ্রথম ১৮৫৪ সালে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ধারার একটি অংশ হিসেবে নারী শিক্ষা স্বীকৃতি অর্জন করে। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারী শিক্ষার যে উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় সেটুকু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিভিত্তিক বা মিশনারি প্রচেষ্টার ফল। কারণ ১৮১৩ সালে Education clause– এ ভারতবাসীর জন্য সর্বপ্রথম ১ লক্ষ টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হলেও সেটির ১ পয়সাও নারী শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়নি।

রংপুরের ভৌগোলিক অবস্থান: রংপুর জেলা ২৫°.০৩″ থেকে ২৮°.২৮″ অক্ষাংশে এবং ৮৮. ৪৫″ থেকে ৮৯. ৫৫″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তরে নীলফামারী জেলা ও লালমনিরহাট জেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা জেলা, পূর্বে কুড়িগ্রাম জেলা, পশ্চিমে দিনাজপুর জেলা।

অবিভক্ত রংপুর বা ব্রিটিশ রংপুর বা বৃহত্তর রংপুর: বাংলাদেশের উত্তর জনপদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রংপুর। রংপুর দূর অতীতে প্রাগজ্যোতিষ নামে পরিচিত ছিল। একদা রংপুর ছিল কামরূপ-কামতা রাজ্যের অংশ।

বৃহত্তর রংপুর ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি জেলা যা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ব্রিটিশদের আদলেই রংপুর জেলা গঠন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৪ সালে জেলা পুনর্বিন্যাসের ফলে বৃহত্তর রংপুর জেলা বিভক্ত হয়ে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলা স্থাপিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ জড়িত বাংলার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নারী শিক্ষার কিছুটা সুযোগ লাভ করলেও সমগ্র বাংলার অবস্থা একই ছিল। ১৮০৭ সালে হ্যামিল্টন বুকানন সাহেব যখন রংপুর ভ্রমণ করেন তখন রংপুরে বহুল পরিচিত একটি কুসংস্কার নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। পূর্বে লেখাপড়া জানা মেয়েকে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে চাইত না। সাধারণ জনগণের মধ্যে এ ধারণা বিরাজমান যে একজন লোকের শিক্ষিতা স্ত্রী তার স্বামীর আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ী করে। এ কুসংস্কারের অর্থ হলো কেউ যেন লেখাপড়া জানা স্ত্রী লোকের পাণী গ্রহণ না করে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও ধর্মান্ধ শ্রেণির লোকেরা এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে। তবে রংপুরে এ অপপ্রচারের মাত্রা ছিল অনেক বেশি বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। অপরদিকে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষায় ধর্মীয় কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও আশরাফ (উচ্চবর্ণের) পরিবারের মেয়েদের পর্দা প্রথা নারী শিক্ষা অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া তৎকালীন বনেদী মুসলমান পরিবারের মানুষেরা ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে নারী শিক্ষার বিষয়কে ততবেশি গুরুত্ব দিত না।

এছাড়া আরও কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ

- মেয়েদের শিক্ষার প্রতি পিতা-মাতার উদাসিনতা
- মহিলা শিক্ষকের অভাব
- লিঙ্গ বৈষম্য
- অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার যুক্ত মানসিকতা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ও অর্থের অভাব

নিজ প্রচেষ্টা ও গোপনে শিক্ষা অর্জনঃ সমগ্র বাংলায় আলোচিত মুসলিম নারী ব্যক্তিত্ব ও নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঊনিশ অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দুঃসহ পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। রোকেয়ার বাবা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলেও অতীব ধর্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু তার মাতা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরী ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে। পর্দা প্রথার অন্তরালে থাকলেও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন কুসংস্কার মুক্ত। প্রধানত

তার উৎসাহেই তার মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ সঞ্চার হয়েছিল। রোকেয়া গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞানলাভ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি ও বাংলা শেখার তীব্র আগ্রহ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার দুই সহোদর। মায়ের পরামর্শে তারা রোকেয়ার জন্য বাড়িতেই একজন ইংরেজ মহিলা শিক্ষিকাকে নিয়োগ করেন। কিন্তু বেশিদিন এই সুযোগ পাননি রোকেয়া। তখনকার দিনে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা থেকে তিনি বাঁধার সম্মুখীন হন। বাড়ির অন্তঃপুরে বিদেশিনীর যাতায়াত এবং এতে পর্দা প্রথা নষ্ট হচ্ছে এরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে তার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা। ফলে ঐ ইংরেজ মহিলা শিক্ষিকার কাছে বেশিদিন ইংরেজি শেখার সুযোগ পাননি রোকেয়া। কিন্তু তাতে দমে যাননি তিনি এবং তার দুই সহোদর। বিশেষ করে তার বড় ভাই ইব্রাহীম সাবের। নিজেই তিনি বোনকে বাড়িতে গোপনে ইংরেজি শিক্ষা দান করেন। সেই সঙ্গে তাকে বাংলা শেখাবার দায়িত্ব নেন বড় বোন করিমুন্নেসা। এভাবেই আট-ন, বছর বয়সে বাড়িতেই রোকেয়া ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা লাভ করেন।

নারী শিক্ষা বিস্তারে জমিদার শ্রেণির ভূমিকা:

- **কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী:** (১৮২২ – ১৮৫৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে রংপুরের ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী কুন্ডির ৭ আনা জমিদারির অন্যতম অংশীদার হিসেবে ১৮৪৭-৫৪ পর্যন্ত গোপালপুরে তার জমিদারি পরিচালনা করেন। তিনি তার নিজ গ্রাম গোপালপুরে (শ্যামপুর রেলস্টেশনের ১ মাইল দক্ষিণে) একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নিজ পরিবারের একজন শিক্ষিতা মেয়েকে সে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। ধারণা করা হয় রংপুর জেলায় উক্ত বালিকা বিদ্যালয় টি প্রথম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৪০ সালের পূর্বে এ বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নারী অধিকার, বিবাহ ও সতীত্বের মর্যাদার উপর লেখা 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামক একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং নিজ খরচে তা প্রকাশেরও ব্যবস্থা নেন। এভাবেই তিনি নারী শিক্ষার বাঁধাসমূহ অতিক্রমের জন্য জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আরেকটি বড় অবদান ১৮৪৭ সালে "রঙ্গপুর বার্তাবহ" পত্রিকা প্রকাশ। ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি এ পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন যা তৎকালীন বাংলায় দ্বিতীয় পত্রিকা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। তিনি গোপালপুর থেকে প্রকাশিত- "রঙ্গপুর বার্তাবহ" পত্রিকায় নারী মুক্তি এবং নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়ে যান এবং মেয়েদের শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রংপুরে থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তারই পৃষ্ঠপোষকতায়। কুন্ডির জমিদার পরিবারের নারী শিক্ষা এবং নারী অধিকার সম্পর্কিত এ

সব কার্যাবলি পালিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর চার ও পাঁচের দশকে।

- **শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীঃ** (১৮২৩-১৯৬৮) নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানে কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬২-১৮৬৫ পর্যন্ত তিনি কাকিনায় (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা) তিনটি প্রাইমারি স্কুল, একটি মিডিল ইংলিশ স্কুল, একটি মিডিল ভার্নাকিউলার স্কুল এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত তিনটি স্কুলের মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়টি (যা পরবর্তী সময়ে তার প্রয়াত পুত্র কৈলাশ রঞ্জনের নামে উৎসর্গীকৃত হয়) কোনোদিনই সরকারি অনুদান লাভ করেনি। এমনকি মাহিগঞ্জ শিক্ষা সার্কেলের একজন সহকারি স্কুল পরিদর্শক একবার উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ভালো ফল আসেনি।

- **মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীঃ** (১৮৬৮-১৯০৯) শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় টিতে ছাত্রী সংখ্যা কম ও উপস্থিতির হার সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি অনুদান লাভে ব্যর্থ হলে পরবর্তী জমিদার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর জমিদারির অনুদানে তার সময়কাল পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বজায় ছিল। এখানে আরও উল্লেখ্য যে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি গুরু রংপুরের বাইরে থেকে আনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।

- **রমণীমোহন রায় চৌধুরীঃ** (১৮৬০-৮৭) এমনি আরেকটি ভূস্বামী পরিবার তুষভাণ্ডার জমিদারি (কাকিনার ৫ কিমি উত্তরে অবস্থিত) নারী শিক্ষার জন্য যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তুষভাণ্ডারের জমিদার রমনী মোহন রায় চৌধুরী তার রাজবাড়ির এলাকার কাছাকাছি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একমাত্র জমিদারির সাহায্য নিয়েই উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বহুদিন যাবৎ টিকে ছিল।

- **জানকী বল্লভ সেনঃ** (১৮৯০-১৯১০) রংপুরের আরেক জমিদার ডিমলার রাজা জানকী বল্লভ সেন নীলফামারী মহকুমার ডিমলা গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে নিজ স্ত্রীর নামে রানী বৃন্দাময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বালিকা বিদ্যালয় পরবর্তীতে ১৯১৩ সালে ডিমলা ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এ বালিকা বিদ্যালয়টি সরকারি অনুদান লাভ না করা পর্যন্ত রানী বৃন্দাময়ীর ব্যক্তিগত এস্টেটের আয় থেকে এর খরচ নির্বাহ হতো।

এছাড়াও বেশ কিছু সমাজসংস্কারক শিক্ষার সমান অধিকার, নারী কল্যাণ সাধন, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক –পত্রিকা প্রকাশ করেন যা নারী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখে।

১৮৫৪ সালের পর ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয় যেমন, ক) নারী শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয়; খ) অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক তৈরি, পৃথক নর্মাল স্কুল স্থাপন ও বৃত্তির ব্যবস্থা; গ) মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল পরিদর্শন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা; ঘ) স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং ঙ) অনুন্নত অঞ্চলে অধিক সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। এ কমিশনের সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকরী হয়েছিল তা জানা যায়নি তবে রংপুর জেলার জন্য গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়া আর কোনও প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। এমনকি অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক তৈরিরও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে রংপুর অঞ্চলে নারী শিক্ষা পুরুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভর হয়ে পড়েছিল। রংপুর জেলায় নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা থাকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বেশ ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যায়। ১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম আদমশুমারিতে শিক্ষার হার উল্লেখ থাকলেও পৃথকভাবে এ দেশে নারী শিক্ষার হার উল্লেখ করা হয়নি। নিম্নে ১৮৮১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলার নারী ও পুরুষের শিক্ষার শতকরা হারের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

সাল	পুরুষ	মহিলা
১৮৮১	৫.৭৪%	০.০৮%
১৮৯১	৬.৭৪%	০.০৮%
১৯০১	৬.৪%	০.২%
১৯১১	..	..
১৯২১	১২.১%	১.৮%
১৯৩১	১২.০%	২.৭%
১৯৪১	..	৭.৪%
১৯৫১	১৪.৬%	১১.৩%
১৯৬১	২৫.৫০%	৬.৯%
১৯৭৪	২৭.০%	৯.৬%
১৯৮১	২৫.৬%	১০.২%

উৎস: District Census Report, Rangpur, 1974, P-4 & Bangladesh Education in statistics, 1985, P-169.

পরিশেষে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত বাংলার নারী শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হলেও রংপুরের নারীদের ক্ষেত্রে এ পথ

সহজ-সরল ছিল না। ধর্মীয় অনুশাসন, অবরোধ প্রথার করাল নিষ্পেশন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কঠিন শৃঙ্খলকে অতিক্রম করে নারীদের শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। সেই পাহাড় সমান বাঁধা অতিক্রম করে নারীরা ঘরে-বাইরে তাদের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে আজও লড়াই করে যাচ্ছে।

রংপুরের পোড়ামাটির শিল্প: জীবিকায়নে বিকল্প পাঠ
কালী রঞ্জন বর্মণ

কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবহনকারী অনেক লোকজ শিল্প। অনিবার্য আধুনিকতার ছোঁয়া, মানুষের সুখ ও সুবিধা-বিলাসী মানসিকতা এবং সংরক্ষণ বিমুখতার কারণে তলিয়ে যাচ্ছে একদা উজ্জ্বল একদল খেটে খাওয়া মানুষের নিষ্ঠা, শ্রম ও ঘামের আঙ্গিনায় যাদুস্পর্শী নিপুন হাতের শিল্পীত কারুকাজ। হারিয়ে যাওয়া এমনি এক লোকজ শিল্পের নাম রংপুরের পোড়ামাটির কুয়ার পাট বা চুয়ার পাট।

প্রাচীনকালে ঠিক কখন থেকে এই পাতকুয়া তথা পাটকুয়ার প্রচলন শুরু হয় তার সঠিক কোনো খবর পাওয়া দুষ্কর। সম্রাট অশোকের সময় প্রজাদের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য পাতকুয়ার খনন ও তার ব্যবহার হয়েছিল বলে ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়। তবে সেই সময়ের কুয়া কীসের তৈরি বা কেমন ছিল তা আর এখন জানার উপায় নেই। হয়ত সেই সময় পোড়ামাটির পাট বা পাথর বালির তৈরি পাটে নির্মিত কুয়ার ব্যবহার শুরুই হয়নি। আর হলেও তার ব্যবহার শুধুমাত্র রাজকীয় সামর্থ্যের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ।

পরবর্তীতে মোঘল আমলে বা সুলতান শেরশাহ্র আমলে মুসাফির, তীর্থযাত্রী বা পথিকদের জন্য মহাসড়কের পাশে বসতি এলাকায় এবং ঘনবসতিপূর্ণ পাড়ায় অধিক সংখ্যক মানুষের ব্যবহারের জন্য পোড়ামাটির বেষ্টনী দেয়া কূপ বা কুয়া নির্মাণের কথাও এখন আর অজানা নয়। সেই সময় থেকে গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এই পাতকুয়া বা পাটের চুয়ার অবিরাম চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর উৎপাদন ও ব্যবহার এই পোড়ামাটির শিল্পকে রংপুরের এক সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যে পরিণত করেছে। এইসব হারিয়ে যাওয়া লোকজশিল্প প্রবীণদের কাছে এখন শুধুই স্মৃতি, আর নবীনদের কাছে গবেষণার উপাদান।

ঐতিহাসিকযুগে প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামতাপুর বা কুচবিহার রাজ্যের শাসনাধীন থাকলেও ভৌগোলিকভাবে রংপুর ছিল পুন্ড্রবর্ধণ তথা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। ১৯১৪ সালে 'রংপুর জাদুঘর' এর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন– 'রংপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। বরেন্দ্রভূমি এককালে ভাস্কর কার্যের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়াছিল' *('সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী', সুশান্ত চন্দ্র খাঁ,*

বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ: ২৪)।

হর প্রসাদ শাস্ত্রীর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে রংপুরের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত নির্দেশ করে।

মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদিত বস্তুর মধ্য দিয়ে যে শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে তাকেই আমরা বলতে পারি লোকজশিল্প। বাংলাদেশে এই লোকজশিল্প সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো মাটি। আর এই মাটি দিয়ে তৈরি মূর্তি, পুতুল ও বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্রই বাংলায় এ যাবত আবিষ্কৃত শিল্প ঐতিহ্যের প্রাচীনতম নমুনা হিসেবে আদৃত। বাংলার মাটির বিশেষ গুণাবলীর কারণে এদেশে গড়ে উঠেছে পোড়ামাটি বা টেরাকোটা শিল্প। মাটিকে রোদে শুকিয়ে অল্প তাপে পোড়ানোর পর যে শিল্পবস্তু প্রস্তুত হয় তাই আমাদের মৃৎশিল্প। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবহৃত পোড়ামাটির মৃৎপাত্র এবং বিভিন্ন ধরণের ভাস্কর্য সেই সময় থেকে এই অঞ্চলে পোড়ামাটির শিল্পচর্চার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সময় ব্যবহৃত এই সকল তৈজসপত্র, খেলনা পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্যই ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনুসঙ্গ।

এরপর ক্রমাগত পৃথিবীর পরিবেশ প্রতিবেশের পরিবর্তন, আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিক কলাকৌশল, নতুন ও অভিনব সুযোগ সুবিধার উদারতা, মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং দেশজশিল্প সংস্কৃতির প্রতি অনাদর ও অবহেলা এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক লোকজশিল্পই আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। রংপুরের পাত কুয়ার পাট বা চুয়ার পাট তাদের অন্যতম। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে এর ব্যবহার ছিল প্রায় একচেটিয়া। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর আশির দশক থেকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জেলা পরিষদ, থানা/ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও সেসকল কর্মসূচির আওতায় সকল ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে টিউবওয়েল বিতরণ ও স্থাপনের ফলে মাটির পাতকুয়া বা পাটকুয়ার প্রয়োজন ও ব্যবহার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে। পরবর্তীতে এই ধরণের পাটকুয়ার ব্যবহার কিছুটা পরিলক্ষিত হয় উত্তরাঞ্চলের উঁচু এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে উৎপাদিত তামাক, আলু, বিভিন্ন প্রকারের রবিশষ্য ও শাক-সব্জী উৎপাদন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে। অবশ্য ইদানিং বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করায় পাত কুয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ফলে দায় হয়ে পড়েছে এই শিল্পের বেঁচে থাকাটাই।

উত্তরাঞ্চলের গ্রাম এলাকায় শুধু নয়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সেই প্রাচীন কাল থেকে মানুষের পানীয় জল এবং গৃহস্থালীর ব্যবহার্য জলের উৎস ছিল নদী, পুকুর বা প্রাকৃতিক জলাধার *(এখনো দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী ও সুন্দরবন এলাকাবাসী মানুষের কাছে এ ধারা অনেকটাই অব্যাহত আছে)*।

পাশাপাশি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কারে মানুষের সুখ-সুবিধার প্রসার ও প্রচারে স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্রমোন্নতিতে সাধারণ মানুষও এক সময় বহুল ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জলাধারের চাইতে ব্যক্তিগত আধারের উৎস সন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠে। পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে একসময় ব্যক্তিগত খনন কূপের প্রচলন শুরু হয়। প্রথমে মাটি খুঁড়ে বাঁশ ও খড়ের বেড় তৈরি করে তা নিচে স্থাপন করে কুয়া বা চুয়া তৈরি করা হতো। কিন্তু তা হতো খুবই ক্ষণস্থায়ী। এক বর্ষ গেলেই এসব কুয়া টিকতো না। এরপরেই চালু হয় পোড়ামাটির পাটে তৈরি কুয়া বানানো। মাটির কাজের কারিগর কুমাররা তাদের কারখানায় এইসব গোলাকার পাট তৈরি করে প্রথমে রোদে শুকিয়ে পরে সহনীয় তাপে পুড়িয়ে নেন। এই পোড়ামাটির পাট ভাড়ে করে গ্রামের লোকজন তাদের প্রয়োজনে নিয়ে এসে গ্রামের কিছু অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা কুয়া তৈরি করেন। কারিগররা একটি পাটের উপর আর একটি পাট স্থাাপন করে তা সমান্য পানি ঢেলে ঘষে ঘষে জোড়া লাগান। এইভাবে সুবধামতো কয়েকটি পাট একত্রে জোড়া লাগিয়ে কয়েকজন মিলে রশি দিয়ে পূর্বে খননকৃত মাটির কুয়া বা কূপের তলদেশে নামিয়ে স্থাপন করেন। তারপর লম্বা বাঁশ দিয়ে দুই/ তিনজন লোক কূপে নেমে স্থাপিত পাটের উপর দাঁড়িয়ে চাপ দিতে থাকরে জলবদ্ধ কূপের মধ্যে পাটগুলি ধীরে ধীরে নিচের দিকে কিছুটা ডুবে যেতে থাকে। এইভাবে আরও কিছু পাটের রিং এর উপর স্থাপন করে সমুলে উঠে আসেন তারা। এভাবেই পাটের কূয়া বা চুয়া তৈরি করতে দেখেছি শৈশবে ও কৈশোরে।

অপরদিকে একসময় চুন, বালি ও পাথর দিয়ে এবং পরবর্তীতে পাথর ও বালির সাথে সিমেন্ট ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে পাকা বাড়িঘর নির্মাণের পাশাপাশি বিত্তবান মানুষ কুয়ার বদলে ইঁদারা বা ইন্দিরা নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একটি পাট কুয়া পাঁচ বা সাত বছর স্থায়ী হলে একটি ইঁদারা অবস্থা ভেদে দীর্ঘদিন টিকে বা কার্যকর থাকে। এছাড়া মাটির পাট কুয়ায়, এর গভীরতা ও আয়তনের কারণে এতে সিঞ্চিত জলের যে পরিমাণ তা একটি ছোট পরিবারের জন্য যথেষ্ট হলেও অধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা উপযোগী নয়। সেইক্ষেত্রে একটি বড় ইঁদারা অনেক মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

এই পোড়ামাটির পাট তৈরির জন্য রংপুর জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মিঠাপুকুর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং বদরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের লালমাটি (স্থানীয় ভাষায় বলে 'খিয়ার' মাটি) অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করা হতো। এক্ষেত্রে মিঠাপুকুর উপজেলার খোরাগাছ ও ময়েনপুর ইউনিয়নে উৎপাদিত চুয়ার পাট ছিল খুবই বিখ্যাত। বিশেষত ময়েনপুরের চুয়ার পাট এর চাহিদা ও সুনাম একসময় ছিল কিংবদন্তিতুল্য। এই দুই ইউনিয়নের কুমারপাড়ার শিল্পীদের সেই পোড়ামাটির শিল্পের ঐতিহ্য আজ অবলুপ্ত প্রায়। পেটের চাহিদা মেটাতে তারা এখন বিকল্প কাজ, বিকল্প পেশায় জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত।

পোড়ামাটির শিল্প কারখানায় যে ছিল এই নিপুণ কাজের কারিগর, সে এখন শাক সবজির দোকানদার। যে শ্রমিক ছিল এই অঙ্গনের নিষ্ঠাবান শিল্পী, সে এখন ক্ষেতের মজুর বা গ্রামের রাস্তায় ভ্যান চালক। এই বিপর্যয় শুধু চুয়ার পাট বা কুয়ার পাট তৈরির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই শিল্পভূবনে কুমার পাড়ায় নির্মিত মাটির তৈজসপত্র ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন ধরণের খেলনা পুতুল, পুজোর প্রতিমা এবং সৌখিন সৌন্দর্য বর্ধক দ্রব্যাদির উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং এই শিল্পের সাথে জড়িত শিল্প শ্রমিকদের জীবিকায়ন ও পুনর্বাসনের স্বার্থে এদের ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য এইসঙ্গে আরও জরুরি সকল পর্যায়ে বিষয়টি অনুধাবন করা। বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এই শিল্পকে বাঁচাতে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আপাতত ফলপ্রসূ মূল উদ্যোগটি হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনার মাধ্যমে এই শিল্পের পুনর্বাসন এবং নতুন যুগোপযোগী পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় এর উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ।

বাংলার মন্দির স্থাপত্য নির্মাণে দেশিয় রীতি ও উপনিবেশিক ভাবধারার সংমিশ্রিত প্রভাব: রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাভিত্তিক একটি পর্যালোচনা

বহ্নি রানী রায়

রংপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এক প্রচীন ভূখন্ড। রংপুর প্রাচীন রাজ্য প্রগজ্যোতিষপুর বা কামতারাজ্য বা কামরূপের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষ করে মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনায় এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোঘল পূর্ব রংপুরের সুন্ত্র ইতিহাস আমাদের অজানা। কেবলমাত্র খিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে মোঘল আমলের সরকার রংপুর ও ঘোড়াঘাটের উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গ অঞ্চল মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাজ্যভুক্ত থাকায় অনুমান করা যায় যে, রংপুর অথবা এর অংশ বিশেষ অঞ্চল তাদের শাসনাধীনে ছিল। সুলতানি আমলে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দির শুরু থেকে রংপুর অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে কামরূপ অঞ্চলের বিভিন্ন নরপতি ও গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে সবসময় বিরোধ লেগেই থাকত। পরবর্তী সময়ে মোঘল শাসনামলে আসার পর রংপুরের ঘোড়াঘাট অঞ্চল মোঘল সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের ফরমান অনুযায়ী ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলসহ বর্তমান রংপুর অঞ্চলেরও দিওয়ানি লাভ করে। রংপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো বদরগঞ্জ উপজেলা। বদরগঞ্জ উপজেলাটি ঐতিহাসিকভাবে বেশ বিখ্যাত। এই উপজেলার নামকরণ হয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্র বদরবাবার নাম অনুসারে। বদরগঞ্জ উপজেলাটি উত্তর গোলার্ধ ২৫×৩২´ হতে ২৫×৪৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯×৫৬´ হতে ৮৯×১০´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

বাংলা অঞ্চলের মন্দির: বাংলা অঞ্চলে মন্দির স্থাপত্য নির্মাণের ইতিহাস প্রায় দের হাজার বছরেরও অধীক পুরাতন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মন্দির স্থাপত্যের গাঠনিক আকার আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তুশাস্ত্রে দেবালয় বোঝাতে মন্দির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষ পর্বে রচিত শিল্পশাস্ত্রে মন্দিরের স্থাপত্তিক বৈশিষ্ট্যকে নরদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, দেহের যেমন প্রাণ থাকা প্রয়োজন তেমনি মন্দিরে দেবতা থাকা প্রয়োজন। মন্দির হচ্ছে দেহ এবং দেবতা হচ্ছে তার প্রাণ। অর্থাৎ দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই মন্দির নির্মিত হতো। আরও সহজ করে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মন্দির হচ্ছে এমন একটি স্থপনা যার মধ্যে দেবতার প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হয়। উপমহাদেশের তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (জৈন,

বৌদ্ধ, হিন্দু) মধ্যে মন্দির তৈরি করার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে টিকে থাকা নিদর্শনগুলোর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু মন্দির।[২৭] মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এর রূপরেখা অনেকটাই নির্ভর করে আচ্ছাদন রচনার বৈশিষ্ট্যের উপরে। একটি মন্দির রচনায় ভাবকল্পনার কেন্দ্রভূমি হিসেবে আচ্ছাদনকে অবলম্বন করা হয়ে থাকে। আর এভাবেই মন্দিরের আচ্ছাদনের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের মন্দিরের। আসন পরিকল্পনা থেকে শুরু করে, দেয়াল, কক্ষ বিন্যাস, তল বিভাগ সব কিছুর মধ্যেই ভাব কল্পনার বিস্তৃতি এমনভাবে হয়ে পড়েছে যে মন্দির দেহের কোনো একটি বিশেষ অংশ ভাবকল্পনার কেন্দ্রভূমি রূপে সার্বভৌমত্ব লাভ করতে পারেনি।[২৮]

মন্দির নির্মাণের ধরণ সমূহের উপর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত শিক্ষক ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন বিষদ গবেষণা করেছিলেন। তার গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষ পর্বের মন্দিরগুলোকে- শিখর মন্দির, চালা-বাংলা মন্দির, রত্ন মন্দির, ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত মন্দিরে ভাগ করেছেন।

মন্দির স্থাপনা নির্মাণে দেশিয় ও ইউরোপীয় রীতির বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

বাংলা অঞ্চলের মন্দির স্থপত্যসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রকাশ ঘটেছিল দেশিয় রীতির। এ ক্ষেত্রে দেশিয় রীতির মূল প্রভাবক হিসেবে মন্দির স্থাপত্য নির্মাণের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলার নিজস্ব উপকরণ কাদামাটি, যাকে পুড়িয়ে স্থায়িত্ব দেয়া হতো। এক্ষেত্রে একদম নিজস্ব সুন্ত্র দেশিয় চিন্তার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। মন্দিরের আঁকার নির্মাণের ক্ষেত্রে এর কার্নিশ হতো দেশিয় কুঁড়েঘরের আদলে বাঁকানো কার্নিশ সদৃশ। এভাবে মন্দিরের ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে চালা রীতির পরিবর্তীত রূপ বিকাশ লাভ করতে থাকে। চারকোনের চারটি বুরুজে বাঁশের পই সদৃশ গিট যুক্ত নকশা করা থাকত, যাকে ব্যান্ড নকশাও বলা হয়। এছাড়াও মন্দিরের দেয়লের নকশা ছকগুলোর বর্ডার হিসেবে বাঁশের চাটাই নকশার প্রভাব সুস্পষ্ট। কুলঙ্গির ব্যবহার, কলস নকশা, কাঁথার ঢেউ খেলানো নকশা, বাংলার আলপনা নকশা, একই ছাদ যুক্ত ছাদ ও বারান্দার ব্যবহার, সমাজচিত্র, মন্দির স্থাপনার নিকট বিশালাকার জলাধারের উপস্থিতি, দেশিয় রীতির অংশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে মন্দির স্থাপত্য নির্মানের ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের দিকে এসে ইউরোপীয় রীতির মিশ্রণ বাংলার স্থাপত্য শিল্পে প্রযুক্ত হতে থাকে। মন্দিরের নির্মাণ ক্ষেত্রে বাঁকানো কার্নিশ ও ঢালু

২৭ *প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ*, মো: মোশারফ হোসেন, পৃ. ১১২

২৮ *বাংলার মন্দির*, হিতেশরঞ্জন সান্যাল পৃ. ৩৬

ছাদের ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে বাঁকানো কার্নিশ ও ঢালুছাদের পরিবর্তে সোজা কার্নিশ ও সমতল ছাদের শিল্পরীতি ব্যবহৃত হতে থাকে। এইধরনের মন্দির স্থাপনাগুলো দালান মন্দির নামে পরিচিতি লাভ করে। মন্দিরের স্তম্ভ অলঙ্করনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কলাম নকশা, ডরিক, আয়োনিক ও করিন্থয়ান ধরন প্রসিদ্ধতা লাভ করে। এই স্তম্ভগুলোর ব্যবহার সর্বপ্রথম গ্রিক ও পরবর্তীতে রোমান স্থাপত্যে প্রসিদ্ধতা লাভ করে।

ডরিক স্তম্ভ নির্মাণ শৈলিতে মূলত কলামগুলো নিচের দিকে চওড়া হয় কিন্তু এতে বেইজ অংশ থাকে না। একই সঙ্গে কলামের ক্যাপিটাল অংশ একদম ছিমছাম হয়। এতে জাকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা থাকত না। একটি কলামের/পিলারের বেইজ বলা হয় নিচের দিকের অংশটিকে আর ক্যাপিটাল বলা হয় উপরের দিকের মূল অংশটিকে।

ডরিক স্তম্ভের পরবর্তী উন্নত রূপ আয়োনিক অর্ডার। আনোনিক স্টাইলের কলামের শীর্ষভাগ বা ক্যাপিটাল অংশিটি হতো একদম বুনো মহিষের শিংয়ের মতো দু-দিক মোড়ানো, এটিকে ডাবল স্ক্রল ও বলা হয়ে থাকে। এর বেইজের অংশ থাকে গোলাকার সিঁড়ি আকৃতির কারুকার্য খচিত। বাংলার মন্দির স্থাপনায় আয়োনিক অর্ডার এর ব্যবহার চোখে পড়ার মতো।

কলাম/স্তম্ভেও সবচেয়ে উন্নত রূপ হচ্ছে করিন্থিয়ান স্টাইল। করিন্থিয়ান কলামগুলো কিছুটা চিকন ও মোটামুটি লম্বা আকৃতির হয়ে থাকে। এর বেইজ হয় কারুকার্যমন্ডিত। কলামে ফ্লুটের উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত থাকে। ক্যাপিটাল বা শীর্ষভাগ হয় অনেক বেশি কারুকার্য মন্ডিত। ক্যাপিটালে পাতা যার শীর্ষভাগ মোড়ান, ফুল, ছোট ছোট স্ক্রলের ব্যবহার এর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলে। এছাড়া আর্চ, খিলানের ব্যবহার ইউরোপীয় জনপ্রিয় ধারার অর্ন্তভুক্ত।

বিটিশ উপনিবেশিক সময়ের পর থেকে বাংলার মন্দির স্থাপত্যগুলোতে ইউরোপীয় ছাপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই সকল কলামের ব্যবহার হতে থাকে। বিশেষ করে দালান মন্দিরের স্তম্ভে এই ধারার প্রশারতা লক্ষণীয়। ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে মন্দির স্থাপত্য সমূহ ও বিশালত্ব ধারন করতে থাকে। দেশিয় ও ইউরোপীয় দুটো সংমিশ্রিত প্রভাবে আধুনিকতা পায় বাংলার মন্দির।

বদরগঞ্জ উপজেলার মন্দির স্থাপত্যসমূহে দেশিয় রীতি ও উপনিবেশিক ভাবধারার সংমিশ্রিত প্রভাব:

বদরগঞ্জ উপজেলায় ৬টি প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য পাওয়া গিয়েছে। এই মন্দিরগুলি হলো: জলুবর মন্দির, কালীবাড়ি মন্দির, জোড়া শিব মন্দির, শিব মন্দির, কালী মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। এগুলোর গঠনশৈলী দেখে আনুমানিক সময়কাল উপনিবেশিক সময়ের বলে ধারনা করা যায়। জরিপের

মাধ্যমে পাওয়া ৬টি মন্দিরে ৩ ধরনের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এগুলো হলো- দালান, চালা মন্দির ও গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলের পুরু ইটের ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দির গাত্রে প্লাস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

দালান মন্দির: জলুবর মন্দির, কালীবাড়ি মন্দির ও প্রফুল্ল রায় জমিদার বাড়ির কালী মন্দিরটি ইউরোপীয় রীতির দালান কাঠামোয় নির্মিত। এই মন্দির তিনটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে পুরু ইট, মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্লাস্টার। যদিও মন্দিরগুলো বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে তাই বেশিরভাগ মন্দিরের গাত্রালঙ্কার কিরূপ ছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা মুসকিল।

জলুবর মন্দির: দালান মন্দরের মধ্যে জলুবর মন্দিরের গাত্রালঙ্কার অনেকটাই টিকে আছে। এই মন্দিরটি নির্মাণের ক্ষেত্রে দুধরনের ইটের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। চিকন ও চ্যাপ্টা আকারের ইট মন্দিরের ছাদের অংশে স্বল্প পরিসরে ব্যবহার করা হয়েছে। সার্বিকভাবে পুরু ইটের ব্যবহারই বেশি দৃশ্যমান হয়। এটি একটি বারান্দা যুক্ত মন্দির ছিল। মন্দিরের প্রবেশপথের দেয়ালে তিনটি আর্চ নকশার খিলান দরজা রয়েছে। এই দরজাগুলোতে উপনিবেশিক ছাপ সুস্পষ্ট। সম্মুখভাগের চারটি পিলার অনেকটাই আয়োনিক ধারায় নির্মিত। পলারের ক্রাউন অংশে মহিষের শিং এর মতো বাঁকান স্ক্রল দৃশ্যমান। পিলারের উচ্চতা এবং চিকন ভাব এর উপনিবেশিক ধারায় সংমিশ্রণের প্রমান দেয়। এছাড়া এর বিশালত্ব ইউরোপীয় ধারার ছাপ বহন করে। এই মন্দিরের অলঙ্করনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধারার পাশাপাশি দেশিয় ভাবটিও সুস্পষ্ট। দেশিয় ধারার অন্যতম অংশ কুলঙ্গির ব্যবহার রয়েছে। এই মন্দিরের ভেতর বাহির মিলিয়ে সর্বমোট ১৯ টি কুলঙ্গি পাওয়া গিয়েছে। যা একদিকে যেমন ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়েছে অন্যদিকে এর আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মন্দিরের দেয়ালে ছোট বড় প্যানেল নকশার ব্যবহার এতে এনে দিয়েছে অন্য মাত্রা। মন্দিরের দেয়াল অলঙ্করনে প্লাস্টারের মধ্যেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলপনা নকশা, গ্রামীণ কাঁথা নকশার সদৃশ আঁকা-বাঁকা ঢেউ। এছারাও মন্দিরের দেশিয় রীতির ছোট খিরকি দরজার ব্যবহার এর নির্মাণ কৌশলে দেশিয় ভাবধারা ও লোকবিশ্বাসের প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হয়।

কালীবাড়ি মন্দির: কালীবাড়ি মন্দিরটি ইউরোপীয় দালান রীতিতে নির্মিত হয়েছে। এই মন্দির স্থাপত্যটিতে উপনিবেশিক ভাবধারার প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান রয়েছে। মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই মন্দিরটি নির্মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে পুরু ইট ও প্লাস্টার। মন্দিরটির সম্মুখ দেয়ালে ইউরোপীয় ধারার ডরিক পিলারের আদল পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও মন্দিরের সমতল ছাদ, আর্চ নকশার দরজা ও বিশালত্ব এখানে ইউরোপীয় ধারার প্রবাবকে বর্ণিত করে। কালীবাড়ি মন্দিরটি নিমার্ণের ক্ষেত্রে মন্দির গাত্র অলংকরণে দেশিয় রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশিয় রীতির পোড়ামাটির চ্যাপ্টা ইট, একছাদ বিশিষ্ট ঘর ও বারান্দা, কুলঙ্গির ব্যবহার, দেশিয় ধারার ফুল লতাপাতার নকশা, আলপনা পরিলক্ষিত হয়।

কালীমন্দির: এটিও ইউরোপীয় দালান রীতির মন্দির। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরু ইট ও প্লাস্টারের ব্যবহার করা হয়েছে। যা উপনিবেশিক ভাবধারার প্রভাব। মন্দিরের সমতল ছাদ, সোজা কার্নিশ, আর্চনকশার খিলান দরজা ও এর বিশালত্ব ইউরোপীয় প্রভাবকে বর্ণিত করে। দেশিয় রীতির মধ্যে এই মন্দিরটি নির্মাণে অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির চ্যাপ্টা ইট, একছাদ বিশিষ্ট ঘর ও বারান্দা, কুলঙ্গির ব্যবহার, দেশিয় ধারার ফুল লতাপাতার নকশা, আলপনা নকশা, মন্দিরের পাশে বিশালাকার জলাধার ব্যবহৃত হয়েছে।

চালা রীতির মন্দির: চৌচালা মন্দির এর ধারায় নির্মিত হয়েছে জোড়া শিব মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরীমন্দির। এই মন্দিরগুলো নির্মিত হয়েছে বাংলার চালা রীতি অনুসরণ করে। এগুলো যে উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে নির্মিত তা বোঝা যায় এর গাঠনিক রূপ দেখে। মন্দিরগুলি চালা রীতিতে নির্মিত হলেও এর শিখর বেশ শুউচ্চতা সম্পন্ন। প্রথম দিকের চালারীতির মন্দিরগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এদের চালাগুলো বেশি উঁচু ছিল না এবং এই চালাগুলোর প্রসস্ততা অনেকটাই বেশি ছিল।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির: বদরগঞ্জের সিদ্ধেশ্বরীর দুটি মন্দিরই সুউচ্চ বেদির উপর নির্মিত। এই মন্দিরগুলোর সার্বিক দিক বিবেচনা করে এটি অনুমিত হয় যে উপনিবেশিক শাসন শুরুর পর আঠারো শতকের শেষ ভাগে কিংবা উনিশ শতকের শুরুর দিকে নির্মিত হয়। মন্দিরগুলো অনেকটাই বিবর্তিত ধারায় নির্মিত। মন্দিরের ভেতরে কুলঙ্গির ব্যবহার এর দেশিয় ভাবধারার বাহক। মন্দিরের চার কোণের দেয়ালে খাজ খাজ অংশ দেশিয় ধারার প্রতীক। মন্দিরের দরজায় ফুল লতাপাতার নকশা দৃশ্যমান রয়েছে। উপনিবেশিক ধারার অংশ হিসেবে এই মন্দিরে রয়েছে পুরু ইট ও প্লাস্টারের ব্যবহার, প্রসস্ততা, দরজায় আর্চের ব্যবহার। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একটি একদম সংস্কারকৃত অপরটি অর্ধ সংস্কারের ফলে এর সঠিক রূপ নিরূপণ করা কঠিন।

জোড়া শিব মন্দির: অপরদিকে চালা স্টাইলের প্রফুল্লরায় জমিদারবাড়ির জোড়া শিব মন্দির প্রায় ধংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জমিদার বাড়ির মন্দির দুটি ব্রিটিশ সময়ের পুরু ইট দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের দেয়ালে প্লাস্টারের

নমুনা সুস্পষ্ট। দেশিয় ধারার মধ্যে এই মন্দিরের চারচালা ধরন, বাঁকানো কার্নিশ, দেশীয় নকশা দৃশ্যমান রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এর সঠিক অলংকরণ প্রক্রিয়া আন্দাজ করা যায়নি।

গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দির: বদরগঞ্জের শেখের হাটবাজারের শিব মন্দিরটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট সংস্কারকৃত মন্দির। এটি হাল আমলের বিংশ শতাব্দীর শুরুর ভাগে নির্মিত বলে ধারনা করা যায়। মন্দিরটিতে সমতল ছাদের উপর উপনিবেশিক ধারার একটি চিকন কাঁধ বিশিষ্ট গম্বুজ গোলাকার ড্রামের উপর উপবিষ্ট। গম্বুজটিতে রিবড্ বোনের মতো খাঁজকাটা নকশা দৃশ্যমান। এর সোজা কার্নিশ বরাবর ফুল লতাপাতার নকশা দৃশ্যমান রয়েছে। যা কিনা দেশিয় ধারার প্রভবকে নির্দেশ করে। মন্দিরের চার দেয়ালে টারেট সদৃশ চিকন পিলার দৃশ্যমান। যার নিচের অংশে দেশিয় রীতির কলম ডিজাইন ও উপরিভাগে ক্রাউন অংশে অনেকটাই করিন্থিয়ান অর্ডার সদৃশ বাঁকানো পাতার নকশা দৃশ্যমান রয়েছে। এটি উপনিবেশিক ও দেশিয় ধারার সংমিশ্রিত প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য ধারক।

গোবিন্দগঞ্জে ইপিজেড ও সাঁওতাল ভূমি

ড. এস. এ. তালুকদার

'গোবিন্দগঞ্জ' নামটি প্রশাসনিকভাবে একটি ছোট ইউনিটের নাম হলেও এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অনেক বড়। ১৭৯৩ সালে গোবিন্দগঞ্জ থানা হিসেবে প্রশাসনিক স্বীকৃতি পায়। পলাশবাড়ি ও সাঘাটা থানা এক সময় গোবিন্দগঞ্জের ভিতরেই ছিল। তখন গোবিন্দগঞ্জের আয়তন ছিল ৩২৭ বর্গমাইল। বর্তমানে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার আয়তন ৪৬০.৪২ বর্গ কি,মি এবং জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। কৃষি পণ্য উৎপাদনে গোবিন্দগঞ্জের মাটি ভীষণ উর্বরা। সব ধরণের শস্য উৎপাদনে গোবিন্দগঞ্জের সুনাম 'মোগল আমল' থেকেই। গোবিন্দগঞ্জকে ঘিরে 'করতোয়া নদী' এক সময় ভীষণ প্রমত্তা ছিল। এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল গোবিন্দগঞ্জের বিশাল হাট। যা 'গঞ্জের' হাট নামে পরিচিত ছিল। ফরাসি ভাষায় 'গঞ্জ' অর্থ 'হাট'। মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল থেকেই তাই 'গঞ্জের' হাট ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসিদ্ধ স্থান। ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়তে হতো গোবিন্দগঞ্জ 'কেন বিখ্যাত?' গোবিন্দগঞ্জের সন্তান হিসেবে তখন খুব মনযোগ দিয়ে বিষয়টা পড়তাম। 'গোবিন্দগঞ্জ-রংপুর' অঞ্চলের একটি বৃহৎ থানা। এখানে একটি ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। যা মহিমাগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'রংপুর সুগার মিল' নামে খ্যাত। প্রায় ১৮৪৩ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত 'বাগদা ফার্ম' এ রংপুর সুগার মিলের আখ উৎপাদন হয়। গোবিন্দগঞ্জের কোচাশহর এলাকা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও হোসিয়ারী পোশাক তৈরির জন্য বিখ্যাত। গোবিন্দগঞ্জের রাজা বিরাট এবং বর্ধনকুঠিতে রাজা জমিদারদের বসবাস ছিল। রাজপ্রাসাদের ভগ্ন চিহ্নগুলো এখনও বিদ্যমান। গোবিন্দগঞ্জের পশ্চিম অঞ্চলের মাটি 'লাল'। এই এলাকায় প্রচুর ধান উৎপাদন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোবিন্দগঞ্জ হলো উত্তরবঙ্গের প্রবেশ দ্বার। পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধার মানুষকে গোবিন্দগঞ্জের ওপর দিয়ে সড়ক পথে ঢাকা যেতে হয়। বর্তমানে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা গাইবান্ধা জেলার বৃহৎ উপজেলা। ১৯১২সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুল। ব্রিটিশ আমল থেকেই এটি ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১৬ সালে এ স্কুল থেকে খলসী গ্রামের বাসিন্দা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ মেট্রিকুলেশন পাস করেন। যার নামে বর্তমানে গাইবান্ধা স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে।

১৯৪২সালে শিক্ষার আলো ছড়ানো এই বিদ্যাপীঠ থেকে গোবিন্দগঞ্জের আরো একজন কৃতিসন্তান মেট্রিকুলেশন পাস করেন। উনি হলেন বিখ্যাত 'কাজী পেয়ারা'র জাত উদ্ভাবক প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাজী বদরুদ্দোজা। সৌভাগ্যবান আমিও এ স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছি।

গোবিন্দগঞ্জে এখনও হাট বসে কিন্তু জনসংখ্যার চাপে, বসতবাড়ি এবং দোকানঘরের ভিড়ে আগের মতো হাট আর জমে ওঠে না। গোবিন্দগঞ্জ এখন একটি শহর। এখানে একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ধনকুঠিতে অবস্থিত গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ সরকারি হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দগঞ্জ হাই স্কুলটিও সরকারি হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসারে এখন দরকার গার্লস স্কুল এবং মহিলা কলেজ সরকারিকরণ।

শহরে মানুষের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় গোবিন্দগঞ্জে নিয়মিত জ্যাম হয়। গোবিন্দগঞ্জ হয়ে যারা ঢাকা যায় তারা জানেন কি বিশাল সে জ্যাম। গোবিন্দগঞ্জ শহরে একটা ওভার ব্রিজ অথবা শহর বাইপাস রোড হওয়া তাই খুব দরকার।

প্রমত্তা করতোয়া এখন মরা নদী। করতোয়াকে ঘিরে আর ব্যবসা বাণিজ্য হয় না। ফলে কৃষি পণ্যের বাজার প্রসারণের সম্ভাবনা কমে গেছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ এবং বেকারত্বের হার বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । উপজেলায় দুইটি হিমাগার আছে। তাতে অল্প কিছু কম শিক্ষিত মানুষের কর্ম সংস্থান হয়েছে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার সমানুপাতিক হারে বেকারত্বের পরিমাণ অনেক বেশি। যা মোকাবেলায় গোবিন্দগঞ্জে শিল্প কারখানাভিত্তিক কর্মসংস্থান দরকার।

ষাটের দশক থেকে গোবিন্দগঞ্জের কোচাশহরে গড়ে ওঠা হোসিয়ারী শিল্পে, স্যুয়েটার, গেঞ্জি, মোজা, টুপিসহ শীত নিবারক প্রায় ৩০ প্রকার পণ্য তৈরি হয়। সে সময় এখানে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। ইদানীং এ শিল্পটি মূলধনের অভাবে ব্যবসায়ীক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। কোচাশহরের এই হোসিয়ারী শিল্পের আধুনিকীকরণ না হওয়ায় উৎপাদন খরচ যেমন বেড়ে গেছে তেমনি কর্মসংস্থানও কমে গেছে। দ্রুতই সরকারি দৃষ্টি না পড়লে এবং এই শিল্পটির আধুনিকীকরণ না হলে যে কোনো সময় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঠিক যেভাবে কোচাশহরের মাটির পাতিল, কুয়ার পাট তৈরির মৃত্তিকা শিল্পটি যেভাবে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হওয়ার পথে এর সাথে জড়িত কুমারদের কর্মসংস্থান।

গোবিন্দগঞ্জে সুগার মিল চালু অবস্থায় এর সাথে সরাসরি প্রায় ১৬শ লোক, তাদের পরিবার এবং পাঁচ হাজারের মতো কৃষক ও তাদের পরিবারের কর্মসংস্থান হয়েছে। একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি (রংপুর সুগার মিল) বন্ধ হওয়ার পর ঐ সব লোক এখন বেকার।

ফলে ৩৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের মিল ক্যাম্পাসটি বর্তমানে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশাল কর্মযজ্ঞ এলাকাটি এখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বাগদায় নিজস্ব আখ উৎপাদন খামার, জৈব সার কারখানা, অফিস ও আবাসন ভবন সমন্বয়ে সুগার মিল এবং মহিমাগঞ্জের আশেপাশের এলাকা এই মিলের জন্য ছিল প্রাণবন্ত। যা এখন নিরব এবং মৃত।

এমনিতেই গাইবান্ধা জেলা তথা রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হার বেশি। জীবনমানের দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ অনেক পিছিয়ে। শহুরে পরিবেশ গড়ে উঠায় এবং ব্যাপক আবাসন তৈরি হওয়ায় কৃষি জমি কমে আসছে এবং কৃষিতে কর্মসংস্থান ব্যাহত হচ্ছে। নতুন কোনো শিল্প কারখানা গড়ে না ওঠায় গোবিন্দগঞ্জ এলাকা দিন দিন পশ্চাৎপদ হয়ে যাচ্ছে। মাদকের ভয়াবহতা, সন্ত্রাস চাঁদাবাজি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর মাত্র একটি ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান 'রংপুর সুগার মিল' পেয়েছিল গোবিন্দগঞ্জ। আর ব্যক্তি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল 'কোচাশহর হোসিয়ারী শিল্প'। গোবিন্দগঞ্জে শিল্প কর্মসংস্থান প্রায় শূন্য।

২০১৬ সালের 'শিল্প নীতিতে' রংপুর বিভাগকে শিল্পে অনুন্নত এলাকা বলা হয়েছে। এজন্য ২০২১ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু গাইবান্ধা জেলায় এর কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায় না।

শিল্প কারখানা তৈরির জন্য গ্যাস অন্যতম জ্বালানি। যা গাইবান্ধা জেলায় নাই। একারণে এ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ আগ্রহী লোকের অভাব। এলাকার বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি প্রণোদনায় গোবিন্দগঞ্জ এলাকায় কিছু শিল্প গড়ে উঠলে তা লাভজনক হতো। কারণ গোবিন্দগঞ্জে শিক্ষার হার অন্যান্য উপজেলার চেয়ে বেশি। আবার প্রচুর বেকার নারী পুরুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। রপ্তানির জন্য গোবিন্দগঞ্জ থেকে ভারত, নেপাল, ভূটানের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং গোবিন্দগঞ্জে সস্তা শ্রমিক দিয়ে রপ্তানি শিল্পকে লাভজনক করা সম্ভব। এছাড়া কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য গোবিন্দগঞ্জ অনেক বেশি উপযোগী। কৃষির প্রচুর কাঁচামাল গোবিন্দগঞ্জেই উৎপাদন হয়।

দিনাজপুর ফুলবাড়িয়ার 'মধ্যপাড়া কঠিনশিলা' প্রকল্পের পাথর ব্যবহার করে গোবিন্দগঞ্জে সিমেন্ট শিল্প গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও গোবিন্দগঞ্জের পশ্চিমাঞ্চলে নারী শ্রমিক দ্বারা 'সাবান কারখানা' বস্ত্র কারখানা' গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব। কোচাশহরের ক্ষুদ্র শিল্পকে আধুনিক করে গড়ে তুলে এখানে রপ্তানি যোগ্য কার্পেট, পাটের জিনিসপত্র তৈরি করতে পারলেও এলাকার বেকারত্ব দূর করে জাতীয় অর্থনীতিতে গোবিন্দগঞ্জের মানুষ ভূমিকা রাখতে পারতো।

বিগত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবহেলিত বঞ্চিত দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় ১০০টি ইপিজেড তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার কথা বলা হয়েছে।

এলক্ষ্যে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য নির্ভর গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের 'বাগদা ফার্ম' এলাকায় ০১টি ইপিজেড তৈরির জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। যা নিয়ে গত ২৩ আগস্ট (২০২১) বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম, গোবিন্দগঞ্জ ইপিজেড তৈরির প্রকল্প পরিচালক মোঃ আশরাফুল কবিরের উপস্থিতিতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিস কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ দিনই তারা বাগদা ফার্ম এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

ইপিজেডটির কার্যক্রম আগামী ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানায়।

রংপুর সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সুগার মিলটি উৎপাদনে যায়। ১৯৬২সালের ৭ জুলাই চার মৌজার মোট ১৮৪২.৩০ একর জমি নিয়ে 'বাগদা ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূলত আখ উৎপাদনের জন্য সুগার মিলের নিজস্ব আখ খামার হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

সাঁওতালসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের জমি আছে বাগদা ফার্মের আওতাধীন।

অধিগ্রহণের ৪০বছর পর লোকসানের কবলে পড়ে রংপুর সুগার ২০০২ এবং ২০০৪ সালে লে-অফে যায়। তারপর দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে চিনিকল কর্তৃপক্ষ বাগদা ফার্মের জমি লিজ দেয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত এ লিজ বলবৎ ছিল। সুগার মিল কর্তৃপক্ষ বাগদা ফার্মের জমি লিজ দিয়ে আখের পরিবর্তে অন্য ফসল আবাদ করায় অধিগ্রহণের শর্ত লংঘন হয়েছে মর্মে সাঁওতালরা বাগদা ফার্মের জমি ফেরত চায় এবং আন্দোলন শুরু করে। রংপুর সুগার মিল কর্তৃপক্ষ ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলে জানায়,

বাগদা ফার্মের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার কোনো উপায় নাই।

১৯৮০ সালে সংসদে পাস হওয়া আইনের মাধ্যমে দেশে ইপিজেড তৈরির কথা বলা হয়। মূলত আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোকেই ইপিজেড স্থাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়। ইপিজেড তৈরিতে তিন ফসলী জমি নষ্ট না করা, জলাশয় ভরাট করে, পরিবেশের নষ্ট না করার কথা বলা হয়। ইপিজেডের জন্য তাই জায়গা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

বন্ধ সুগার মিলের আখ খামারটিতে উন্নয়নমূলক কিছু একটা করতে স্থানীয় প্রশাসন একসাথে এতো জমির কথা সরকারকে অবহিত করে। সে কারণে গাইবান্ধায় ইপিজেডের জায়গা পেতে বেপজা কর্তৃপক্ষ গোবিন্দগঞ্জের ‘বাগদা ফার্ম’টি খুব সহজেই খুঁজে পায়। এতে অধিগ্রহণের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে সাঁওতালরা দাবী করলেও সরকার কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমি সুগার মিলের কাছেই রেখেছেন এবং সেই জমিতে ইপিজেড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাগদা ফার্মে ইপিজেড তৈরির সরকারি পরিকল্পনাকে স্থানীয়রা স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে। আর সাঁওতালরা তাদের বাপ দাদার সম্পত্তি ফেরত চেয়ে ইপিজেড তৈরির পরিকল্পনার বিরোধিতা করে মিছিল করেছে।

স্বভাবগতভাবে সাঁওতালরা শান্তিপ্রিয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সাঁওতালরা বংশ পরম্পরায় বিদ্রোহ-আন্দোলন করেই টিকে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৮৫৫ সালে সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব- এই চার ভাইয়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহে ১০হাজার সাঁওতাল মারা যায়। এরপর নাচোলের রাণী খ্যাত ইলা মিত্রের নেতৃত্বেও সাঁওতালরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে সেখানেও ব্যর্থ হয়। প্রতিবারই টাউট-বাটপাররা সাঁওতালদের ভাগ্য নিয়ে খেলে। বাগদা ফার্মের অধিগ্রহণের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে বলে এখানেও টাউটরা সাঁওতালদের সাথে প্রতারণা করে তারাই লাভবান হয় সাঁওতালরা বঞ্চিতই থেকে যায়। ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর তিনজন সাঁওতালের জীবনও যায় এ ফার্মকে কেন্দ্র করে। সাঁওতালদের এ মৃত্যু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

দেশের অন্যান্য উপজাতির চেয়ে মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালদের অংশগ্রহণ ছিল তাদের দেশপ্রেমের প্রতিফলন। সাঁওতালরা এদেশের নাগরিক। তারাও যাতে ভালোভাবে বসবাস করতে পারে সেটি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদেও সকল নাগরিকের জন্য সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বলেছিলেন– ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা হবে। ক্ষুদ্র

নৃগোষ্ঠীর জনগণও স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক এবং অন্যান্য নাগরিকদের মতোই সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করবে’। সেদিক থেকে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোটেই কাম্য নয়।

উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়। রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিধর কেউ নয়। গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্মে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার জন্য গত ২৩ আগস্ট বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান পরিদর্শনে এসে বলেছেন ‘উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় রংপুর চিনিকলের ১৮৪২.৩০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এখানে ইপিজেড স্থাপিত হলে এ অঞ্চলের শিক্ষিত ও বেকার যুবকরা চাকরির সুযোগ পাবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। মানুষের জীবনমানে পরিবর্তন আসবে। জাতীয় অর্থনীতির চাকা চাঙ্গা হবে’।

জাতীয় উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে গোবিন্দগঞ্জ ইপিজেড গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে যেন আইনের কোনো বরখেলাপ না হয় সেটিও দেখা সরকারের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইপিজেড চট্টগ্রাম ইপিজেড। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৪৫৩ একর এলাকা নিয়ে। ঢাকা ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩৫৬.২২ একর এলাকা নিয়ে। নীলফামারীর সৈয়দপুরে ‘উত্তরা ইপিজেড’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২১৩.৬৬ একর এলাকা নিয়ে। সেক্ষেত্রে বাগদা ফার্মের ১৮৪২.৩০ একর এলাকা জুড়ে গোবিন্দগঞ্জ ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেন? ৫০০একর এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা হবে দেশের সবচেয়ে বড় ইপিজেড। বাকী সম্পত্তি ২০১৭ সালের হুকুম দখলও অধিগ্রহণ আইনের ১৯ (১) ও ২ ধারা মোতাবেক প্রত্যাশী মালিকদের বিধি মোতাবেক ফেরত দেওয়া যেতে পারে। তাতে সংবিধান এবং আইন দুটোই সমুন্নত থাকবে। উন্নয়নের জন্য ইপিজেডও হবে। আবার সাঁওতালরাও তাদের বাপ দাদার সম্পত্তি ফেরত পাবে।

গোবিন্দগঞ্জবাসীর জন্য এটি একটি মহা সুযোগ। গোবিন্দগঞ্জে যেহেতু গ্যাস সরবরাহ নাই। তাই সহজে এখানে কোনো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠারও সম্ভাবনা নাই। গোবিন্দগঞ্জে কোনো বিসিক শিল্প নগরীও নাই। সুতরাং ইপিজেড তৈরির মধ্য দিয়ে যে সুযোগ এসেছে তা কোনভাবেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না। ইপিজেড তৈরির এ সুযোগ নষ্ট হলে গোবিন্দগঞ্জ দীর্ঘ অবহেলার শিকার হবে।

মানুষ জমি বিক্রি করে সন্তানের চাকরির জন্য ঘুষের টাকা জোগাড় করে।

বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে। কারণ তুলনামূলক হিসেবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের জন্য যে খরচ হয় তার থেকে চাকরিতে অধিক আয় হয়। সুতরাং শুধু কৃষি জমির উপর নির্ভর করে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষেই পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিষয়টি সাঁওতালদেরও বোঝা দরকার। লড়াই করে শূন্য হাতে ফেরার চেয়ে সন্তানদের চাকরি এবং অবশিষ্ট জমি ফেরত নিয়ে সরকারকে সহায়তা করাই তাদের জন্য লাভজনক হবে।

গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতালদের বাগদা ফার্মে ইপিজেড প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দিতে যে সকল সুশীল সমাজ বুদ্ধিজীবী পিছন থেকে অর্থ এবং আইনী সহায়তা দিচ্ছেন তাদেরও বিষয়টি ভাবা দরকার। সাঁওতালদের ভাগ্য বিড়ম্বনার ইতিহাস সবার জানা। গোবিন্দগঞ্জে ইপিজেড তৈরিতে বাঁধা দিয়ে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সাঁওতালদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ করবো। ১৮৪২.৩০ একর জমির মধ্যে যেটুকু প্রয়োজন ততটুক জমি বেপজা কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ইপিজেড তৈরিতে সহায়তা করুন। সাঁওতালদের বঞ্চনার অবসান হবে। উন্নয়ন ও অধিকার দুটোই সংরক্ষণ হবে।

মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে সরকারের কাছেও নিবেদন ইপিজেডে সাঁওতাল সন্তানদের বংশ পরম্পরায় চাকরি নিশ্চিত করুন। জমি ও চাকরির মাধ্যমে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করুন।

একটি ইপিজেড বাগদা ফার্ম এবং এর আশেপাশের এলাকা তথা গোবিন্দগঞ্জকে উন্নয়নের হাব বানাবে। ঐতিহ্যবাহী গোবিন্দগঞ্জবাসীর ঐতিহ্যকে ঠিক রাখতে তাই জাতি, উপজাতি সম্প্রতি বজায় রেখে উন্নয়ন হতে হবে। সম্মিলিতভাবে সরকারের ইপিজেড তৈরির পরিকল্পনাকে সহযোগিতা করে গোবিন্দগঞ্জকে উন্নয়নের ধারায় এনে পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণার করা যেতে পারে। ইপিজেডে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এখানে একটি বিমানবন্দরও আবশ্যক হবে।

বৃহত্তর দিনাজপুরের জীবন-জীবিকা

তুষার শুভ্র বসাক

জীবনযাপনের একক হলো-জীবিকা। আর এই জীবিকা বহুরূপী। বহুরূপে গুণান্বিত হয়েই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন শ্রমশিল্পের। এই শ্রমশিল্প লোকজ, এই শ্রমশিল্প প্রযুক্তি-নির্ভর। শিল্পকে সাধারণত উৎপাদনের বাহন বলা হয়। শিল্প-পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন ও প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। শিল্প-প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। যেমনঃ কাঠ (কাঁচামাল) দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাট, দরজা, জানালাসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র (উপযোগ) তৈরি করা হয়। তাই জীবিকার প্রসঙ্গে বলা যায়, শত-শত বছর ধরে কাঁচামাল দিয়ে উপযোগ সৃষ্টি করে-অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে, মানুষ জীবনযাপন করে আসছে। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে শ্রমশিল্প প্রধানত ২টি খাতে বিভক্ত। যথা:

১. প্রাথমিক-পর্যায়ের শিল্প (প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণের উপর নির্ভরশীল)

ক. কৃষিশিল্প।

খ. প্রজননশিল্প (পোনা উৎপাদন, রেশম-চাষ, পোল্ট্রি ও গবাদি পশুর ফার্মসহ প্রভৃতি)।

গ. নিষ্কাশনশিল্প (কয়লা আহরণ, মাছ ধরা, মধু সংগ্রহসহ প্রভৃতি)।

২. মাধ্যমিক-পর্যায়ের শিল্প (প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণ থেকে উৎপাদনযোগ্য)।

ক. বিশ্লেষণশিল্প (খনিজ তেল পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল প্রস্তুতকরণ, খনিজ কয়লা হতে কোক কয়লা, ন্যাপথলিন, আলকাতরা প্রস্তুতকরণ)।

খ. যৌগিকশিল্প (গার্মেন্টস, সাবান ফ্যাক্টরি, সার কারখানা, অটো রাইস মিল, চিনি উৎপাদন, ইস্পাত প্রস্তুতকরণসহ প্রভৃতি)।

গ. সংযোজনশিল্প (বিমান, জাহাজ, মোটরগাড়ি নির্মাণ)।

ঘ. নির্মাণশিল্প (দালানকোঠা, বাঁধ, সেতু, রাস্তাঘাটসহ প্রভৃতি)।

ঙ. সেবাশিল্প (শিক্ষা, ব্যাংকিং ও বীমা, চিকিৎসা ও ফার্মেসি, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ, ডাক, পরিবহন, বর্জ্য-নিষ্কাশনসহ প্রভৃতি)।

অপরদিকে, বিনিয়োগের আকারের দিক থেকেও শ্রমশিল্পের ৫টি খাত। যথা:

১. বৃহৎশিল্প (জমি ও কারখানা-ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার বেশি)।

২. মাঝারিশিল্প (জমি ও কারখানা-ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা)।
৩. ক্ষুদ্রশিল্প (জমি ও কারখানা-ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৭৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা)।
৪. মাইক্রো বা অতি ক্ষুদ্রশিল্প (জমি ও কারখানা-ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা)।
৫. কুটিরশিল্প (জমি ও কারখানা-ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম এবং সম্ভবপর এই শিল্পে পারিবারিক প্রাধান্য থাকে)।

জাতীয় শিল্পনীতি, ২০২২-এ এইসব খাতের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্যানুসারে, দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প (এসএমই) খাতের অবদান ২৫ শতাংশের বেশি। শ্রমঘন ও বৃহৎ ভোক্তাশ্রেণির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এসএমই খাতের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রতিনিয়ত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি- বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এই খাতগুলোর বড় অবদান রয়েছে।

বিবিএস-এর সূত্রমতে, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪২.৩০ শতাংশ।[১] ৬ বছর পর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭.২৩ শতাংশে এবং আরও ৬ বছর পর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তা হ্রাস পেয়ে হয় ২৪.৮ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ের ব্যবধানে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিভাগে দারিদ্র্যের হার প্রায় ১ শতাংশ কমে ২৮.৯৩ শতাংশ হয়েছে। এর মানে- এই সময়ে রাজশাহী অঞ্চলে দারিদ্র্যের পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। কিন্তু ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সেই হার হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৪.৮ শতাংশ।[২]

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে- "দৈনিক ১.৯০ ডলার (বর্তমানে ২০৮ টাকা)-এর কম আয় করা মানুষ দরিদ্র বলে গণ্য হবেন"। তাই প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে- বর্তমানে বাংলাদেশে কুড়িগ্রাম (৭০.৮%) জেলার পরেই দিনাজপুর জেলায় সর্বাধিক ৬৪.৩% দরিদ্র মানুষ রয়েছে। এই তালিকায় অষ্টম, নবম এবং দশম স্থানে রয়েছে গাইবান্ধা (৪৬.৭%), রংপুর (৪৩.৮%) ও নীলফামারী (৪২%)।[৩]

মাটির ধরন, সেচ-ব্যবস্থা, জলবায়ু, কাঁচামালের প্রাচুর্যতা, জনশক্তি, যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুর প্রধানত কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং এখানকার অধিকাংশ মানুষ জীবিকার ক্ষেত্রে প্রাথমিক-পর্যায়ের কৃষি এবং মাধ্যমিক-

পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক শিল্প বা পণ্যের উপর নির্ভরশীল। সহজ কথায়- এই বৃহত্তর অঞ্চলের মানুষ মৃৎশিল্প, টেরাকাটা ও সিরামিকশিল্প, কামারশিল্প, ডোকরাশিল্প, দারুশিল্প (কাঠ), শোলাশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্যশিল্প, ধাতবশিল্প, বন বা কারুশিল্প (বাঁশ), রাবার শিল্প, রেশমশিল্প, সূচিশিল্প, শঙ্খশিল্প, বস্ত্র বা তাঁতশিল্প, হিমাগারশিল্প, রন্ধনশিল্প, মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প, পাটশিল্প, ধোকরাশিল্প, চামড়াশিল্প, প্লাস্টিকশিল্পসহ বিভিন্ন শ্রমশিল্পের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রমশিল্পের বিভিন্ন খাত ও কাঁচামালের উপর নির্ভরতা- এই ভিত্তিতে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার খন্ডচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কৃষি-নির্ভর জীবন-জীবিকাঃ পুন্ড্র-বরেন্দ্র জনপদভুক্ত উত্তরবঙ্গ মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল। তাই স্বভাবসুলভ ভাবেই এই অঞ্চলের মানুষ কৃষিকেই বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে। প্রাচীন পেশাগুলোর মধ্যে কৃষি প্রধানতম। তাই এই পেশাজীবীদের জীবনে কাস্তে-কোদাল-লাঙ্গল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঙ্গের সাহায্যে কৃষকেরা মৌসুমী কৃষিজাত শস্য যেমনঃ ধান, গম, ভুট্টা, আলু, হলুদ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, আখ, পাট, সরিষাসহ বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদিত শস্য সরাসরি হাট-বাজারে বিক্রি করে অথবা আড়ৎদারদের নিকট বিক্রি করে সংসার পরিচালনা করে থাকে। ইতিহাস জানান দেয়, এই পেশার মানুষেরা নিজের জমি চাষ করার পাশাপাশি জোতদার-জমিদার কিংবা ভূমির মালিকদের নিকট হতে জমি বর্গা নিতো। তাই এদের বর্গা-চাষি বলা হয়। বর্গা ব্যবস্থা মূলত প্রাগমুদ্রা যুগের ঐতিহ্য। সেইসময় রাজা প্রকৃত উৎপাদকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন শস্যের মাধ্যমে। রাজকীয়-যুগ বিলীন এমনকি জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদ হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃহত্তর দিনাজপুরে- বর্গা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চিত্র এখনো বর্তমান। বলাবাহুল্য, প্রকৃত চাষিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো– তেভাগা আন্দোলন।

কৃষিভিত্তিক ও খাদ্যজাতশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকাঃ কৃষিভিত্তিক বা খাদ্যজাত-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পেশার সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পেশাগুলোকে কুটিরশিল্প খাতেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমনঃ জাঁতাকলে পিষে বা ঢেঁকিতে কুটে বা আধুনিক প্রযুক্তির ছোট মেশিনের সাহায্যে চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়াসহ আটা-ময়দা, যব, ছাতু প্রভৃতি

তৈরি করা হচ্ছে। অনেকে ঘানিটানা পদ্ধতিতে নয়তো মেশিনের সাহায্যে সরিষা ও কালোজিরা থেকে তেল তৈরি করে অর্থ উপার্জন করছে। অনেকেই ঘরে বসে সনাতন পদ্ধতিতে মুড়ি, চিড়া, চালভাজা তৈরি করছে। অনেকে বেসনের ঝুড়িসহ বিভিন্ন ধরনের ডালের পাপড় ও চিপস্ তৈরি করে সংসার পরিচালনা করছে। কাটারিভোগ চাল-চিড়া ও মুড়ি এবং মুগের পাপড়ের জন্য দিনাজপুর জেলা বিখ্যাত। পেটের তাগিদে অনেকেই ঠেলাগাড়িতে সাজিয়ে নয়তো গলার সাথে বুকে ছোট ডালি ঝুলিয়ে বাদাম, ছোলা বুট, সাত-মিশালি বা বারো-মাখা, বিভিন্ন ধরনের ফল মাখাসহ নানা মুখরোচক খাবার বিক্রি করে। কেউ কেউ আম, লিচু, কলা, কমলা, আপেল, পেয়ারা, বেদানা, আনারস, ডাব, ড্রাগনফলসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফল বিক্রি করে সমাজ-ব্যবস্থায় টিকে আছে। অনেকেই নার্সারিতে বিভিন্ন ধরনের ফলজ-ঔষধি ও সৌন্দর্যবর্ধক চারাগাছ বিক্রি করে। গ্রামে-গঞ্জে এমনকি শহরের যত্রতত্র মুদির দোকান চোখে পড়ে। গৃহস্থালীর দৃষ্টিকোণ থেকে বললে- এই বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে মুদির দোকান সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গতানুগতিক ব্যবসা। আপাতদৃষ্টিতে এসবই কৃষিভিত্তিক ও খাদ্যজাত-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত জীবন-জীবিকার অন্যতম ক্ষুদ্র মাধ্যম ও উৎস।

ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে চিন্তা করলে- শ্রমশিল্পের মধ্যে একমাত্র চাল-কল বা অটো রাইস মিলের পরিব্যপ্তি উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক। আমাদের দেশে মোট যোগানের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ধান ও চাল, উত্তরবঙ্গ থেকেই উৎপাদিত হয় এবং তা দেশজুড়ে বণ্টন করা হয়। অটো রাইস মিলের মালিকানা কিংবা রাইস মিলের শ্রমিক হিসেবে কর্ম করে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। কথায় আছে– 'চাল-লিচুতে ভরপুর, জেলার নাম দিনাজপুর'।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জে দেশের দ্বিতীয় প্রাচীনতম এবং জেলার একমাত্র ভারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান 'সেতাবগঞ্জ চিনি কল লিমিটেড', ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও সদরে 'ঠাকুরগাঁও চিনি কল লিমিটেড' এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চগড় সদরের ধাক্কামারায় 'পঞ্চগড় চিনি কল লিমিটেড' গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আখ এইসব চিনি-কলের প্রধান কাঁচামাল এবং চিনি, চিটাগুড়, ব্যাগাস ও প্রেসমাড এখানকার অন্যতম উপজাত-দ্রব্য। উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু শ্রমজীবী মানুষের উপার্জন- এই তিনটি চিনি-কলের উপর নির্ভরশীল।

কাঁচা পাট, কার্পাস ও ধোকরাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশে ব্যবহারিক কৃষি-চাষের মধ্যে পাট অন্যতম। এই পাটের ঐতিহ্য বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। কাচা-পাটকে কেন্দ্র করে বেশকিছু কুটিরশিল্প প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। ধোকরাশিল্প এরমধ্যে অন্যতম।

ইতিহাস জানান দিচ্ছে, অতীতে রাজবংশী ও পলিয়া সম্প্রদায় পাট-শিল্পের সাথে জড়িত থাকলেও এখন সব সম্প্রদায়ের মানুষ জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে পাটকে বেছে নিয়েছে। অনেকেই পাট দিয়ে বস্তা, ব্যাগ, পাপোস, শিকা, চট, দড়িসহ নিত্য-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করছে। বর্তমানে ফ্লোর, টেবিল ও প্লেসমেট, দেয়ালসজ্জা-পুতুল, নেটসহ বিভিন্ন ধরনের শৌখিন পণ্য তৈরি করতেও পাটের ব্যবহার হচ্ছে। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ছোট ছোট হাটের সৃষ্টি হয়েছে। সাপ্তাহিক হাটের দিনগুলোতে পাটের তৈরি কসরা নিয়ে তারা আলাদাভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। এইসব তৈরিকৃত পাটজাত পণ্য এবং পাট বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং এটিকে সোনালি আঁশ বলা হয়। বলা যায়, সংসারের টানে-অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে মানুষ এরূপ নানা পেশাগত কাজে সম্পৃক্ত।

চট বলতে ধোকরার কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কার্পাস ও পাটজাত ধোকরা- এই দুটি শিল্প সম্পর্কে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ষোড়শ শতকের দস্তাবেজ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহত্তর দিনাজপুরে এই শিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটে। মধ্যযুগের সাহিত্যে বেলন পাটের নেটের শাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিল্প মূলত নারীশিল্প। ঊনিশশতক পর্যন্ত এই শিল্পের জন্য দিনাজপুর জেলার সুনাম ছিল। বর্তমানে এই শিল্প বিলুপ্তির পথে। তাই ধোকরা-শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

কার্পাস-এর প্রধান কাঁচামাল হলো- তুলা। তুলা ভিজিয়ে নিয়ে সুতা তৈরি করে মেয়েরা অত্যন্ত কারুকার্যমন্ডিত ঝালোং বা বিছান, ব্যাগসহ প্রভৃতি পণ্য তৈরি করে। আবহমানকাল থেকে বৃহত্তর দিনাজপুরের রাজবংশী-পলিয়া মেয়েরা জীবনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে এই অপরূপ শিল্পবস্তুটিকে তৈরি করে আসছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে পাট এবং চায়ের প্রভাব এতটাই অর্থকরী যে, কৃষির অন্তর্ভুক্ত হয়েও পাট ও চা স্বতন্ত্র শ্রমশিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।

চাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: বাংলাদেশের মানচিত্রে দেখা যায়, আবহমানকাল ধরে সিলেট বিভাগের পাহাড়ি-অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় জেলার পাহাড়ি এলাকায় চায়ের চাষ হয়ে আসছে। পাহাড়ি অঞ্চল চায়ের জন্য উপযোগী হলেও দিনাজপুরের সমতল ভূমির জন্য সম্ভাবনা জাগানিয়া একটি কৃষি হচ্ছে- চা উৎপাদন। সম্প্রতি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর ও বিরামপুরে ব্যক্তিমালিকানাধীন সমতল ভূমিতে চায়ের চাষ সফলতার মুখ দেখেছে। দেশে চা উৎপাদনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের অবস্থান দ্বিতীয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-চাষি সৃষ্টির মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন যদি পুরো উত্তরবঙ্গে সম্প্রসারণ করা যায়, তাহলে দেশে একদিকে যেমন সবুজ বনায়ন করা সম্ভব, একইসাথে চা রপ্তানিমুখী কৃষি হওয়ায় চা-চাষি, মালিক ও চা-শ্রমিকেরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে সামর্থ্য হবে।
চা-চাষের উপর নির্ভর করে চা-শ্রমিকেরা যেমন দিনাতিপাত করছে, তেমনি অনেকেই দোকানঘরে প্যাকেটজাত কিংবা খোলা দানাদার চা বিক্রি করছে। সচরাচর চা বলতে সুগন্ধযুক্ত ও স্বাদবিশিষ্ট এক ধরনের উষ্ণ পানীয়কে বোঝায়, যা- চা-পাতা পানিতে ফুটিয়ে বা গরম পানিতে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়। চা পান- এটিও এক ধরনের ব্যবসায়িক উৎস। চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার জন্য অনেকেই টি-স্টলে আসে। চা পান করিয়ে- দোকানী স্বল্প বিনিয়োগে দৈনিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। অনেক টি-স্টলে চায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, কলা, পাউরুটি, কেক, পান, সিগারেট, চাল-ভাজা ও চিড়া-ভাজার প্যাকেট থাকে। বৃহত্তর দিনাজপুর তথা দেশের বহু মানুষ এই পেশায় নিয়োজিত।

রাবারশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: রাবার একটি লাভজনক কৃষিভিত্তিক শিল্প। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এবং আধুনিক সভ্যতার বিকাশে রাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বিশ্বে রাবার থেকে প্রায় ৪৬ হাজার পণ্য তৈরি হচ্ছে। রাবার বাগানগুলো অত্যন্ত শ্রমঘন কৃষিশিল্প হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত পাহাড়ি-অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বন বিভাগ পঞ্চগড়ে পরীক্ষামূলকভাবে বেশ কিছু রাবার গাছ রোপন করে। রাবার বাগানগুলো- শ্রমজীবী নারী-পুরুষের মাঝে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

রাবার কাঠ হতে পার্টিকেল বোর্ড, লেমিনেটিং বোর্ড, মিডিয়াম ডেনসিটি

ফাইবার বোর্ডসহ বহু পণ্য তৈরি হয়। এইসব প্রথম শ্রেণি-পর্যায়ের কাঠ হতে উন্নতমানের আসবাবপত্র এবং কাঠজাত সামগ্রী তৈরি করা হয়। এসব আসবাবপত্র নির্মাণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে এই অঞ্চলের অনেক মানুষ পেশাসূত্রে জড়িত।

বনশিল্প বা বাঁশ, কাঠ-নির্ভর জীবন-জীবিকা: বাঁশ ও কাঠকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পেশা গড়ে উঠেছে। মূলত বাঁশ-নির্ভর শিল্পকে কারুশিল্প এবং কাঠ-নির্ভর শিল্পকে দারুশিল্প বলা হয়। এই অঞ্চলে বন বিভাগের অধীনস্থ বেশকিছু বনভূমি রয়েছে। এই বনভূমির দেখাশোনা করা, বনভূমি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ– এই সবকিছুর ওপর নির্ভর করেই উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। এই বাঁশকে কেন্দ্র করে অনেক হাট গড়ে উঠেছে, যেখানে আস্ত বাঁশ বা বাঁশের তৈরি মাচাং বিক্রি করা হয়। সাধারণত গৃহস্থালী সামগ্রীতে বাঁশের বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমনঃ কুলা, ডালি, ঝুড়ি, চালনি, পাখা, চকি, ঢাকনা, মাচাং, কোদালের হাতল, কুড়ালের হাতল, ধারাই লাঙ্গলের হাতল, মই, জোঁয়াল পলো, হাঁস-মুরগি ঢাকা দেওয়ার টোপা, গোমাই, লগি, ধান শুকানোর কাড়াইল, গরুর গাড়ি, নৌকার ছই, গরুর চারির খোর, তীর-ধনুক, ডুলি, গোলা, মাছ ধরার ডারকি, কোচ, বানা, ফান্দি, দড়াইসহ প্রভৃতি। এইসব সামগ্রী তৈরি করার জন্য যে পেশাদার শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তাদেরকে 'হাড়ি' বলা হয়। হাড়িরা বংশ-পরম্পরায় এই পেশার সাথে জড়িত। বর্তমানে ফটোস্ট্যান্ড, ফুলদানি, ফলদানি, আয়নার স্ট্যান্ড, খেলনা পুতুল, কলমদানি, টেবিল-ল্যাম্প, ছাইদানি, বুকসেল্ফ, টুথ ব্রাশ, কলম, তুলি, ওয়ালমেটসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক সামগ্রী তৈরি হচ্ছে বাঁশ দিয়ে।

লোকজ বাদ্যযন্ত্র নির্মাণেও বাঁশের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমনঃ বাঁশি, একতারা, বাচ্চাদের সারিন্দা, বানা ইত্যাদি। পেশায় যারা বাঁশিওয়ালা, কিংবা বাউলশিল্পী তাদেরকেও এই বাঁশের তৈরি পণ্যের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। অনেকে ছোট ছোট বাঁশির সাথে বেলুন লাগিয়ে তা বিক্রি করে। বৃহত্তর দিনাজপুরের কোথাও কোথাও এখনো বাঁশের তৈরি দোতালা বাড়ি দেখা যায়। এটি এই অঞ্চলের একটি ঐতিহ্য। বাঁশ-কাঠ ও টিন-নির্ভর এই নির্মাণ (ঘরবাড়ি, বেড়ার প্রাচীরসহ প্রভৃতি) পেশার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে 'ঘরামি' বলা হয়। এমন অনেকেই আছে যাদের পেশার মূল

কাঁচামাল হলো– কলাগাছ। মূলত ভেলা তৈরিতে কলাগাছ ব্যবহৃত হলেও কলাগাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে ডোঙা, শাস্ত্রীয় পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত ছোট আকৃতির পুাকা, বিয়ের অনুষ্ঠানের ছায়ামণ্ডপ তৈরি করা হয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এগুলো তৈরি করা হয়।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণির পাশাপাশি সাধারণ গৃহস্থীর সৌখিন শিল্পায়িত গৃহে, চালের বাতা, চৌকাঠ, কড়িকাঠ, খিলানসহ প্রভৃতিতে কাঠের কারুকাজ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও খাট, পালং, সিন্দুক, চেয়ার-টেবিল, সোফা, আলমারি, চেস্ট অব ড্রয়ারসহ প্রভৃতি আসবাবপত্র কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়। এই সব সামগ্রী তৈরি করার জন্য যে পেশাদার শ্রেণি গড়ে উঠেছে তাদেরকে ছুঁতার বা কাঠমিস্ত্রি বলা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুরের ছুঁতার বা কাঠমিস্ত্রীদের কারুকাজ নিঃসন্দেহে শিল্পী-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। কারণ- এই কাঠজাত ব্যবহারিক সামগ্রীতে তারা লতা-পাতা-ফুলের আলপনা, মনুষ্যাকৃতি, হাতির শুঁড় কিংবা বিভিন্ন পশু-পাখির চিত্রসহ নানা জ্যামিতিক ছক খোদাই করে নকশায় রূপ দেয়। কাঠের তৈরি খড়ম, আজও প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। চামড়ার যুগে এর ব্যবহার এখন নেই বললেই চলে। অনেকে কাঠের তৈরি ব্যবহারিক সামগ্রীতে চার্চ-পালিশ করে অর্থ উপার্জন করে।

যে স্থানে ধারালো ব্লেডের সাহায্যে গাছ (দলাই) থেকে বিভিন্ন আকৃতির তক্তা, বাতা ও চৌকাঠ তৈরি হয়, তা হলো শ-মিল। আবার বাঁশের গোড়া ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছকে ঘিরে গড়ে উঠেছে খড়ির কারখানা। বহু মানুষ খড়ির কারখানা ও শ-মিলগুলোতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, উত্তরবঙ্গের জনজীবনে বাঁশ ও কাঠ বা বনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রজননশিল্প বা পশুপাখি ও পরিবেশ-নির্ভর জীবন-জীবিকা: বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বেশকিছু বনভূমি রয়েছে। বন বিভাগের অধীনস্থ এই বনভূমি এবং বনভূমিতে বসবাসরত পশুপাখির নিরাপত্তা বিধান, বনভূমি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ- এই সবকিছুর উপর নির্ভর করেই উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। লোক-বিনোদন ও সুষ্ঠু পরিচর্যার অংশ হিসেবে বন-জঙ্গলের নানা প্রজাতির পশুপাখিকে বিভিন্ন বিনোদন পার্কে কিংবা জেলা ও উপজেলা-পর্যায়ের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় রাখা হয়। এই পার্ক বা চিড়িয়াখানা পরিচর্যার কাজও অনেকে করে থাকে। লোক-বিনোদনের আরও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হলো- সার্কাস। সার্কাসেও সিংহ, বাঘ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর,

টিয়া, ময়নাসহ বিভিন্নধরনের পশুপাখির প্রশিক্ষিত কর্ষদ বা খেলা উপস্থাপিত হয়। এইসব পশুপাখির ট্রেনিং দেয়া, খেলা দেখানো এবং মূল সার্কাসকে কেন্দ্র করেই অনেকে জীবনযাপন করে।

গৃহপালিত পশুপাখির লালন-পালন, উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ বসতভিটায় গোয়ালঘর ছিল। দুই-চারটি গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি এমনকি গোয়ালঘরের চালার নিচে ডালা ঝুলিয়ে কবুতর পালন করা হতো। বর্তমানে এই চিত্র ফার্মে রূপ নিয়েছে। গবাদি পশুপাখি হতে প্রাপ্ত দুধ ও ডিম বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। হাঁস-মুরগি, কোয়েল-কবুতর কিংবা গরু-ছাগল ব্যবসায়ী এবং পেশাজীবী হিসেবে যারা কসাই, তাদের কাছে এইসব পশুপাখি আয়ের প্রধান উৎস।

বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের অনেকেই পোনা উৎপাদন, রেশম-চাষ ও মৌমাছি চাষকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র-পর্যায়ে প্রত্যেকটি উন্নত শ্রমশিল্প। মৌয়ালেরা মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। আবার কৃত্রিম উপায়েও মধু তৈরি করা যায়। এই অঞ্চলে সরিষা, মিষ্টি কুমড়া এমনকি লিচু-ফুলের মধুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মূলত মধুকে কেন্দ্র করেই একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীকেন্দ্রিক বা জলাশয়-নির্ভর জীবন-জীবিকাঃ নদ-নদীকেন্দ্রিক বা জলাশয়-নির্ভর জীবন-জীবিকা বলতেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়-জেলে বা মৎস্যজীবীদের কথা। এরপরেই আছে মাঝি। মাছ ধরার দইড় ও জাল প্রস্তুতকরণ এবং নৌ-শিল্পের সাথে পেশা হিসেবে অনেকে জড়িত। একটি মাছ ধরার দইড় তৈরি করতে একজনের পুরো একদিন সময় লাগে। যা তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ১৫০-২০০ টাকা। লভ্যাংশের প্রশ্ন তো এর পরে! বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে-দেশের অধিকাংশ দইড়শিল্পী দ্রারিদ্রের সাথে বসবাস করছে। বর্তমানে নদ-নদীতে মাছ ধরার চেয়ে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ-চাষ ব্যাপকতা লাভ করেছে। অনেকেই হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন করে থাকে।

উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাবক হলো-এই অঞ্চলের নদ-নদী। কিন্তু বর্তমানে নদ-নদীকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহের পথগুলো বিলুপ্ত হওয়ার সম্মুখীন। কারণ-মৌসুম ফুরালে নদীতে আর জল থাকে না। তাই সহসাই পেশা পরিবর্তনের খাতায় নাম লেখাচ্ছে মাছ ধরার দইড়, জাল প্রস্তুতকরণ এবং নৌ-শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবী মানুষেরা।

অথচ, প্রাচীন শ্রমশিল্পের তালিকায় এই পেশাগুলো অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলোতে এবং বাংলার পাল ও সেন বংশের লিপিমালায় উল্লেখিত নৌ-বাট, নৌ-বিতান শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়, বৃহত্তর দিনাজপুরে অন্যান্য শিল্পের মতো নৌ-নির্মাণশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাল ও সেন বংশের মতো দিনাজপুর রাজবংশের সামরিক শক্তি নৌ-বলের উপর অনেকটা নির্ভর করতো। দেখা যায়, অতীতে নদীর ধারেই গড়ে উঠতো হাট-বাজার। তাই সাধারণ লোকদের যাতায়াতের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌযানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। সাধারণত আদি পদ্ধতিতে শাল বা গজারি-কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করা হলেও বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতির সম্মিলন ঘটেছে। যেমনঃ শীট ও কাঠের সাথে ধাতব উপাদানের সংমিশ্রণ এবং প্রয়োজন-বোধে শ্যালো মেশিনের সংযোজন। এখনও নদ-নদী পারাপারের ক্ষেত্রে শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে নৌকার ব্যবহার বেশি। তাই এসব অঞ্চলে মাঝিদের দেখা এখনও মেলে। আবার উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত নদ-নদীর উপর সরকারি ও বৈদেশিক অর্থায়নে নির্মিত সেতুতে টোলের মাধ্যমে ঋণের অর্থ সংগ্রহ ও পরিশোধের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারিভাবে টোল বিভাগে বা টোলপ্লাজায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

শোলাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকাঃ লোকশিল্পের একটি অন্যতম ধারা হলো- শোলাশিল্প। শোলাশিল্প টিকে আছে মানুষের প্রয়োজনে। বিশেষ করে সনাতন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শোলাশিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমনঃ গায়ে হলুদ বা হলুদ-সন্ধ্যা লেখা, বিয়ের মুকুট, ছায়ামণ্ডপ, অন্নপ্রাসনের মুকুট, মালা, টোপর, কদম ফুল, বিষহরির শোলার মূর্তি, চাঁদমালা, কালীর মুখোশসহ বিভিন্ন পূজার সজ্জাসামগ্রী। এছাড়াও শোলা দিয়ে টিয়েপাখি, পদ্মফুল, ময়ূর, কাঁদি, গোলাপ ফুল, পেঁচা, সাধারণ টুপিসহ বিভিন্ন খেলনা তৈরি করা হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নানা অনুষ্ঠানাদিতেও শোলার ব্যবহার চোখে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শোলা দিয়ে অনুষ্ঠান-পরিচিতি, মূল দরজায় নকশাখচিত কারুকার্য করা হয়।

বৃহত্তর দিনাজপুরে প্রচুর পরিমাণে পুকুর, বিল ও জলাভূমি রয়েছে। এইসব জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে শোলাগাছ জন্মে। শোলাগাছের লম্বা ডাটির উপড়ের ছাল অংশ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুলে ভেতরের সাদা অংশকে শুকিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। এই শোলাকে কেন্দ্র করেই সমাজে টিকে আছে বহু শ্রমজীবী মানুষ।

বস্ত্র বা তাঁতশিল্প ও শূচিশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকাঃ গ্রামীণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অনন্য অধ্যায় হলো– তাঁতশিল্প। দেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই পেশায় সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি জড়িত ছিল। এদেরকে বলা হতো আশ্বিনী তাঁতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে মুসলমানরাও এই পেশায় জড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেদের কারিগর বলতে পছন্দ করে। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে চিরিরবন্দর উপজেলার রাণীবন্দরের কারিগরি পাড়া'র নামটি। রাণীরবন্দরের তাঁতশিল্প দেশ ও বিদেশে সুপ্রসিদ্ধ। রাণীরবন্দরে 'বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড' অবস্থিত।

বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই বংশগুভাবে এক শ্রেণির মানুষ থান কাপড়, শাড়ি, গামছা, ধুতি-লুঙ্গি, তোয়ালে, মশারি, গুলটেক্স চাদরসহ অন্যান্য কাপড় তৈরি করে আসছে। এদেরকে তাঁতি বলা হয়। পুরুষের পাশাপাশি বাড়ির মহিলারাও সংসারের অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে বৃহত্তর দিনাজপুরে ছোট-বড় প্রায় পাঁচন-শতাধিক তাঁতশিল্প অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দিনাজপুরে তাঁত-শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, সুদক্ষ তাঁতশিল্পী, সহজলভ্য শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সহজ শর্তে ঋণ না পাওয়া, বাজারজাতের অভাব এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সূতা-রঙ দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্প আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। বর্তমানে যে কয়টি তাঁত চালু রয়েছে, সেগুলোও চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সেগুলোও বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেকোনো সময়। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত 'দিনাজপুর টেক্টাইল মিল' (স্থাপিতঃ ১মার্চ ১৯৭৫)-এর কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ আছে।

এছাড়াও এই অঞ্চলের বহু মানুষ বস্ত্র ও গার্মেন্টস ব্যববসার সাথে জড়িত। এই ব্যবসায়িক দোকানগুলোতে থ্রি-পিচ, শাড়ি, লুঙ্গি, গেঞ্জি, প্যান্ট, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবিসহ নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন কাপড় বিক্রয় করা হয়। অনেকে কাপড়ের উপর বুটিক্স ও এমব্রয়ডারির কাজ করে থাকে। এটিও একধরনের কুটিরশিল্প। বস্তুত দেখা যায়, অনেকে কাপড়ের নকশি তৈরির কাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রঙের ব্যবসা করে থাকে। দর্জিকেও বস্ত্র-নির্ভর পেশাজীবী হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে তার ধারাটি শূচিশিল্প হিসেবেই অধিক পরিচিত।

বৃহত্তর দিনাজপুরে নারীকেন্দ্রিক অন্যতম প্রধান শ্রমশিল্প হচ্ছে-শূচিশিল্প অর্থাৎ সুই-সুতার সম্পর্ক। বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোশগল্পে গ্রামীণ নারীরা তাদের চিত্রায়িত মন ও ছবি ফুটিয়ে তোলে নিপুণ হাতের সেলাইয়ে।

নকশিকাঁথা এই শিল্পের প্রধানতম উদাহরণ। সুই-সুতা আর পুরানা কাপড়ের সমন্বয়ে এই শিল্প গড়ে উঠেছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজে। এই হাতের কাজ করে- ঘরোয়াভাবে এমনকি বাণিজ্যিক ধারায় এই অঞ্চলের বহু মানুষ জীবনযাপন করছে।

ধাতব, ইস্পাত ও প্রকৌশলশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: আধুনিক ধাতবশিল্পকে ৬টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন লৌহশিল্প, পিতল বা তাম্রশিল্প, কাঁসাশিল্প, স্বর্ণশিল্প, রৌপ্যশিল্প এবং অলঙ্কারশিল্প। লোহার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তদের কামার, পিতল-কাঁসা বা তামার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তদের কাংস্যকার বা কাঁসারু, স্বর্ণ ও রৌপ্যের জিনিস তৈরির কারিগরদের স্বর্ণকার এবং যেকোনো ধরণের ধাতুর ওপর আলঙ্কারিক বা শোভাবর্ধনের কাজের কারিগরদের নকশি বা খোদাই-শিল্পি বলা হয়।

দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী তামা, কাঁসা, পিতল, এলুমিনিয়াম ও লোহার দ্রবাদি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাক-ব্রিটিশ যুগ থেকেই উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুর- এই শিল্পগুলোর জন্য সুপরিচিত। তামা বা কাঁসা বা পিতল দিয়ে থালা, গ্লাস, বাটি, বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর মূর্তি, পঞ্চপ্রদীপসহ বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার সামগ্রী তৈরি করা হয়। অলঙ্কার ও পদক-ব্যতীত অন্য কিছু তৈরিতে স্বর্ণ খুব কমই ব্যবহৃত হয়। রুপা দিয়ে বাটি, চামুচ, পায়ের নুপুর এবং ঝালর তৈরি করা হয়।

দা, বটি, খুন্তি, কড়াই, হাসুয়া, হাতা, কাস্তে, বাসিলা, কুড়াল, শিকল, দরজার জানালার ক্লাম, লাঙ্গলের ফলা, শাবলসহ অন্যান্য লৌহজাত সামগ্রিক কামারেরা হাপরের সাহায্যে হাতুড়ি পিটা দিয়ে তৈরি করে এবং হাটে-বাজারে বিক্রি করে। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট ওয়ার্কশপগুলোতে রিকসা-ভ্যানের পাতি, ট্রাক-ভটভটির বিভিন্ন যন্ত্রসহ মাঝারি ও ভারি যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়। উত্তরবঙ্গে কোনো ইস্পাত নির্মাণশিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে ইস্পাত ব্যবসার সাথে অনেকেই জড়িত। হার্ডওয়ারের দোকানগুলোতে লৌহজাত ছোট ছোট অংশবিশেষ বিক্রয় করা হয়। এককথায় এগুলো সবই শ্রমজীবী মানুষের কাছে আয়ের অন্যতম উৎস।

বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, অটোমোবাইল সামগ্রী, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাগুলো প্রকৌশল-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে প্রকৌশলশিল্প-প্রতিষ্ঠান সেভাবে গড়ে না উঠলেও ডিলারশিপ, রিটেলার, শো-রুম বা খুচরা ব্যবসার মাধ্যমে এই বৃহত্তর অঞ্চলের মানুষ

প্রকৌশল-সামগ্রীর সঙ্গে পেশা-পরিচয়ে সম্পৃক্ত।

চামড়াশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: চামড়া-শিল্পে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় চামড়াপট্টি গড়ে উঠেছে। চামড়া-শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো- বিভিন্ন পশুর চামড়া। এই চামড়া এখানেই সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এই কাজে অনেকে জড়িত।

এরপরে আসে জুতা, ব্যাগ, বেল্টসহ চামড়াজাত অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিস। শোরুম বা দোকানঘরে এইসব সামগ্রী বিক্রি করে অনেকে অর্থ উপার্জন করছে। আবহমান বাংলার প্রাচীনতম পেশাগুলোর মধ্যে মুচি অন্তর্ভুক্ত। ছেঁড়া জুতা সেলাই করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলাই মুচির কাজ। এই অঞ্চলের মুচিরা পরিত্যক্ত টায়ারের অংশ দিয়ে একধরনের স্যান্ডেল বা জুতা তৈরি করতো, যা অক্ষয় জুতা নামে পরিচিত ছিল।

খনিজ পদার্থ, বালু ও পাথর-নির্ভর জীবন-জীবিকা: সাধারণত খনিজ পদার্থ-নির্ভর জীবন-জীবিকা বলতে কয়লা ও কঠিন শিলা আহরণ, খনিজ তেল পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল প্রস্তুতকরণ, খনিজ কয়লা হতে কোককয়লা, ন্যাপথলিন, আলকাতরা প্রস্তুতকরণ, কয়লাভিত্তিক বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডকে বুঝিয়ে থাকে।

বৃহত্তর দিনাজপুরের মধ্যে– পার্বতীপুর উপজেলার 'বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি', 'বড়পুকুরিয়া তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র' ও 'মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি' এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার 'দিঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্র' কর্মসংস্থানের অন্যতম আধার। তাই এখানে হাজার হাজার মানুষ জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে- কয়লা ও কঠিন শিলা আহরণে এবং কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত। এই বৃহত্তর অঞ্চলে বেশকিছু খনিজ তেলের পাম্প রয়েছে যেখান থেকে সড়ক পরিবহনের যানগুলো পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের পরিষেবা পেয়ে থাকে। গত দশকে দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় লৌহখনির সন্ধান মিলেছে। যা নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

করতোয়া-আত্রাই, টাঙন, পুনর্ভবা, ঢেপা, ছোট যমুনা- বিধৌত বৃহত্তর দিনাজপুরে বালু উত্তোলন একটি একটি সুপরিচিত পেশা। পঞ্চগড় থেকে সংগ্রহীত পাথর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রান্সপোর্ট করা হয়। আর এইসব কাজ সুষ্ঠুতার মুখ দেখছে একশ্রেণির দৈনিক শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে।

সেবাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: শিক্ষা, ব্যাংকিং ও বীমা, মোবাইল ব্যাংকিং, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট, চিকিৎসা, পরিবহন, বিদ্যুৎ-সেবা, বর্জ্য-নিষ্কাশনসহ প্রভৃতি কাজ সেবাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকার অন্তর্ভুক্ত।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (কারিগরি ও শিল্পকলাসহ) এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষকদের অবদান- বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ব্যাংকিং এবং বীমা সেক্টরে জড়িত থেকে অনেকে সেবা প্রদান করছে, অনেকে সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমানে আমাদের দেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে, সেই অগ্রগামিতায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট প্রধানতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এইসব সেবা প্রদান করার জন্য উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু জনবল শ্রম বিনিয়োগ করছে।

অতীতে বৈদ্য বা কবিরাজ হিসেবে চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে পেশাটির পরিচিতি পাই, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তা চিকিৎসক বা ডাক্তার। হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক বা ইউনানী চিকিৎসকদেও পাশাপাশি ফিজিশিয়ানও এই তালিকায় আসে। মূলত এই পেশাগুলোর পাশাপাশি সিকিউরিটি গার্ড কিংবা আইন শৃঙ্খলার সাথে জড়িত পেশাগুলোও সেবামূলক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জীবনযাপনে পরিবেশ ও অবকাঠামোগত পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বর্জ্য-নিষ্কাশন অন্যতম দিক। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কর্তৃক বেতনভুক্ত বেশকিছু পরিচ্ছন্নকর্মী বৃহত্তর দিনাজপুরের আনাচে-কানাচে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যাচ্ছে।

রাসায়নিক, ঔষধ ও হিমাগারশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: সাধারণত সাবান ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সার কারখানা, প্লাস্টিক কারখানাসহ সমগোত্রীয় বিভিন্ন কলকারখানাকে রাসায়নিকশিল্প হিসেবে গণনা করা হয়।
উত্তরবঙ্গে সাবান ফ্যাক্টরি, সার ও প্লাস্টিক কারখানার দেখা মেলে। এখানে গ্লাস ফ্যাক্টরিও রয়েছে। এইসব কলকারখানা বৃহত্তর দিনাজপুরবাসীর জন্য উৎকৃষ্ট কর্মক্ষেত্র। পাইকারি কিংবা খুচরা বাজারে অথবা রিটেইলার বা ডিলারশিপের মাধ্যমে অনেকেই রাসায়নিক শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করে সংসার পরিচালনা করছে। ঔষধ শিল্পকেও এই শিল্প-কাতারে ফেলা যায়। তবে বর্তমানে ফার্মেসি একটি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সেবামূলক পেশা।

বরফ তৈরির কারখানা বা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, বিভিন্নধরনের কোল্ড স্টোরেজ হিমাগার-শিল্পের মধ্যে পড়ে। বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল অর্থাৎ

পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলাজুড়ে এমন অনেক বরফকল বা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং হিমাগার রয়েছে, যেখানে কাজ করে কিংবা উৎপাদিত হিমপণ্য (আঞ্চলিক পর্যায়ে উৎপাদিত আইস্ক্রিম মূলত গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা) বিক্রি করে এই এলাকার মানুষ সাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছে।

মৃৎশিল্প, সিরামিক, টেরাকোটা, মুরাল-নির্ভর জীবন-জীবিকা: রোদে শুকিয়ে কিংবা অল্প তাপে পোড়ানো সামগ্রী মৃৎশিল্পের আওতায় আসে। মাটির প্রধান উপাদান ভেজা সিলিকেট। তাই জলীয়-ভাগ মুক্ত করে, তা দিয়ে পাত্র তৈরি করা ছিল মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক কারিগরি বিপ্লব। এই বিপ্লবের ক্ষীণ ধারা দিনাজপুরের লোকশিল্পে এখনও বহমান। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পে তিনটি ধারা সুস্পষ্ট। প্রথমত- নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র (হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, ঢাকনা, শানকি, খোলা, লোটা, ঘটি, মটকা নানা ধরনের পানভোজন ও জলপাত্রসহ প্রভৃতি), দ্বিতীয়ত- সৌখিন সামগ্রী (নকশাখচিত দীপাধার, কলমদানি, ছাইদানি, ফুলদানি, ব্যাংকসহ প্রভৃতি) এবং তৃতীয়ত মাটির পুতুল বা খেলনা সামগ্রী (বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, ছোট আকৃতির চুলা-কড়াই-খুন্তি)। এইসব মৃৎশিল্প যারা তৈরি করে, তাদেরকে কুমোর বা পাল বলে। কুমোরেরা গোলাকৃতির জিনিস বানানোর জন্যে একটি ঘুরন্ত চাকা ব্যবহার করে, যাকে চলতি কথায় 'চাক' বলে।

মাটি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্মাণ-সামগ্রী দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর আকৃতি প্রদান করে- রোদে শুকিয়ে, রং ও সাজ-সজ্জার পর্ব সম্পাদন করে যারা প্রতিমা নির্মাণ করে, তাদের প্রতিমাশিল্পী বা মালি বলা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুরে মালি হিসেবে অনেকেই জীবনযাপন করছে, যাদের নির্মাণ দক্ষতা ও কৌশল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মালিদের চেয়ে ভিন্নতর। ঐতিহাসিকভাবে এর প্রধান কারণ হলো- পুন্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্তির সংস্কৃতি।

টেরাকোটাশিল্প বৃহত্তর দিনাজপুরের সংস্কৃতির অন্যতম সুপ্রাচীন নিদর্শন। মাটি পুড়িয়ে তৈরিকৃত নিত্য ব্যবহার্য সকল সামগ্রী টেরাকোটা-পর্যায়ভুক্ত হলেও টেরাকোটাশিল্প বলতে পোড়ামাটির ভাস্কর্যকেই বোঝায়। দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির টেরাকোটা-শিল্পের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। উৎকৃষ্ট এঁটেল মাটির সঙ্গে বালি, খড়কুটো, তুষ ও ভুসি মিশিয়ে উপযুক্ত মাটি তৈরি করে মূর্তির আকার তৈরি করা হয়। এরপর এগুলোকে রোদে শুকিয়ে- আগুনে পোড়ানো হয়। অনেক সময় মূর্তিগুলোকে নানা রঙে চিত্রিত করা হয়। এই টেরাকোটা-শিল্পের সঙ্গে বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু মানুষ জড়িত।

টেরাকোটার পাশাপাশি এই অঞ্চলে মুরাল শিল্পের ব্যবহার ও প্রসার ঘটেছে। মুরাল শিল্প প্রাচীন শিল্প-মাধ্যম না হলেও সিরামিক শিল্পের এই প্রথাটির মধ্য দিয়ে মুরাল শিল্পীরা– কোনো ব্যক্তিত্ব কিংবা সমকালীন জীবন, ইতিহাস, রাজনীতি ও বিপ্লবকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে তুলে ধরছে। অপরদিকে, সিরামিক শিল্প বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খাত। প্রধানত খাওয়ার থালাবাসন, টয়লেট-সামগ্রী এবং টাইলস তৈরি করাই এই শিল্পের কাজ। এইসব শ্রমশিল্পের সাথে জড়িত থেকে বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু মানুষ দিন-দিন আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠছে।

শিল্পকলা-নির্ভর জীবন-জীবিকা: শিল্পকলা- মানবজীবনের একটি অঙ্গ। এই অঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক হলেও এটি একধরনের শ্রমশিল্প খাত। এই খাতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাথে জড়িত থেকে দেশের বহু ব্যাক্তিত্ব জীবনযাপন করছে। শিল্পকলার প্রধান শাখাগুলি হলো: দৃশ্যকলা (রংচিত্র অঙ্কন, রেখাঙ্কন, ভাস্কর্য, ছাপচিত্র, পুরাতত্ব ও মিউজিয়ামসহ প্রভৃতি), শোভাবর্ধক কলা (বস্ত্রবয়ন কলা, তন্তুকলা তাপিশ্রী, নকশিকাঁথা, সূচিশিল্প, বাটিকশিল্প, শীতলপাটি, মৃৎশিল্পসহ প্রভৃতি), ব্যবহারিক কলা (স্থাপত্যশৈলী, শিল্পজাত পণ্য নকশাকরণ, বেশভূষাশৈলী নকশাকরণ, অন্দরসজ্জাসহ প্রভৃতি), সাহিত্যকলা (গদ্য ও পদ্য), পরিবেশন কলা (সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, নাট্যকলা, মুকাভিনয় ও ভাঁড়ামি, পুতুল নাচ, কসরতবাজি, মায়াস্বর, জাদু, সচল চিত্রনির্মাণ, স্থিরচিত্রসহ প্রভৃতি)। এরমধ্যে কিছু খাত আছে যা স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে পরিচিত এবং ইতিপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে মূলত গ্রামীণ জনপদে শীতলপাটির নির্মাণশিল্প গড়ে উঠেছে। পুতুল নাচ এবং যাত্রাপালার দলগুলো এখন গ্রামকেন্দ্রিক। এরসাথে সম্পৃক্ত কতিপয় জনগোষ্ঠী এখনও ধুকে ধুকে টিকিয়ে রেখেছে এই প্রাচীন ঐতিহ্য। একটা সময় জাদু দেখানোর জন্য মঞ্চ-আয়োজন করা হতো। এখন তা দেখা যায় না। এইসব এখন অস্থায়ী, খণ্ডকালীন এবং শৌখিন পেশায় পরিণত হয়েছে।

পুরাতত্ব ও মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণে এবং সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র-শিক্ষার সাথে অনেকেই জড়িত। শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত অন্দরসজ্জা (ইন্টেরিয়র ডিজাইন), বর্তমান সময়ে পেশা হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণীয়। বর্তমানে বৃহত্তর দিনাজপুরের বহু মানুষ অন্দরসজ্জাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মিডিয়া, মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প একটি মার্জিত শ্রমশিল্প। একে শিল্পকলা খাতেও গণনা করা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং প্রেস, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি, কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স, কাগজঘর, প্রিন্টিং-এর প্লেট নির্মাণ, পত্র-পত্রিকার অফিস, ক্যাবল চ্যানেলের ব্যবসা- এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এক অর্থে সাংবাদিকতাও এই খাতে পড়ে। অনলাইনের এই যুগে অনেকে ফ্রিল্যান্সিং করেও জীবনযাপন করছে। এ-সবই মিডিয়ার সাথে জড়িত।

নির্মাণশিল্প বা দৈনিক মজুরি-নির্ভর জীবন-জীবিকা: দালানকোঠা, বাঁধ, সেতু, রাস্তাঘাট, গ্রিল তৈরি, জলের লাইনের কাজসহ প্রভৃতি নির্মাণকাজ– এই শ্রমশিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত পেশাজীবীর তালিকায় এই ধরনটি সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চসংখ্যক জনগোষ্ঠী এর সঙ্গে জড়িত।

একটি বাড়ির নির্মাণ করতে রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ইট অর্থাৎ ইটের ভাটাও এই খাতের মধ্যে পড়ে। যারা বাড়ির নিরাপত্তায় স্টিলের বা ইস্পাত রডের গ্রিল তৈরি করবে, জলের লাইনের কাজ করবে, ইলেক্ট্রিকের কাজ করবে, সৌন্দর্যবর্ধনে টাইলস্ বা টালি, থাই ও গ্লাসের কাজ করবে- তাদের সবাই নির্মাণ-শ্রমিক। এদের মধ্যে কেউ কেউ দৈনিক মজুরিভিত্তিতে, আবার কেউ কেউ চুক্তিভিত্তিতে কাজ করে। অনেকে ইট ভেঙে খোয়া তৈরি করে, কেউ কেউ দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ভারোত্তলনের কাজ করে। পূর্বেই ঘরামিদের বিষয় উল্লেখ করেছি। এরাও নির্মাণ-শ্রমিক। নির্মাণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে বৃহত্তর দিনাজপুরের তথা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের বহু শ্রম-শ্রেণির মানুষ পেশা-পরিচয়ে জড়িত।

রন্ধনশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকা: রন্ধনশিল্পকেও এই অঞ্চলের মানুষ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বেতনসূত্রে রান্না করে- তাদেরকে বাবুর্চি, যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে হাতের ছোঁয়ায় স্বাদের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে- সচরাচর তাদের পাচক বা রাঁধুনি বলে।

মিষ্টান্ন ভান্ডার- রন্ধন-শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই অঞ্চলের ঘোষ পরিবারগুলো প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন প্রকারের রসালো মিষ্টান্ন ও সন্দেশ তৈরি করে আসছে। বর্তমানে এই পেশা সর্বজনীন। বাতাসা ও কোদমা'র মতো শুকনো মিষ্টান্ন বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ঘরোয়া আয়োজনে পরিবেশিত হয়। সাধারণত রসালো ও শুকনো মিষ্টান্ন তৈরির কারিগর আলাদা হয়ে

থাকে। অনেকে ঘরোয়াভাবে কেক, ড্রাই কেক, চানাচুর, বিস্কুট, পাউরুটি তৈরি করে দোকানে দোকানে বা অনলাইনে অর্ডারের মাধ্যমে আয় করছে। পাড়ার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন ধরনের ভাজাপোড়ার দোকান এবং ঠেলাগাড়িতে পপকর্ণ, চটপটি ও ফুচকা বিক্রি করতে দেখা যায়। এগুলোও রন্ধনশিল্প-নির্ভর জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ ও বস্তু-নির্ভর বিক্ষিপ্ত জীবন-জীবিকা: মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পূজারি- সবাই জীবনযাপনের মাধ্যম হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বেছে নিয়েছে।

এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ আছে যারা মাটি, কাঠ বা স্টিলের সাহায্যে ঢোল, তবলা, হারমোনিয়ামসহ বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। অনেকে মাইক, সাউন্ড সিস্টেম ও রেকোর্ডিং-এর ব্যবসা করে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডেকোরেশন ও লাইটিং-এর দরকার হয়। এটিও ব্যবসায়িক পন্থা।

চুলকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন পেশা গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে প্রাচীনতম সেবামূলক পেশাজীবী হলো- নাপিত। সনাতন সম্প্রদায়ভুক্ত শীল বংশের লোকজন এই পেশার সাথে জড়িত হলেও বর্তমানে অন্যান্যরাও এই পেশার সঙ্গে জড়িত। নাপিত- মানুষের চুল ছাঁটানো এবং দাড়ি-গোঁফ কামানোর কাজ করে থাকে। ছাঁটা চুল বিক্রি হয়। অনেকেই তা সংগ্রহ করার কাজ করে। ছাঁটা চুল দিয়ে পরচুলা ও খোপা তৈরি করা হয়। চুলজাত পণ্য তৈরির কারখানা এই অঞ্চলে দৃষ্টিগোচর হয়।

নারিকেলের খোল দিয়ে তৈরি হুঁকা- ধূমপানের প্রাচীন কৌশলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিভৃত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আজও হুঁকা তৈরি করে ধূমপান করে। উত্তরবঙ্গে নারিকেলের পাতার শলা দিয়ে এখনও ঝাড়ু তৈরি করা হয়। এই ঝাড়ুও কদর যতটা ততটাই কদর আছে ফুল ঝাড়ুর। ফুল ঝাড়ুর মূল কাঁচামাল ঝাড়ুফুল পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপন্ন হলেও দেশব্যাপী এর চাহিদা আছে। তাই হাটে-বাজারে, বিভিন্ন দোকানে এটি সহজেই পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলবো- জীবনযুদ্ধে কর্মের কোনো শেষ নেই, কর্ম-খাতেরও কোনো শেষ নেই। তাই বেঁচে থাকার জন্য কেউ চাকরি করছে, তো কেউ করছে ব্যবসা। কারও কাছে এই ব্যবসা বারোমাসি, তো কারও কাছে মৌসুমী। কেউ কেউ মাত্র একটি পেশায় জড়িত, কেউ-বা বহু পেশায়। আবার কারও কাছে পেশা শৌখিনও হয়। ইতিহাস সাক্ষী, প্রয়োজনের নিমিত্তে সময়চক্রে

পেশার পোশাকে নানা পরিবর্তন এসেছে, আরও পরিবর্তন আসবে। বলা-বাহুল্য, উত্তরবঙ্গ তথা বৃহত্তর দিনাজপুরের জনজীবনে- উল্লেখিত জীবন-জীবিকার সবধরনের রসদই খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. গরিবের সংখ্যা বাড়ছে উত্তরের পাঁচ জেলায়- জাহাঙ্গীর শাহ; প্রথম আলো, ৩০ মে ২০১৮
২. দারিদ্র কমেছে রংপুর বিভাগে, শীর্ষে বরিশাল- আহসান হাবীব, রবিউল কমল; দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ২৭ জুন ২০২৩
৩. প্রাগুক্ত, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ২৭ জুন ২০২৩

সহায়ক-গ্রন্থ:

১. বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: দিনাজপুর-শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি; জুন ২০১৪
২. ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস- অজয় কুমার রায়; টাঙন, ঢাকা, আগস্ট ২০১৮
৩. উত্তর দিনাজপুর চর্চা- মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত; নন্দিতা, কলকাতা, ২০১৩
৪. উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও পুরাকীর্তি- ড. সমিত ঘোষ; অমর ভারতী, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯

উত্তরে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা

সাঈদ সাহেদুল ইসলাম

'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাই কেহ পর।'

বন্দে আলী মিয়ার এমন উপলব্ধি প্রমাণ করে গেঁয়েরা সবাইকে আপন ভেবে থাকে। আর সে গেঁয়েজীবনের মানুষ মানে অধিকাংশই পেশায় কৃষক, শ্রমিক, মজুর, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, ফেরিওয়ালা তাছাড়া অনেকে রয়েছে যারা হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপাতি তৈরি করে সেসব বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব মানুষের জীবনপ্রবাহ কষ্টের মাধ্যমে ভিন্ন। তারা সমাজে অনেকভাবেই বঞ্চিত।

গ্রামে যারা কৃষির সাথে জড়িত তারা রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে ফসল ফলায়। তারা সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে কিন্তু অনেক সময় তারা অভুক্ত থাকে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অনেক কৃষক বিশেষ করে যাদের জমিজিরাত কম বা নেই তাদের কষ্ট বেশি। কৃষিকাজে তাদের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য তারা পায় না। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সময় তারা মধ্যস্বত্তভোগীদের খপ্পরে পড়ে বেশিরভাগ সময় তাদের কৃষিপণ্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

শ্রমিক, মজুরগণ অন্যের কাজ করার মাধ্যমে রোজগার করে দিন এনে দিন খায়। সারাদিন পরিশ্রমের পর একজন শ্রমিক বা মজুর পারিশ্রমিক পায় পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা। তা দিয়ে চাল, ডাল, ওষুধপাতি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হয় একেকজন শ্রমিক বা মজুরকে। গ্রামজীবনের এসব নিরক্ষর শ্রমিক-মজুর অনেকেই সচেতন নয়। তাই তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও বেশি। বিভিন্ন উৎসব অর্থাৎ ঈদ বা পূজায় তাদের বাসায় আত্মীয়স্বজন এলে তার সমাধানে সমস্যায় পড়তে হয় তাদেরকে। উৎসবের দিন থেকে পরবর্তী কয়েকদিন কাজকর্ম করতে না পারার কারণে ধার দেনায় চলতে হয় তাদের। আরো বেশি খারাপ ব্যাপার এটাই যে, তারা গরিব হওয়ার কারণে তাদেরকে সহজে কেউ ধারও দিতে চায় না।

সরকার যে বয়স্কভাতার ব্যবস্থা করেছে তার জন্য তাদের বয়স হতে হয় ষাট বছর। এ ক্ষেত্রে অনেকের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এভাবে যে ভোটার আইডি কার্ড করার সময় তাদের মতো অসচেতন অনেকেই তাদের সঠিক বয়স বলতে পারেনি। তাই তাদের বয়সের হেরফের রয়েছে। তাছাড়া নিরক্ষর

হওয়ায় তারা কখনো এটাও মনে করেনি যে তাদের বয়স কম হওয়ার কারণে তাদের এত অসুবিধায় পড়তে হবে বা ভাতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

লোক মুখে এমনো শোনা যায়, ছেলে বয়স্কভাতা পেলেও তার পিতার এখনো বয়স্কভাতা পাওয়ার বয়স হয়নি। কথাটা কেমন হাস্যকর শোনা গেলেও বা মিথ্যে হলেও বিষয়টি স্পষ্ট যে, একই গ্রামে বা পরিবারে বসবাসকারী বয়সে ছোটগণ তাদের চেয়ে বেশি বয়স্কদের আগে বয়স্কভাতা পাওয়ার হকদার হয়েছেন জন্ম তারিখ সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে। জন্ম তারিখ এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় বলে এমন অনেকেই এখনো সরকারের দেওয়া এই আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

কামার, কুমার, তাঁতী এবং হস্ত ও কুটির শিল্পের অনেকেই যে পরিশ্রম করে, তার তুলনায় তাদের আয় কম। তবু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে লালন করতে এসব পেশায় এখনও যুক্ত থেকে তাদের অতীতকে সম্মান দিয়ে আসছে।

জেলে সম্প্রদায়ের সংখ্যা স্থানগত কারণে কম বা বেশি হলেও তারা সমাজের অংশ। বিশেষ করে নদীবাহিত এলাকায় জেলেদের সংখ্যা বেশি। তারা ইচ্ছে করলেও তাদের পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ চারদিকে যখন পানি আর পানি তখন জেলেরা নদীতে মাছ ধরা ব্যতীত কোথাও কাজের জন্য কোনো সুযোগ পায় না। কেউ কাজের জন্য নিজ জেলার বাইরে গেলেও মূলত তারা শ্রমিক, মজুরের কাজ করে থাকে কোনো কোনো মৌসুমে। তা নিয়ে গ্রামে ফিরলে আবারও আগের দৈন্য অবস্থায় জীবন চলে তাদের।

গ্রাম পেশাজীবীদের মধ্যে ফেরিওয়ালার সংখ্যাও কম নয়। অনেকেই বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ঘাড়ে বা ভ্যানে নিয়ে কিংবা বাইসাইকেলে নিয়ে বিক্রয় করে থাকে। কেউ ছোটদের খেলনাপাতি বিক্রয় করে। সেদিন একজন খেলনা বিক্রেতাকে চোখে পড়ল। বয়স্ক মানুষ। বাঁশের কঞ্চিতে ছোটদের খেলনাপাতি বেঁধে ঘাড়ে নিয়ে সেসব খেলনা বিক্রয় করছে। তার সাথে কথা বললে সে জানায় মাত্র দুশো টাকার খেলনা নিয়ে বেরিয়েছে সে। ভাবা যায়! দুশো টাকার খেলনা বিক্রি করে কত টাকা লাভ করবে সে? ধরে নিই, সে তার সব খেলনা বিক্রি করতে পারল। তার সাথে থাকা সমস্ত খেলনা কিনতে চাইলে তাকে কত দিতে হবে? তার কাছ থেকে হিসেব নিয়ে জানতে পারলাম, তার চাহিদা দুশো ষাট থেকে দুশো আশি টাকা। কী বিচিত্র জীবন তার! সে তার সমস্ত খেলনা বিক্রি করে সারাদিন হেঁটে পরিশ্রম মাত্র ষাট থেকে আশি টাকা পেলে তা দিয়ে কী কিনবে সে? তার চেয়ে বড় কথা, তার

সমস্ত খেলনা বিক্রি হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। শুধু সে নয়, এমন স্বল্প আয়ের মানুষের সংখ্যা গ্রামে অনেক। তবু তারা স্বল্পে তুষ্ট থেকে নামমাত্র বেঁচে থাকে।

হাজার বছরের সেরা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় তাঁর বক্তব্যে বলেন 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।'

কিংবা 'এদেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' (১০ জানুয়ারি ১৯৭২)। অথবা 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়।' আবার 'সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।' বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন আমাদের জন্য গ্রাম পেশাজীবীদের ত্যাগ অনেক। তারাই আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে কাজ করে। তাদের উন্নয়ন মানে দেশ ও জাতির উন্নয়ন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাক মানুষের- সাথে তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বদরগঞ্জে বিলুপ্ত প্রায় যুগী

আশরাফুজ্জামান বাবু

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী জনপদ বদরগঞ্জ। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বদরগঞ্জ পৌরসভা। পৌরশহর থেকে পার্বতীপুরমুখী সড়ক ধরে এক কিলোমিটার গেলেই পৌরশহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত যুগীপাড়া মহল্লা। অন্তত দশ বা পনেরো বছর আগেও শতবর্ষী এ মহল্লার প্রায় সবারই পেশা ছিল শামুক থেকে চুন বানিয়ে বিক্রয় করা। আর সে কারণেই 'যুগীপাড়া' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল মহল্লাটি। কিন্তু বর্তমানে বদরগঞ্জে সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা প্রায় শূণ্যের কোটায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পান সুপারি। বিয়ে-শাদিসহ যে কোন খানাপিনায় পান সুপারি পরিবেশন অপরিহার্য উপাদান। পান খেয়ে মুখ লাল করতে এবং পান সুপারির ঝাল এবং কষ্টা ভাবটা দূর করে একে মুখরোচক করতে যে উপাদানটি কার্যকর ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে ঝিনুকের চুন। এই চুন ছাড়া পান খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। খাল, বিল, নদী থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে, নানা পদ্ধতিতে যারা চুন তৈরি করে তারা যুগী বা চুনারু নামে পরিচিত। এ কারণে পান খাওয়ার এই ঝিনুক চুনকে যুগীর চুনও বলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিপয় যুগী পরিবার এখনও রংপুরের বদরগঞ্জ পৌরশহরের যুগীপাড়ায় তাদের আদি পেশাকে আঁকড়ে ধরে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।

৩ এপ্রিল ২০২৪, বুধবার দুপুরে যুগীপাড়ায় সরেজমিনে জানতে পারি, বর্তমানে যুগীপাড়ায় ঝিনুক থেকে চুন বানানো পেশার সঙ্গে নিয়মিতভাবে সক্রিয় আছেন মাত্র দু'জন। আর অনিয়মিতভাবে জড়িত আছেন দু'জন। সক্রিয় দু'জন হলেন বিপিন দেবনাথ ও বিষেদু। অনিয়মিত দু'জন হলেন অজিন ও খগেন। বিপিন ও বিষেদু বদরগঞ্জ পৌরসভার শহরে শামুকের চুন বিক্রয় করেন। অপর দুজন বদরগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নের বিভিন্ন পাড়ায় বা গ্রামে ঘুরে চুন বিক্রয় করেন মাঝে মধ্যে।

যুগীপাড়ার সবচেয়ে প্রবীণ যুগী বিপিন চন্দ্র দেবনাথ। এখন তার বয়স নব্বই ছুঁইছুঁই। তিনি জানান, তার বাবা টাটি দেবনাথ ও মা ধনেশ্বরী এ কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাদের দেখে দেখে বিপিনও এ কাজ রপ্ত করেছেন। স্বাধীনতার পর পরই তার বাবা-মা লোকান্তরিত হলে হাল ধরেন বিপিন। স্ত্রী চেকো বালা (৭৭) বিপিনের এ কাজের বিশ্বস্ত সঙ্গী ও সহযোগী।

বিপিন ও চেকো বালা'র পাঁচ সন্তান। বিয়ে হওয়ায় স্বামীর বাড়ি চলে গেছে তিন মেয়ে। আর দুই ছেলে বাতাত ও বাচ্চু। এ পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাইলে বিপিন দেবনাথ বলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার থেকে এ পেশার সঙ্গে কেউ জড়িত থাকবে কিনা জানি না। কারণ, আমার ছেলে মেয়েরা কেউ এ কাজ রপ্ত করতে পারেনি। শুধু ছোট ছেলেটা একটু একটু শিখেছে।

বিপিন দেবনাথের বড় ছেলে বাতাত দেবনাথ বলেন, আমি এ কাজ একদমই করতে পানি না। আমার ছোট ভাই বাচ্চু একটু একটু করতে পারে। 'এই কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ নেই কেন?' জানতে চাইলে বাতাত বলেন, এ ব্যবসায় এখন সন্তোষজনক লাভ নেই। শামুক পাওয়া যাচ্ছে না। চড়া দামে কিনতে হয় বাইরে থেকে। খড়িসহ আনুষাঙ্গিক সব খরচ মিলে একদমই লাভ নেই।

বদরগঞ্জ পৌরশহরে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। সোম ও বৃহস্পতিবার। এই দু'দিন বিপিন দেবনাথ পৌরশহরের পানবাজারে বিক্রি করে নিজের হাতের তৈরি ঝিনুকের চুন। তিনি বলেন, 'আমি যতদিন আছি, কাজটা করে যাবো। আমার পরে আর কে করবে, আমি জানি না...'।

মিঠাপুকুরের ওঁরাও সম্প্রদায়

কামরুজ্জামান দিশারি

গায়ের রং কালো, নাক অনুন্নত ও কিছুটা থ্যাবড়া, চুল কালো ও ঢেউ খেলানো, উচ্চতা মাঝারি। বিশেষ চেহারার এই পুরুষদের বনে-জঙ্গলে চিওয়ার বা তির ধনুক হাতে খরগোশ, বনবিড়াল, মেছোবাঘ বা খেকশিয়াল শিকার করতে দেখতাম। অথবা তির ধনুক তাক করে কচ্ছপ বা শাল, গজার মাছ শিকারের নেশায় নদী তীরে নিবিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখতাম। দেখতাম ইঁদুরের গর্তে বিশেষ পদ্ধতিতে কাঠি ঢুকিয়ে অথবা জমির আইল কেটে মাটিয়া কইতর বা ইঁদুর শিকার করতে।

অনুরূপ চেহারার কিছু মহিলাকে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে হাতে বাঁশের টুকরি সহযোগে গ্রামের বিল, জলাশয় ও বন-জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া, শামুক, কুচে ও বিষ আলু সংগ্রহ করে ফিরে যেতে দেখতাম নিজের বাসস্থানের দিকে। আমরা জানতাম এরা সাঁওতাল। আমরা মানে সাধারণ জনগণ। বলছিলাম, অজ্ঞতাবশত সাঁওতাল নামে ডাকা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নাম ওঁরাও। যাদের বাসস্থান মুলত বরেন্দ্র অঞ্চলে। এই নৃগোষ্ঠীর লোকেদের আদি বাসস্থান ভারত ছেড়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে।

জানা যায়, ওঁরাওরা ভারতের কর্ণাটক রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ভারতের ছোট নাগপুর, ঝাড়খন্ড, রাঁচি, রাজমহল ও শিলিগুড়ি এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বরেন্দ্র নামক এলাকায় বসতি স্থাপন করে অদ্যাবধি বসবাস করে আসছে। মুঘল শাসনামলে তারা বরেন্দ্র অঞ্চলে খাজনা না দিয়ে জমি-জমার পত্তন নেবার শর্তে বাংলায় প্রবেশ করে। পরে বন-জঙ্গল কেটে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে তাদেরকে লাগানো হয়। ব্রিটিশ আমলের শুরুতে মাটিকাটার কাজ ও রেললাইন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে তাদের ব্যবহার করা হয়। এখানে আসা ওঁরাওরা কাজ শেষে ভারতে ফিরে না গিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলেই স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন।

বাংলাদেশে ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা লক্ষাধিক। বর্তমানে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, গাজীপুর, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় এদের বসবাস। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, চলাফেরা প্রভৃতির ওপর বাঙালি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ওঁরাও জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বাস করে সমতল বরেন্দ্র ভূমিতে। তাদের আদিভাষার নাম 'কুরুখ'। তবে জনসংখ্যার কিছু অংশ 'সাদরি' ভাষায় কথা বলে। বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও কুরুখ ভাষার একটি মিশ্ররূপ এই 'সাদরি' ভাষা। তাদের নিজস্ব কথ্য ভাষা লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ।

তাদের রয়েছে কৃষ্টি-কালচার, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বাড়িঘর তৈরির নিজস্ব কৌশল, ধর্ম বিশ্বাস, প্রথা, নিজস্ব ধারার নাচ-গান, সামাজিক আইন ব্যবস্থা, তন্ত্র-মন্ত্র, আদি কাহিনি, নিজস্ব সংস্কৃতি ইত্যাদি।

আদিতে এরা ছিল সম্পূর্ণ বনচারী। বর্তমানে কৃষিজীবী। হালচাষের মূল কাজটি পুরুষেরা করে। মেয়েরা শস্য রোপণ, কাটা, ছাড়াই ও গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ করে। নিজেদের জমিতে শ্রম দেয়া ছাড়াও অন্যের জমিতে দিনমজুরির কাজ করে। তবে বর্তমানে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করছে। কেউ কেউ নানা ব্যবসার সংগে জড়িত। সময়ের পরিক্রমায় জীবন-জীবিকার তাগিদে ওঁরাওদের অনেকে নানা ধরণের পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন- ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শুকরের পাল লালন-পালন করে, কুচে চাষ বা কিনে নিয়ে এসে পাড়া-মহল্লায় বিক্রি, । ভ্যান বা অটোরিকশা চালাক, পশু প্রজনন, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রি, আবার গ্রুপ বা দলবলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা বাদ্যযন্ত্রের বাজনদার হিসেবেও মৌসুমী কাজ করে থাকে।

ওঁরাওরা বিভিন্ন গোত্রের বিভক্ত যেমনঃ লাকড়া, তিগগ্যা, তিরকী, বাড়ো বা বাড়োয়া, খাঁ খাঁ, কেরকেটা, টপ্য, এক্কা, খালকো, লিন্ডা, মিনজী, বাকলা, বাড়া, ক্ষেস, পান্না, বেক ও কিসপট্টা। একই গোত্রের সদস্যকে ওঁরাওরা একই বংশের সন্তান বলে মনে করে। ফলে তাদের একই গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ওঁরাও সমাজের বিবাহ পদ্ধতির সবটাই লোকাচার ও দেশাচার নির্ভর। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে এক থেকে তিন মাস সময় লাগে।

ওঁরাও সমাজে বর্তমানে দুধরনের বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ১. চুক্তিবিবাহ, ২. প্রেমঘটিত বিবাহ। তবে অধিকাংশ বিবাহ সম্পন্ন হয় চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতিতে। সাধারণত অল্প বয়সেই তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিধবা নারীদের বিবাহের প্রচলন আছে। সুনির্দিষ্ট কারণে সমঝোতার ভিত্তিতে ওঁরাও সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার বিধানও রয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের মানুষ খুবই পরিশ্রমী, একতাবদ্ধ ও সৎ জীবনযাপনকারী। ঐতিহ্যগতভাবে তারা বেশ উৎসবমুখর ও বিনয়ী স্বভাবের। কৃষিজীবি ওঁরাওরা

ছয় ঋতুর বিচিত্র রূপকে আবাহন করে নৃত্য ও গানের মধ্য দিয়ে। এরা ধান চাষকে সামনে রেখে ‘গছরপণ’ নামক পূজা করে। এছাড়া ‘সারহুল’ নামক পূজা-উৎসব করে ভূমির উর্বরতার জন্য।

এ সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক সহজ সরল। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমায় অনেক পিছিয়ে। ১৯২০ বা ১৯৩০ খ্রি. আগে পর্যন্ত তারা শিক্ষা বিমুখই ছিল। মূলত আশির দশকের পর থেকে এদের জীবনে আমুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে। এখন তাদের সন্তানেরা স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও বিরাট ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারগুলো পিতৃপ্রধান হলেও ওঁরাও সমাজে পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি পরিশ্রমী।

চাষাবাদের জন্য তাদের নিজস্ব জমির পরিমাণ কম হলেও ভূমিহীন নয়। ফলে তারা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের জমি ‘আদি’ বা বর্গা নেয়। মহিলারা দিনমজুর হিসেবে মাঠে ও ক্ষেতে-খামারে কাজ করে। পুরুষরা শিকারে বের হয় অথবা ‘পচানি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ নামক মদ পান করে বিভোর হয়ে গৃহের অভ্যন্তরে পড়ে থাকে। পুরুষরা মাঠে কাজ না করার ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত আছে। সেটি হলো- বিবাহের দিন বা তার আগের কোনো এক রাতে পাত্র কনেসহ সবার সামনে ঘরের চালে উঠে পড়ে। সে চালের উপর বসে নতুন কনের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে- ‘মুই চালের উপর থাকি গড়িয়া পড়িয়া মরিয়া যাইম, তুই যদি মোক কাম করিয়া না খিলাইস (খাওয়ানো)’! নিচে মাটিতে দাঁড়ানো কনে তখন বলে ওঠে- ‘গড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেইলে মোর কী হইবে? তুই নিচে নামিয়া আয়, মতই তোক কাম করিয়া খিলাইম (খাওয়াব)’। কন্যা রাজি হলেই বর নিচে নেমে আসে। যদিও লোকমুখে প্রচলিত এই রীতির কোনো প্রমাণ মেলে না এবং এ বিষয়টি তাদের ‘ট্যাবু’ কিনা তাও বিবেচ্য!

এদের পোশাক অত্যন্ত সাদাসিধা। মেয়েরা মোটা শাড়ি পড়ে। আগে মেয়েরা শরীরের কোনো অন্তর্বাস পরত না। বর্তমানে বাঙালি মেয়েদের মতই শাড়ির সাথে ব্লাউজ পেটিকোট পরে। পুরুষরাও লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, ধুতি ইত্যাদি পরে। শিক্ষিত ওঁরাও ছেলেরা শার্ট-প্যান্ট এবং মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি পরিধান করে। তবে মেয়েরা সাজগোজ পছন্দ করে। ফুল এদের প্রধান অলঙ্কার। ওঁরাওদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো- পুরুষদের ‘ন্যাঙটি’ আর নারীদের ‘ফতা’ অর্থাৎ গায়ের উপরে নীচে দু-খন্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র থাকে। নারীরা বিভিন্ন অলংকার যেমন- নাকফুল (কারমা শিকড়ি), গায়ে পায়রা, পায়ের নখে

মুদদী, চুলের খোঁপায় রূপার কাঁটা (খংশ) পরিধান করে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে ওঁরাওরা একেশ্বরবাদী হলেও তাদের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে। জনজীবনের সুখ চেয়ে তারা তাদের ইশ্বর 'ধার্মেশে'র কাছে প্রার্থনা করে। তাদের মতে, এ 'ধার্মেশ'ই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সূর্যে অবস্থান করেন। ওঁরাও সমাজ সূর্যকেও দেবতা হিসেবে জ্ঞান করে। সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পূজা করে এবং 'ডানডা কাঁটনা' উৎসবের আয়োজন করে।

মৃত পূর্বপুরুষদের শক্তিসহ ওঁরাওরা 'নাদ' বা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী। অনেক ওঁরাও হিন্দুধর্মে প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীর পূজাও করে। শিব, পার্বতী, রাম, সীতার বন্দনা গেয়ে 'টানা' পূজা করে। টানা পূজা, টানা ধর্ম থেকে করা হয়। এই ধর্ম মুখে মুখে প্রচলিত। গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তারা নিজ নিজ উপাসনালয়ে প্রার্থনা করে।

চাঁদের তিথি অনুসারে ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠেয় ভাদাই বা ডালপূজা ওঁরাওদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পাহান-মুন্ডারের মতো প্রায় একই নিয়মে ওঁরাওরা ডালপূজা করে। পাড়ার সকলে মিলে বারোয়ারি পূজার মতো করে এই পূজা দেয়। প্রথমে খেলা'তে অর্থাৎ বহিরাঙ্গনে একটা 'থান' বা বেদী তৈরি করা হয়। একজন অবিবাহিত যুবক পাতাসহ খেল-কদম্বের ডাল কেটে আনে। সেই ডাল বেদীতে পোতা হয়। পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি এই পূজা করেন। সন্ধ্যার কিছু পরেই এই পূজা শুরু হয়। তিনটি ডালায় করে ধুপ, সিঁদূর, খাগড়াই, বাতাসা, বড়া, শশা, কলা, রক্তহলা, থানের পাতা, ধান, মাসকলাই, যব, নদীর বালি এসব এনে তিন ব্যক্তি ডালের গোড়ায় উৎসর্গ করে। যারা উৎসর্গ করবে তাদের উপবাস থাকতে হয়। তারা আষাড়ি পূজায় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অনেক নাচ গান করে পাঠা বলি দেয়।

সীমাহীন দারিদ্র্য আজ বাসা বেঁধেছে ওঁরাও সমাজে। ফলে তারা অভাবের তাড়নায় টিকিয়ে রাখতে পারছেন না পূর্বপুরুষদের আদি সনাতন ধর্মবিশ্বাসটিকে। নানা কারণে ধর্ম পরিবর্তন করে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ক্ষত্রীয় ও টানা ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। গোটা গ্রামে চলছে ধর্মান্তরের টানা পোড়েন। যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন তারা চান বাকিরাও এ ধর্মে দীক্ষিত হোক। খ্রিস্টান ওঁরাওরা চান সবাই খ্রিস্ট ধর্ম লাভ করুক। ধর্মান্তরিত ওঁরাও পরিবারে এসেছে স্বচ্ছলতা। স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও শিশুরা পাচ্ছে মিশনারি স্কুলে পড়ার সুযোগ। আর বাকি পরিবারগুলো এখনও বিপন্ন।

ওঁরাওরা জাদুশক্তিতে বিশ্বাস করে। এদের নানা ধরনের পূজার মধ্যে

সবচে বড় ভাদ্রমাসে ভাদাই বা কারাম পূজা। চৈত্র মাসে 'সারহুল' পূজা কৃষিকে সামনে রেখে করা হয়। 'সেন্দরা' বা পুষনা তাদের ঐতিহ্যবাহী একটি অনুষ্ঠান। বন-জঙ্গল ঘুরে মাছ, পশু বা অন্য যে কোনো খাদ্য সংগ্রহ করে সে সব দিয়ে পাড়া বা গ্রামের সবাই মিলে এ অনুষ্ঠানের করা হতো। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি তেমন পালন করা হয় না।

ভাত ওঁরাওদের প্রিয় খাদ্য। বনের পশু-পাখি, ফলমূল ভক্ষণ করে। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের মাছ, শালুক ও জলজ উদ্ভিদ তাদের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। ছাগল, মহিষ, ভেড়া, শূকর, হাস-মুরগি, খরগোস, গুঁইসাপ, বেজি, নেউল, সজারু, কাঠবিড়ালি প্রভৃতির মাংস এবং কচ্ছপ, বাইম, কুচে, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক, 'গিঠি' বা জংলী আলুসহ তাদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ডিম।

ওঁরাও সমাজে অতিথি আপ্যায়ন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে নেশাদ্রব্য 'আরখি' বা চুয়ানি 'বর এ' বা হাড়িয়া পান করা একটি ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস। বয়স্করা তামুক বা 'খইনি' খেয়ে থাকে। 'বিচ্চিলারাং' নামক এক ধরনের ভেষজ হাড়িয়া তৈরির মুল উপাদান।

ওঁরাওদের গৃহের দেয়াল সাধারণত মাটির এবং ছাউনি শন ও খড়ের। তাদের অধিকাংশ ঘরের প্রবেশদ্বারের আকৃতিতে খুবই ছোট। মাথা উঁচু করে খুব কম ঘরেই প্রবেশ করা যায়। ঘরগুলি অধিকাংশই চারচালা বিশিষ্ট। চারচালা ঘরের চারপাশে থাকে বারান্দা। গৃহগুলি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গৃহের দেয়াল লেপা-মোছা এবং কোনো কোনো দেয়ালের নিম্নাংশ রঙিন করা হয়। অনেক দেয়ালে অংকন করা হয় গাছ, লতা-পাতা, ফুল, পাখি ইত্যাদি। অঙ্কিত এসব ছবিতে নানা রঙের সমারোহও পরিলক্ষিত হয়।

ওঁরাও সমাজের মানুষ আদিকাল থেকেই যে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষের জমি কিনতে পারে। তবে অন্য ধর্ম বা সস্প্রদায়ের মানুষ বা বাঙালিরা তাদের জমি কিনতে গেলে 'জেলা প্রশাসন' অফিস থেকে অনুমতিপত্র নিতে হয়। তাদের সমাজে সম্পত্তিতে পৈত্রিক উত্তরাধিকার স্বীকৃত। উত্তরাধিকারী না হলে অন্য সমাজের মতো পোষ্যরা সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারে না। পোষ্যকে সাদরি ভাষায় 'ধোক্কর বেটা' বলে। সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক এক মামলার শুনানিতে সহজ সরল ওঁরাও এর জবানবন্দি এরকম- জনৈক এসি ল্যান্ড মহোদয়, 'ধোক্কর বেটা' বুঝতে অক্ষম হলে বিবাদী ওঁরাও বললেন- মোনে করো, তোমার জোন্ম না হইতেই তোমার বাপ মরি গেইল। তোমার মাও চেংরি মানুস। তাক তো বিয়াও বোসা নাগবে! তোমাক হাতত

করি ধরি আসি মোর গোরত বিয়াও বসিল। তাইলে তোরা মোর বেটা হইনেন না! এটাই হইলো ধোক্কর বেটা। পাগলা আরো বোঝে না'।

এরা যে কত সহজ- সরল তা এই জবানবন্দি থেকে বোঝা যায়।

ওঁরাওদের সংসারে নতুন শিশুর জন্ম মানেই আনন্দ উৎসব। গর্ভবতী নারীর ওঠা-বসা, চলাফেরা লক্ষ্য করেই গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা বলতে পারে। প্রসবের সময় হলে ঘরের কোণে দরজার আড়ালে গর্ভবতীকে রাখা হয়। সেখানে একজন 'কুশরাইন' বা ধাত্রী থাকে তাকে সাহায্য করার জন্য আর একজন বয়স্ক মহিলাও থাকে। ঘরের দরজা ও জানালায় কাঁটা দিয়ে রাখা হয়। ওঁরাওদের ভয় 'চোরা চুন্নি' নামের ভূত কালো বিড়ালের রূপে এসে প্রসূতির রক্ত খাবে আর নবজাতকের 'কুড্ডা' বা নাড়ি চুষবে। শিশুটি জন্ম নেওয়ার পরই কুশরাইন শিশুর ৪/৫ আঙুল দূরত্বে তামার পয়সার ওপর কুড্ডা রেখে 'ঝিকটি' বা বাঁশের চলা দিয়ে নাড়ি কাটে। অবশ্য আজকাল অনেকেই ব্লেড বা ছুরি ব্যবহার করে। কুড্ডার ঘা শুকানোর জন্য তারা বাঁশের নিলি বের করে কুড্ডায় লাগায়। আর ভাঙা কুলায় 'তাপ্পা' বা 'ফুল' রাখে। পরে মাটির নিচে পুঁতে রেখে ওপরে আগুন জ্বালায়। শিশুটিকে বাসি পানি দিয়ে স্নান করিয়ে কাঁচা হলুদ বাটা ও সরিষার তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর মাথার কাছে লোহার কোনো জিনিস রেখে দেওয়া হয়, যেন তার কাছে কোনো 'চুন্নি' আসতে না পারে। প্রসূতির হাতেও লোহা দেওয়া হয়। কয়েক দিন পর শিশুর 'কুড্ডা' শুকিয়ে পড়ে গেলে তা গোপনে ঘরের দরজায় পুঁতে রাখা হয় নিঃসন্তান স্ত্রীর চুরির ভয়ে।

শিশুর জন্মের দিন অনুসারে তার নাম রাখা প্রচলিত। যেমন- বুধবার জন্ম হলে নাম হয়ে যায় বুধু। শুক্রবার জন্ম হলে নাম হয় শুকরা, বৃহস্পতিবার জন্ম হলে নাম হয় বিরশা বা বিরশী। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুর দাদা-দাদি ও নানা-নানি এবং কাছের আত্মীয়রা বসে নাম ঠিক করেন। প্রসূতি তাদের সামনে 'ডুবহা', একটি চান্দির টাকা এবং বীজের জন্য রাখা ধানের এক মুষ্টি ধান, দূর্বাঘাস, হলুদ 'দোনা'তে করে এনে রাখে। তারপর নানা নিয়মের মধ্যে শিশুর নামকরণ হয়। নামকরণ হলে যে ব্যক্তির নামের সঙ্গে শিশুর নামের মিল হয়েছে, তিনিই প্রথম দিন শিশুর কোমরে 'কারধানী' বা 'শিকাই' বেঁধে আশীর্বাদ করে দেন। পরে সবাই সাধ্যমতো অর্থ, থালা, বাটি, জগ, মগ, গরু, ছাগল, কাপড়, জামা ইত্যাদি দান করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী হাঁড়িয়া, মাংস, ভাত ইত্যাদির আয়োজন থাকে।

মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তারা 'পাচোয়া আলার' বলে। 'পাচোয়া আলার'দের

মাধ্যমে তারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন পূজা-পার্বণে তাদের আহ্বান করে এবং পূজাতে ভোগ উৎসর্গ করে। ভাত খাবার সময় ভাত, হাঁড়িয়া পানের সময় হাঁড়িয়ার জল 'পাচোয়া আলার'দের নামে কয়েক ফোঁটা মাটিতে রাখে। ওঁরাওরা দুই ধরনের মৃত্যু বোঝে। যেমন- স্বাভাবিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যুতে মৃতদেহকে 'মাশাড়া'য় কবর দেয় অথবা শ্মশানে দাহ করে। তবে একই মাশাড়ায় কবর দেয় না বা একই শ্মশানে দাহ করে না। পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। তবে বর্তমানে শিক্ষিত ওঁরাওরা অনেকেই আগের বিশ্বাস ত্যাগ করে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিকে সমমর্যাদায় সৎকার করে।

ওঁরাও সমাজে কবর ও দাহ দুই প্রথাই চালু আছে। সাধারণত আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চার মাসের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। বাকি আট মাসের মৃতদেহ দাহ করা হয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি বিবাহিত হয় তবে তার দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়। অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে নয়। মৃতদেহকে স্নান করিয়ে হলুদ মাখানো হয়। নতুন এক খণ্ড মার্কিন কাপড় পরিয়ে আরেক খণ্ড দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর শেষবারের মতো মুখের কাপড় সরিয়ে দেওয়া হয় মুখ দেখবার জন্য। প্রথমে পরিবারের আপনজন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীগণ সঙ্গে আনা খিচুড়ি ও জল তিনবার মুখে ঠেকায়। পরকালের রাস্তায় খাবার জন্য তামাক, পান-বিড়ি ও ভব নদীর ঘাট পেরোবার জন্য মৃতের মাথার কাছে টাকা রেখে দেয়। চিতার আগুনে ভস্মীভূত করে মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও শেষকৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ফুল ও পাতার নৈবেদ্য প্রদানের প্রথাও প্রচলিত। কারো মৃত্যু হলে মৃতের গায়ে থাকা পুরাতন কাপড়ের উপর নতুন কাপড় পরানো হয় এবং মাটিচাপা দিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। অবশ্য পোড়ানো রীতিও প্রচলিত। শোক প্রকাশের রীতিও সমাজে রয়েছে।

ওঁরাও সমাজে নৃত্য ও সঙ্গীত একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের বিয়েতে ঢোলের তালে তালে অনেক নাচ-গান করা হয়। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে। এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, মাদক, বাঁশি, তাল, নাগরা, খঞ্জনী, ঘুটুর ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিককালে ওঁরাওরা হারমোনিয়াম ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

ওঁরাওরা বিশ্বাস করে কোনো নারী বা পুরুষ যদি উল্কিবিহীন মারা যায় তবে যমরাজা তাকে মানবরূপে গ্রহণ করে না। ফলে অনন্তকাল তাকে নরকে পড়ে থাকতে হয়। আর এ কারণেই ওঁরাও সমাজে মৃত্যুর পরে দাহ করার আগে মৃতের শরীরে উল্কি এঁকে দেওয়া নিয়ম। কিন্তু ওঁরাওদের এই আদি

রীতিটি লুপ্ত হওয়ার পথে।

রোগ নিরাময়ের জন্য ওঁরাওদের নিজস্ব চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। তারা প্রধানত মন্ত্র চিকিৎসা ও কবিরাজি চিকিৎসার মুখোপেক্ষী। তবে সময় বদলে গেছে। তারা এখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছেও চিকিৎসা নেয়।

এক সময় ওঁরাও গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাদের নিজস্ব গ্রাম পরিষদের হাতে। বয়োবৃদ্ধ সাত-আটজন নিয়ে গঠিত হতো এ গ্রাম পরিষদ। প্রতিটি পরিষদে থাকত একজন মহৎ বা 'মাহাতো' এবং একজন পুরোহিতসহ অন্যান্য পদ। এ সকল 'মাহাতো' বা মহৎদের মধ্য থেকে একজন 'পাঁড়হা' প্রধান নিযুক্ত হতেন। ওঁরাও ভাষায় তাকে বলে-পাঁড়হা রাজা। কিন্তু সময়ের হাওয়ায় ওঁরাওদের আদি গ্রামপরিষদটি এখন আর টিকে নেই।

এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সনাতনী জীবন প্রথা, আচার, ধর্ম, উৎসব, অভ্যাস ইত্যাদির ঐতিহ্যগত বৈচিত্র হারানোর পথে। কারণ সমাজে সংখ্যাগুরুদের কটাক্ষ, বৈষম্য ও ঘৃণার শিকার প্রতিনিয়ত হতে হয়। ভূমি দখলের মধ্য দিয়ে সমুলের এমন আদিবাসীদের সর্বহারা করে দেয়া হচ্ছে। সমুলের আদিবাসীদের জমির মালিকানা প্রচলিত ভূমি রেজিস্ট্রেশন নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করা হয়। দলিল, পর্চা, নামজারি সবই প্রযোজ্য। কিন্তু তারপরও তাদের কৌশলে উৎখাত করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ওঁরাও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জাতি। তারা আজও সনাতনী অবস্থাতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে সমাজের সংস্পর্শে ওঁরাওদের জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয়েছে- এটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র

১. আনওয়ারুল ইসলাম রাজু- রংপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, আইডিয়া প্রকাশন।
২. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পরিচয়- প্রমোদ নাথ।
৩. তুলিপ এক্কা ওঁরাও- সভাপতি, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, রংপুর।
৪. সরেজমিন পরিদর্শন।

তিস্তা বন্দরের ইতিকথা

এ.এস.এম.হাবিবুর রহমান

তিস্তা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। প্রকৃতপক্ষে ত্রিস্রোতা বা তিন প্রবাহ থেকে এর নাম তিস্তা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকদের মত। তাছাড়া পৌরাণিক কাহিনি এবং জনশ্রুতি থেকে এর তিস্তা নামকরণ নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। সিকিম হিমালয়ের ৭২০০মিটার উচ্চতায় চিতামু হ্রদ থেকে এ নদী সৃষ্টি হয়েছে। দার্জিলিঙে শিড়ক গোলা নামে পরিচিত এ নদী একটি গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে তিস্তা একটি বন্য নদী এর উপত্যকা ঘনবনে আচ্ছাদিত। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের সংগে মিলিত হয়েছে।

এক সময় এই নদীকে ঘিরে লালমনিরহাট জেলায় গড়ে ওঠা তিস্তা বন্দর বঙ্গের প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলো। কালের বিবর্তনে তা আজ বিলিনের পথে। ভগ্ন ঐতিহ্য নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেই স্মৃতি।

বৃটিশরা ভারত দখলের আগ থেকে এ অঞ্চল নৌ যোগাযোগ উন্নত ছিল। নদীর মোহনায়, মোহনায় বড় বড় বাণিজ্যিক বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। পাট, তামাক মাছ, সুটকি, চামড়াজাত, সাবান এবং জর্দা তৈরির কারখানাসহ বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের আড়ত গড়ে উঠেছিলো। তিস্তা নদীর ধারে গড়ে ওঠা তিস্তা বন্দরও তেমনি গড়ে ওঠা একটি বন্দর। নদী শুকিয়ে যাবার ফলে বন্দর এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে নদী কেন্দ্রীক গড়ে ওঠা অনেক কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে।

তিস্তা বন্দর মূলত রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট চার জেলার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থল ছিল। ১৯৪৭ সাল দেশ ভাগের আগ পর্যন্ত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসামসহ দক্ষিণাঞ্চলে নৌ পথ দিয়ে বড় বড় নৌযান যাতায়াত করতো। বিশেষ করে ময়মনসিংহ সরিষাবাড়ি, মোগলহাট, গিদালদহ, চিলমারীর বন্দর হয়ে আসাম পর্যন্ত নৌকা বা বজরা চলাচল করতো।

এ প্রসঙ্গে মানুষের মুখে প্রচলিত ছিল ১৮শ শতকে নদীর গভীরতা একটি দীর্ঘ বাঁশ দিয়ে পরিমাপ করলে, তল খুঁজে পেতো না মানুষ। এই স্রোতস্বীনি নদীর ওপর তিস্তা বন্দর হয়ে রংপুরের মানুষ এক সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পড়াশোনা ও বাণিজ্যের যাতায়াত করতো।

লোকশ্রুতি অনুসারে, চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা তিস্তা নদী দিয়েই লালমনিরহাটের হাড়াটি হয়ে আদিতমারির ভেতর দিয়ে বুড়িমারী জলপাইগুড়ি হয়ে কলকাতার দিকে চলাচল করতো। সেই পথটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আদিকাল থেকে উত্তরের তিস্তা বন্দর বিভিন্ন কারণে বিখ্যাত ছিলো। অনেকে নদীর শুকনো মৌসুমে চাষবাস, ভরা মৌসুমে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই অঞ্চলে প্রচুর পাট তামাক ইক্ষু উৎপাদন হতো যার ফলে বড় বড় তামাক, পাটের আড়ত গড়ে উঠেছিল। নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত তাছাড়া মাছের ব্যবসা জমজমাট ছিলো। এখনও দাস পাড়া নামে পাড়া আছে। রাম সুন্দর দালাল নামে মাছের এক বিরাট কারবারি ছিলেন। তার হুকো সাজানোর আলাদা একজন খাদেম ছিলো, তিনি ক্লান্তি জুড়োনোর জন্য হুকো টানতো। তিনি অনেক সময় স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের দেখে বলতো, এই অমুকের ছাওয়া আইছে একটা বড় মাছ দিয়ে দাও। সেই মাছটি ধরে খুশিতে টুইটুম্বুর হয়ে বাড়ি চলে যেত ছেলে মেয়েরা।

বসন্ত মাঝির কথা কী বলবো, মাছের ব্যবসা করে বেশ ধনদৌলতের মালিক হয়েছেন। সেই সময়ে কাঠের দোতলা বাড়ি ছিলো তার। কাঠের দোতলা বাড়ি থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। পূজা পার্বন শুরু হলে সবাই তাঁর বাড়িতে দাওয়াত খেতে যেতো। সবাই যেন একসূত্রে গাঁথা বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তার বংশধরা এখনো আছে, কেউ লেখাপড়া শিখে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন। সে দিনগুলোতে শ্রেণি বৈষম্য থাকলেও আজকের মতো এত মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অভ্যাস মানুষের ছিল না।

সেই সময় মারোয়ারীরা তিস্তা বন্দরে পাটের ব্যবসা করতো। তাঁদের সংস্কৃতি একটু ভিন্ন রকমের ছিল। হিন্দি ভাষায় কথা বলতো, বাঙালিরা ততটা বুঝতো না। ১৯৪৭ এ দেশভাগের পর তারা ভারতে ফিরে যান।

দেশভাগের পরও সুদূর গোয়ালন্দ খুলনা ভৈরবের বাজার থেকে বড় বড় মাছ, বাক্স ভরে এখানে আসতো।

তিস্তায় অববাহিকায় উত্তরবঙ্গের এক বিশাল সুটকির বন্দর গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি বংশানুক্রমে গড়ে ওঠে এ ব্যবসা। মূলত নদীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল। নদীর ভাটার কারণে এ পেশার মানুষরা পেশা বদল করে অনেকে অন্য পেশা বেছে নিয়েছে। সুটকির বন্দরটি যৌলুশতা হারিয়ে টিকে আছে অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হিসেবে।

এখানকার মাছ, সুটকি, পাট, তামাক সরিষা নৌপথে অবিভক্ত ভারতের

মোগলহাট গিদালদহ হয়ে কোচবিহারে আসামে চলে যেত। ইতিহাস থেকে জানা যায় নৌপথের ব্যবসা বাণিজ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সুটকী ব্যবসা বংশানুক্রমিক করছে মাখন লাল। তারা বাবা, দাদারাও এ ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। ময়মনসিংহ হবিগঞ্জ থেকে সুটকির ব্যবসা করতে এখানে চলে এসেছিল মাখনের পূর্ব পুরুষেরা। সিলেটের আজমিরিগঞ্জ ও অনান্য জায়গা থেকেও বড় বড় নৌকায় রুই বোয়াল শাল গজার মাছের সুটকি আসতো। তখনকার দিনে ছোট মাছের সুটকি কম পাওয়া যেতো। আজ নদী শীর্ণ দেহ নিয়ে পড়ে আছে, জলের অভাবে নৌকা চালানো যায় না।

পলাশির আম্রকাননে বাতি নিভে গেলো বর্গীরা দেশটার মালিক হয়ে যায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রেলপথের কাজ শুরু হয়। শোষকশ্রেণিরা এ অঞ্চলের ধন সম্পদ লুট করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে উত্তরবঙ্গে ১৮৭৯ সালে পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া মিটারগেজ লাইন চালু করে। ১৯০১ ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কাউনিয়া থেকে ধরলা নদী পর্যন্ত দুটি সরু গেজ লাইন স্থাপন করে। ১৯০৮ সালে রেলপথটি সম্প্রসারণ করে আমিনগাঁও পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। যার ফলে লালমনিরহাট একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে বেঙ্গল ডুর্য়াস রেলওয়ে মালবাজার পর্যন্ত একটি রেললাইন তৈরি করে। গোলকগঞ্জ-আমিনগাও পর্যন্ত তা প্রসারিত হওয়া ফলে আসামের সংগে সংযোগ স্থাপন হয়, ভারত ভাগ হওয়ার পূর্বে মর্যদাপূর্ণ আসাম মেল লালমনিরহাট হয়ে সান্তাহার থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত যাতায়াত করতো।

তিস্তা রেলস্টেশনটি ছিলো আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটি ব্যস্ত ও সুন্দর স্টেশন, নুড়িপাথরে বিছানো প্লাটফর্মে বাঁধানো একটি বাগান ছিলো দেখার মতো। ঝকঝকে তকতকে ওয়েটিং রুম ও ওয়েটিং হলে ছিলো রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্ট কিছু খেলে চায়ের জন্য পয়সা নেওয়া হতো না। রাধাচূড়া বাগানটির পাশে ছিলো বড় একটি ইন্দারা। বালতিতে চেন বেঁধে কপি কল দিয়ে জল তুলতে হতো। স্টেশন ঘিরে রেলকলোনি সুইপার কলোনির আজও চোখে পড়ে।

সে সময় তিস্তা নদীর উপর রেলসেতু না হওয়ার আগে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত ফেরী কাউনিয়া ও তিস্তার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছিলো। অতঃপর ১৮৯৯-১৯০০ সালে তিস্তা নদীর উপর রেলসেতু সেতু নির্মাণ করা হয়। রেলসেতু, রেললাইন ও সড়কপথে যাতায়াতের দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হলে নৌপথের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারতা এই এলাকাতে

আরও বেড়ে যায়। একারণে পরবর্তীতে একটি রেল জংশন স্থাপিত হয়। কালক্রমে নদীর নাব্যতা হারালে এবং সড়কপথে যোগাযোগ সহজ হলে নগরায়ন স্থানান্তর ঘটে। তিস্তার বাণিজ্যিক অঞ্চলের জৌলুশ হারায়। অনেকে পেশা বদল করতে বাধ্য হয়।

তৎকালীন তিস্তা ঘাটের মাঝি নওয়াজ আলি, তার ছেলে জয়নাল আবেদিন জানায়, ''নদীতে রেল সেতু হওয়ায় হুইসেল মারি সরাত করি রেলগাড়ি আসিয়া মালামাল নিয়া সরাউ করি চলি যায়, হামার লাভ হইল কী? বাপদাদার পেশাদারীখান চলি গেইল। আগোত বাপ-দাদারা নৌকা সাজেয়া রংপুর থাকি তেল লবণ, চিনি, ডাইল, সাবান আরও অনেক কিছু নিয়া আসছিল। মোটা দাগে কামাই হইতো। ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলিয়া আরাম আয়েশ হইতো। এ্যালা হামার কাম কাজ কমি গেইছে, উপায় না পায়া রেলস্টেশনে কুলিগিরি করি চইলবার নাগচি।''

ননিকাকা সুটকি মাছের বিরাট কারবারি। তার আড়তে যেয়ে বসি। তার কাছে জানা যায় কথিত ইতিহাস– সুটকি বন্দরের পাশাপাশি এখানে একটি মন্দির ছিলো, মন্দির তৈরির পিছনে কারণ। বৃটিশরা এদেশের ক্ষমতা নিয়ে নিলে দিল্লির শেষ সম্রাট শাহ আলমের চাচাতো ভাই, শওকত বাকের জং এদিকে চলে আসে। পরবর্তী সময়ে বৃটিশদের তাড়াতে একটি গোপন দল গঠন করে। কিংবদন্তি জয় দুর্গা দেবী চৌধারাণী, ভবানী পাঠক আরও অনেকে সেই আন্দোলনে মেতে ওঠেন। তারা আত্মোগোপনের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় মঠ ও মন্দির বানায়। এসব স্থাপনার গোপন রাস্তার সংগে নৌপথের সংযোগ ছিলো। এই সুরুঙ্গ দিয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাতায়াত ছিল।

নদী শাসনের ফলে নদী তার গতি হারিয়েছে। নৌবন্দরগুলো সজীবতা হারিয়েছে। তিস্তা পুনঃখননের মধ্য দিয়ে ফিরে পেতে পারে তার নান্দনিক রূপ। এ অঞ্চলের মানুষের জন্য উম্মুক্ত হতে পারে ব্যবসার নতুন দুয়ার।

তথ্যসূত্র:

১। তিস্তা নদীর নামে যে গ্রামটি– লেখক এ, এস এম, ওবায়দুল্লাহ।

২। এস, এম, ময়েজ হোসেন, ম্যানেজম্যান্ট স্টাডি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩। সৌভিক আহম্মেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। উইকিপিডিয়া।

৫। মননরেখা, সাহিত্যে পত্রিকা -সম্পাদক মিজানুর রহমান।

৬। নিজ অভিজ্ঞতা।

বৃহত্তর রংপুরের প্রান্তিক মানুষের জীবিকা: প্রেক্ষিত সুন্দরগঞ্জ

কঙ্কন সরকার

মানুষ তার জীবন নির্বাহের জন্য নানান রকমের কাজ বেছে নেয়। কে কীভাবে কোন পেশায়, কখন জড়িত হয়, কেউ বলতেই পারে না। অনেকে ছোটবেলায়ই পারিবারিকভাবেই পেশা নির্বাচন হয়ে যায়। দেখা গেছে– সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পেশা বদল হয়ে যায়, কোনো কোনো পেশা আবার বিলুপ্তও হয়ে যায়। কোনোটির রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে স্থান বিশেষেও পরিবেশ ও চাহিদানুযায়ী পেশাজীবন গড়ে উঠতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবন-যাপনে ব্যাপক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের পেশা কৃষিজীবি হলেও কালে কালে বিভিন্ন পেশায় তারা নিজেদের দক্ষ করে তোলেন। গাইবান্ধা জেলা একসময় রংপুরের সাবডিভিশন ছিল। বর্তমানে পৃথক জেলা। এই জেলার একটি উপজেলা সুন্দরগঞ্জ। বৃহত্তর রংপুরে অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরগঞ্জেও নানান রকম পেশাজীবীদের দেখা যায়। প্রাকৃতজনদের অনেক পেশাই আজ কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। তবে কোনোটির রূপের পরিবর্তনও হয়েছে।

একসময় এখানে খরম (কাঠের তৈরি স্যান্ডেল) বানানো হতো এবং এই খরম বাজারে বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করা একটি পেশা ছিল। কালের পরিবর্তনে সে পেশা বিলুপ্ত হয়ে গেছে আজ। তবে এখনো খরম বানানো পেশাজীবীদের বংশধর যারা বেঁচে আছেন, পেশা বদল করে। তারা গল্প করেন নিজেদের পরিবারে খরম বানানো বা খরম কাটা মিস্ত্রি ছিল। অনেকে তাদের খরমকাটা মিস্ত্রি বা গোষ্ঠী বলে সম্বোধনও করেন। অবশ্য ভালো কারিগর হলে সে সুনাম বেশ কয়টি প্রজন্ম পর্যন্ত রয়ে যায়। যেমন: সুন্দরগঞ্জে দেবনাথ পাড়ায় ভুরকু/ভুগরু (দুনামেই পরিচিত ছিলেন) নামে একজন খরম বানানো মিস্ত্রি ছিল। খুব ভালো কারিগর ছিলেন। এখনো তাঁর নাম বলে অনেকেই।

কাঠ দিয়েই গাড়ির চাকা (গরু বা মহিষের গাড়ি) বানানো এক ধরনের পেশা ছিল। এখনো তাঁর পরিচয় বা তাঁর পরিবারের পরিচয় চাকা বানা মিস্ত্রি হিসেবে পরিচিতি পায়। সুন্দরগঞ্জে বর্তমান বঙ্গবন্ধু চত্বরের পশ্চিমের পাড়াটি চাকা বানানো মিস্ত্রিপাড়া হিসেবে খ্যাত ছিল। আর ছাইতানতলায় জাহাজ বানা মিস্ত্রি (কাঠ দিয়ে জাহাজ আকৃতির নৌকা বানিয়েছিলেন বলে জাহাজ

বানা মিস্ত্রি।) তবে এ নামে তাঁর আসল নাম তলিয়ে গিয়েছিল! তাঁর আসল নাম ছিল কেপা মিয়া। নামকরা চাকা বানানো মিস্ত্রি ছিলেন। তাঁর নাতি সামিউল মিয়ার সাথে কথা হলে বলেন, ''আমিও তো ছোটকালে চাকা বানা দেখচি। এখন যে গরুর গাড়ির চল নাই। হামার দাদার হাতে বানা চাকা বহুদূর পর্যন্ত গেইচে। হামার বাবাও বানাইচিল। যখন চাকা বানা বন্ধ হইলো তখন চেয়ার টেবিল বানেয়া বিক্রি করছে। আমিও চেয়ার টেবিল মাজে-মধ্যে বানাই।'' কাঠে কোপ বসাতে বসাতে বলেন, ''বাবা কিন্তুক লাঙ্গলও বানাচিল।'' যাহোক, লাঙল বানানো বা লাঙল ভালো করাও ছিল এক শ্রেণির মানুষের পেশা। বাঁশের কাজের জন্য বিখ্যাত সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মীরগঞ্জের পাশে পাটনিপাড়া। জানাযায়, এক সময় এখানকার আদিবাসীরা নৌকায় পারাপার করাতো। পরবর্তীতে তারা বাঁশের কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা এ কাজে এত দক্ষ যে, মুখ ও হাত সমানতালে চলে। তাদের তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রয় করে। শপিংমল মালিকেরা কিনে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে। ডালা, কুলা, চালুন, মাছ ধরা যন্ত্রপাতি এর চাহিদা আছে, কিন্তু তা সিজেনারি অনেকটা। পেশাটি আমাদের অঞ্চলের লোক ঐতিহ্য বটে।

কারিগর তরনী কান্ত দাস জানান, ''বাঁশের কাজে তেমন পোষায় না। তৈরিতে সময় লাগে, বাঁশের দামও বেশি সেই তুলনায় তার বানানো জিনিসের দাম তেমন বাড়েনি, চাহিদা কম। প্লাস্টিকের জিনিসের তুলনামূলক কম দাম ও সহজলভ্য। ফলে পরিবেশবান্ধব বাঁশের এই শিল্প মার খাচ্ছে। অনেকেই এ পেশা ছেড়ে দিচ্ছে।'' বামনডাঙার সাতগিরিতেও ব্যাপকহারে এ কাজের কারিগরদের চোখে পড়ে। তাঁদের ভাষ্য, বাপ-দাদার পেশা ধরে আছেন।

নদী বেষ্টিত সুন্দরগঞ্জে নৌকায় পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করত অনেক মানুষ। নদী পুড়ে ওঠাতে নৌকায় পারাপার কমে এসেছে, সেই সাথে ঘাটের কথাও এখন স্মৃতি। তবে বর্ষা এলে বেলকা, হরিপুর থেকে কিছু কিছু নৌকা সুন্দরগঞ্জ/মীরগঞ্জ পারাপার করে। রৌমারি টু সুন্দরগঞ্জও নৌকা চলাচল করে।

খাঁটি গরুর দুধ থেকে দই বানিয়ে ভাড়ে করে বিক্রি করে বেড়ানোও ছিল গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের মানুষের আরেক পেশা। প্রায় হারিয়ে যাওয়া এ পেশাজীবীদের এখনো কালেভদ্রে চোখে পড়লে রবীন্দ্রনাথের অমলের কথা মনে পড়ে যায়। দইওয়ালা। আমাদের গাঁয়েই (ছাইতানতলা) বাদুয়া মহন্ত, বুধা মহন্ত দই বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। বুধা মহন্ত মারা গিয়েছেন। আর বাদুয়া মহন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। তবে তাঁর (বাদুয়া মহন্ত'র)

ছেলেকে মাঝে মাঝে এ কাজ করতে দেখা যায়। পাশাপাশি অন্য পেশায়ও যুক্ত তিনি। তবে তার সন্তান পৈত্রিক পেশা বদল করে পান-খিলির দোকান করে। অবশ্য সময়ের চাহিদায় নতুন করে খুঁটি দই, সরা দই বানিয়ে বিক্রি করাকে পেশা হিসেবে নিচ্ছে কেউ কেউ। সুন্দরগঞ্জের দাসপাড়ার অমল দাস এ কাজের উদাহরণ বেশ কয়েকজনকে দুধের ছানা বানিয়ে হোটেলগুলোতে বিক্রি করতে দেখা যায়। কাগজের বক্স বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন অনেকেই। সুন্দরগঞ্জের দাসপাড়ার বিনয় দাস বড় উদাহরণ।

ঝরনা কলম যাকে বলি তথা উইনসন, পাইলট নাবিক কলম এসব মেরামত করেও জীবিকা নির্বাহ করতো অনেকেই। সুন্দরগঞ্জে কলম মেরামতের চেম্বার (থানার সামনে বটতলায় ছিল) হিসেবে 'দি কলম হাসপাতাল' নামে নামকরণও করা হয়েছিল।

টাইপরাইটার মেশিন চালানোকেও কেউ কেউ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আজ কম্পিউটার সে স্থান দখল করেছে ও পরিধি বেড়েছে।

কুঁড়েঘর ছাউনি বা ছাওন করা যাকে বলে, এ কাজ যাঁরা করত তাঁদের আমাদের এলাকায় ছাকরবান বা ছাকরবাইন বলতো। অবশ্য কুঁড়েঘর এখন ইতিহাস। ছাকরবাইনরা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন।

একসময় বাড়িতে থেকে মাস হিসেবে কিংবা ছয় মাস হিসেবে কিংবা বছর হিসেবে চুক্তিভিত্তিক দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করে কাজ করতো অনেকেই। এখন বাড়িতে থাকা সিস্টেমটি নেই। দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজকরা এইসব লোকেদের কামলা বলা হতো।

কলু বা ঘানিটানা অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। তবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন পদ্ধতিতে এসেছে সেই ঘানি। কলুদের তেলি বলা হতো। ঘানিতে সরিষা ও অন্যন্য কাঁচামাল পিষে তেল তৈরার জন্য কলুরা ঘানির সাথে বলদগরুর বেঁধে দিতেন। এই চতুরদিকে ঘুরলে ঘানির ভিতরে তেল তৈরি হতো। অনেক সময় খেটে খাওয়া মানুষও কাধে লাগিয়ে ঘানি টানতেন।

'শিলপাটা ধার, কোটাবেন...' এই আওয়াজ দিয়ে বাড়ি বাড়ি জানান দিত কিছু মানুষ। তারা একটি লোহার সেনি ও হাতুড়ি ব্যবহার করে শীল ও পাটা খোদাই করতেন। আবহমান বাংলার গৃহবধুদের হাতে সুস্বাদু রান্নার জন্য প্রধান উপকরণ মশলা পেষার কাজে ব্যবহৃত হয় শিলপাটা। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় শিলপাটা ও যাতা ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন কমছে, অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ এখনও পেশাটি ধরে রেখেছে।

বাড়ি বাড়ি ঢেঁকি ছিল এক সময়। আর ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার জন্য

মহিলা শ্রমিক পাওয়া যেত। এ কাজকে পেশা হিসেবেও নিয়েছিল অনেকেই। কেউ কেউ ধান কিনে এনে ঢেঁকিতে ছেটে বিক্রয় করতো। যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো অনেকেই। এর নাম ছিল বিক্রি বাড়া বানা।

পাখা টেনে জীবিকা নির্বাহ করতো যাঁরা তাঁদেরকে পাখোয়াল বলা হতো। একসময় সুন্দরগঞ্জ সাব রেজিস্টার অফিসে পাখোয়াল চোখে পড়তো। একসময় উত্তরবঙ্গে ফ্যান, এসি এমনকি বিদ্যুৎও ছিল না। সে সময় গরমকালে ধনী, জোতদার, বড় ব্যবসায়ীদের পাখোয়াল নিয়োগ দেওয়া ছিল। কুয়ো/কুয়া বা চুয়া বসানো এক ধরনের পেশাজীবী ছিল এক সময়। আর এই কুয়ার মেদ (ভ্যাড়) তুলে দেওয়া/পরিষ্কার করার লোক পাওয়া যেত। একসময় উত্তরবঙ্গে কুয়া ও ইদারা খনন করে পানিয় জল উত্তোলন করা হতো। খরা মৌসুমে কুয়াতে পলি জমে যেত। এই পলি উত্তোলনের জন্য কিছু পেশাজীবি মানুষ ছিল। এই পেশাজীবিরাই কুয়া স্থাপন করতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সবাই এখন টিউবওয়েল ব্যবহার করায় পেশাটি বিলুপ্ত।

কাঠ ও বাঁশের দেশিয় প্রযুক্তির গাড়ি চালকদের গাড়িয়াল বা গাড়োয়ান বলা হতো। এ অঞ্চলের অনেকরই গরু ও মহিষের গাড়ি ছিল। এক সময় এসব গাড়ি ছিল স্থলপথে মালপত্র ও মানুষ পরিবহনের একমাত্র বাহন। এখন তেমন একটা গরু গাড়ির দেখা মেলে না। তবে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন বেড়েছে। এখনও চরাঞ্চলে এ গাড়ি অন্যতম বাহন। তবে মানুষকে বহনের চেয়ে মালপত্র বহনেই বেশি ব্যবহার হয় ঘোড়ার গাড়ি। তবে হাল আমলে চরাঞ্চলসহ সাধারণ স্থানেও মোটর সাইকেলে পরিবহনকে অনেকেই পেশা হিসেবে নিয়েছেন। মটরবাইকে যাত্রি বহন করে প্রায় শতাধিক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

হালচাষ (গরু দিয়ে লাঙল ব্যবহার করে জমি চাষকে হাল বা হালচাষ বলে) বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ অনেকেরই পেশা ছিল। এ পেশাজীবীদের হালুয়া বলা হতো। হালচাষিও বলা হতো। কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় হালুয়া/হালচাষিদের সংখ্যা এত কমে গিয়েছে যে, কোনো জমি গরু দিয়ে হালচাষ করতে দেখলে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে দেখি তার দিকে।

এক সময় গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সিলভারের হাঁড়ি-পাতিল, বালতি মেরামত করার জন্য কিছু লোক বেড়াতো তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে। এখন অবশ্য এ ধরনের কাজ কমে গিয়েছে। কেননা, হাঁড়ি-পাতিল পুরাতন বা নষ্ট হলে বদলের ব্যবস্থা আছে কিংবা পুরাতন হিসেবে বিক্রিই করা যায়। অন্যদিকে প্রযুক্তি নির্ভর রাইস কুকার, প্রেসার কুকার এসবের জায়গা অনেকটা দখল

করে নিয়েছে। আর এসব যাঁরা ভালো বা মেরামত করেন তাঁরা দোকান দিয়ে বসেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান না।

বেতের তালা (টালা), দোন, বড় দোন কোনো দ্রব্য পরিমাপ বা বহনের জন্য এক সময়ে এসবের বহুল ব্যবহার ছিল। তা তৈরি করে বিক্রয় করা এবং মেরামতের জন্য বেতের কারিগর। কিন্তু সময়ের আবর্তে প্লাস্টিক, স্টিল এর পাত্র বের হওয়াতে বেত দ্বারা তৈরি এসব দ্রব্যের চাহিদা অনেক অনেক কমে এসেছে। তবে বেতের টালার পরিবর্তে তৈরি হচ্ছে বেতের চেয়ার, সোফা, হেলনা চেয়ার, ফুলদানি, ঘর সাজানোর নানান উপকরণ। কিন্তু গাঁয়ের বেতের কারিগরদের কাঁচামাল সংকট ও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার ফলে এ পেশা নিয়ে আর থাকতে পারছেন না কারিগররা। শশি মোহন ঋষি এখন তাঁর দুছেলে শম্ভু ও জিতিশ এ কাজ করেন। যিনি ঢাক বাজানোর পাশাপাশি দোন, টালা বানাতেন ও মেরামতের কাজ করতেন। তাঁর ছেলের মধ্যে দুজন এ পেশায় যুক্ত আছেন। শম্ভু ঋষির সাথে কথা হলে বলেন, এ কাজে এখন পোষায় না।" কেননা, কাজ কমি গেইছে। তবে পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম যেমন তাঁর ছেলে ভাস্তে সেলুন দিয়েছে। আর কেউ এ পেশায় থাকছেন না।

গ্রামে চিড়া কুটনি, মুড়ি ভাজনি ছিল। নারীরা ভোর বেলাতে উঠে ঢেঁকিতে চিড়া কুটতো আর তা বিক্রয় করতো নিত্যদিন। কিন্তু প্রযুক্তি আসাতে ঢেঁকিতে কুটে চিড়া বিক্রয় কমেছে অনেক। মানুষ সহজলভ্যতার দিকে ছুটছে।

কুয়া, ইদারা, পুকুর ও জলাশয়ে দামী অলঙ্কার হারালে ডুব দিয়ে খুঁজে বের করে আনতো কিছু ডুবুরি। এই পেশাজীবীরা হারানো জিনিস বের করে দেওয়ার কাজ করতেন।

মালী জমিদার, জোতদার, ধনাঢ্য মানুষের বাড়িতে বাগান পরিচর্জার কাজে নিয়োজিত মানুষ। অবশ্য তাঁরা বাড়ি উঠান ঝাড়ু দেবার কাজও করতেন। কিন্তু এখন এ ধরনের পেশার কাজ গৃহকর্মীরা করে। আর দাপ্তরিক প্রতিষ্ঠানের বাগানের জন্য এখনও মালি নিয়োগ দেয়া হয়।

গোয়ালি মাঝেমধ্যে দেখা যায়, গোয়ালের দরজায় বসে গরু সম্পর্কিত পাঁচালী বলেন। গৃহস্থের মঙ্গলকামনা করে মন্ত্র পড়েন এবং ধান, চাল ও উপার্জিত টাকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে এ পেশা অনেকটা সিজেনারি। গোয়ালিরা পাশাপাশি অন্য পেশায়ও যুক্ত থাকেন।

রশি তৈরিও ছিল একটি জনপ্রিয় পেশা। গরু, ছাগল, মহিষ বাঁধার জন্য রশি আলাদাভাবে পাটের আঁশ পেচিয়ে মোটা রশি তৈরি করা হতো। এছাড়াও এসব রশি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হতো। গরুর মুখ দড়ি, ছাগলের দড়ি তৈরি

করে বিক্রি করাও ছিল জীবিকা নির্বাহের পথ।

ভুবন বৈরাগি নিত্যদিন ভাঁটের পাতা, ষটির পাতা, কলা পাতা কেটে সংগ্রহ করে তামাকওয়ালা, লবণ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করতো। তার মৃত্যুর পর আর কাউকে চোখে পড়ে না। কারণ পলিথিন, পাস্টিক, কাগজের ঠোঙা সে জায়গা দখল করে নিয়েছে।

বই, খাতা বাঁধাই করে সংসার চালান কেউ কেউ।

ছেলেদের সুন্নতে খৎনা করতে ও পাঠা ছাগলকে খাসি করতে এক ধরনের পেশাজীবী দেখা যায়। (যাঁদেরকে বাগড়িয়া বলে)। এখন অবশ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাগড়িয়া রয়েছে।

ধর্মপুরের কুমারপাড়ার কর্মচাঞ্চল্য এখন তেমন দেখা যায় না। অনেকেই এ পেশা ছেড়েছে। মালাকার/কারিগর (যাঁরা হিন্দুর পূজার প্রতিমা গড়ান।) কেননা, এসব কাজে বর্তমানে জীবিকা পালন করা কঠিন তাঁদের মত।

এসব সিজেনারি বলা যায়। নাড়কেল গাছ, তালগাছ পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করে। -কেউ কেউ

মাছ ধরে বিক্রিকারী জেলেদের (মাঝিপাড়া বলে এ অঞ্চলে) আর সে পেশা নেই। লোকে খামার করে মৎস্য চাষ করে এখন। ফলে জাল বানিয়ে বিক্রি করে জীবন চালানোও নেই। দোকানেই জাল কিনতে পাওয়া যায়। তবে শহরে, মফস্বল শহরে মাছবাজারে মাছ কেটে দিয়ে পয়সা রোজগার করে কেউ কেউ। কেজি প্রতি ২০-৫০ টাকা আয় করে। প্রতিদিন কেউ ১শ থেকে ৫শ টাকা গড়ে আয় করে।

একসময় পাড়ায় পাড়ায় চুল কেটে বেড়াতো নূরসুন্দর, তাদের আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেলুন বসেছে বাজারে, রাস্তার মোড়ে, নারীদের জন্য বিউটি পার্লার হয়েছে।

তুলির পরশে রঙ দিয়ে রিকশার পেছনে ও দেওয়াল লিখন, সাইনবোর্ড লিখন একটি জনপ্রিয় পেশা ছিল। তবে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় তা বিলুপ্তের পথে। কেউ কেউ এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে। রিকশা পেইন্টার মৃনাল কান্তি বলেন, এ পেশায় জীবন চালানো কঠিন এখন। কারণ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে সব।

দর্জির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেকেই। এক সময় প্রচুর মানুষ কামারের কাজ করতো তাদের অনেকেই এ কাজ ছেড়েছে। বামনডাঙ্গা স্টেশনের আশেপাশে অনেক কর্মকারের দোকান ছিল। মীরগঞ্জহাট, ধর্মপুরেও কামার ছিল। কামারেরা আগুন দিয়ে লোহা গরম করে পিটিয়ে দা, কুড়াল,

পাসুন, চাকু, কাচি, বটি, কোদালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি তৈরি করতো। এ পেশাতেও লেগেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রযুক্তির ছাপ। ফলে পেশা বদল করেছে অনেকে।

চুন তৈরি করে যারা বিক্রি করেন তাদের যুগি বলা হয়। সুন্দরগঞ্জের ধুমাইটারিতে যুগি ছিল। শামুক, ঝিনুক দিয়ে চুন তৈরি করে তারা বাজারে বিক্রি করতো। এখনো অল্প সংখ্যক যুগি আছে। কিন্তু তা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কেননা, একদিকে চুন তৈরির কাঁচামাল শামুক, ঝিনুক তেমন পাওয়া যায় না, অন্যদিকে পাথরি চুনের অধিক সরবরাহ।

কাঠুরে বা বড় করাত দিয়ে গাছ ফারিয়ে যেসব লোক (করাটিয়া/কটটিয়া) জীবিকা নির্বাহ করতো স'মিল তাঁদের সে পেশাকে গ্রাস করেছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে কাঠুরে পেশাও। অবশ্য ছ'মিলে কাজ করে কিছু লোকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নারীদের আয়ের পথ হয়েছে। তারা গাছের ছাল তুলে খড়ি হিসেবে বিক্রি করে।

অটো রাইসমিল চাতাল শ্রমিকদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। মণ্ডলের হাটের খানপাড়া হাওয়াইমিঠাই গ্রাম নামে পরিচিতি পেয়েছে। কেননা এ পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী (প্রায় একশ পরিবার) হাওয়াইমিঠাই তৈরি করে বিক্রয় করে। অনেকে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও গিয়ে হাওয়াইমিঠাই তৈরি করে বিক্রি করছেন। যে সময়টা হাওয়াইমিঠাই তৈরি হয় না সে সময় তারা পাঁপড় তৈরি করে বিক্রয় করেন।

রামধন গ্রামের বিষু চন্দ্রের তৈরি তিলের খাজায় জীবন সংসার চালায় বেশ কিছু মানুষ। অন্যদিকে শিকারমারীর দুলাল মিয়াও তিলের খাজা তৈরি করে বিক্রি করে। ডালের বড়ি বানিয়ে বিক্রি করে আয় করাকেও সিজেনাল পেশা হিসেবে নিয়েছে ফলগাছার সেনপাড়া ও সুন্দরগঞ্জ কলেজপাড়ার কিছু পরিবার।

বাইস্কোপ দেখিয়ে, পুতুল নাচ দেখিয়ে, বানরখেলা দেখিয়ে, সাপ খেলা দেখিয়ে, জাদু দেখিয়ে এ অঞ্চলের কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহ করতো একদিন, আজ তা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি! একদিন সিনেমার ক্যানভাস করে জীবন চালাতেন যিনি (শিল্পী বিশ্বনাথ দাস তিনি অবশ্য এখন গান শেখানোকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন, ওস্তাদ মতিনুর রহমানও গানের প্রশিক্ষক।)

ফটো বাঁধাই করে (বাঁধাইকারী) জীবন চালাতেন বিমল/হরেন, তারা আর সে পেশায় ধরে রাখেননি।

এক সময় তাঁত বসেছিল কাশদহে ও গোয়ালের ঘাটে। কিছুলোক তাঁতে

খুঁজে পেয়েছিল জীবন চলার পথ। পৃষ্ঠপোষকের অভাবে এক সময় হারিয়ে যায় সে তাঁতশিল্প।

পান বরজে জীবিকার পথ পেয়েছেন অনেকেই। সুন্দরগঞ্জে বামনডাঙ্গা, সোনারায়, ধর্মপুরে পান বরজ থাকলেও চণ্ডীপুর ও কঞ্চিবাড়িতে ব্যাপক ভিত্তিক পান চাষ হচ্ছে। বিশেষ করে আটঘরিয়ায় পানের বরজ বেশি।

ঘাস কাটা কিংবা ঘোড়ার ঘাস কাটা বলে থাকি কাউকে তার কাজের ধরনে, কিন্তু সুন্দরগঞ্জে ঘাস চাষ ব্যাপক হারে বাড়ছে আর তাতে জীবিকার পথও খুঁজে পাচ্ছেন কেউ কেউ। সুন্দরগঞ্জের ফতেখাঁ গ্রামের সাজু মিয়া ঘাস চাষ করে জীবিকা নির্বাহসহ সন্তানের লেখাপড়ার টাকা জোগাচ্ছেন। জমি ইজারা নিয়ে ঘাস চাষ করছেন তিনি। এমন অনেকেই আছেন।

প্লাস্টিকের পড়ে থাকা বোতল, পট সারাদিন কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে কেউ কেউ।

ঢোল বাদক, ঢাকি বা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে অর্থ উপার্জন করতো এক শ্রেণির মানুষ যারা বাদিয়া হিসেবে পরিচিত। এ পেশাটি বংশপরম্পরা হলেও এখন অন্যান্য পেশার মানুষও যুক্ত হয়েছেন এ পেশাতে। ছাইতানতলার রবিদাস, জুতা মেরামত, সাইকেল-রিক্সা মেরামত করতেন তারা এখন বাদ্যযন্ত্র বাজানোকেও পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তৈরি করেছেন ব্যান্ডদল।

গ্রামের হাটগুলোতে এক শ্রেণির লোক দালাল হিসেবে কাজ করছেন। বিশেষ করে গরু ছাগল বিক্রির সময় তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থিত হন। দাম মিটে গেলে গ্রাহক ও বিক্রেতার কাছে বকশিস হিসেবে যা পান তাই দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন।

শ্রমিক, মজুর, কুলি, দিনমজুর, মাছ বিক্রেতা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বিক্রি, হোটেল বয়/শ্রমিক, রিক্সাচালক, অটোচালক, ভ্যান চালক, ড্রাইভার, হেলপার, দোকানের কর্মচারি, মেকানিক, ফেরিওয়ালার সংখ্যাও কম নয় এ অঞ্চলে। নতুন পেশা হিসেবে খামার করে মুরগি-হাঁস, গরু-ছাগল, কবুতর পালন, নার্সারি এসবের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন। কেউ কেউ নার্সারি থেকে চারা এনে বিক্রয় করে। কেউ ঘর বাড়ি রং করা মিস্ত্রি হয়েছে। কারেন্টের কাজের মিস্ত্রি হয়েছে। পানির লাইন লাগানো (ফিটিং) মিস্ত্রি হয়েছে। টাইলস লাগানো মিস্ত্রি হয়েছে। মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার সার্ভিসিং, টেলিভিশন সার্ভিসিং, রাইস কুকার- প্রেসার কুকার সার্ভিসিং এ যুক্ত হচ্ছে কেউ কেউ। মটর সাইকেল সার্ভিসিং, অটোরিক্সা সার্ভিসিংকে পেশা হিসেবে নিচ্ছে কেউ কেউ। ভাঙাড়ির ব্যবসা করে কিংবা ভাঙাড়ি জিনিস

সংগ্রহ করে বিক্রি করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। হাল আমলে এটা একটা লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। ধোপা পাওয়া যায় না, তবে লন্ড্রি ব্যবসা এখনো টিকে আছে। ডেকোরেটর ব্যবসা আছে। বিয়েশাদি, জন্মদিন, সভা-সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে থালাবাসনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভাড়া দেয়ার এ ব্যবসা এখন লাভজনক।

[লেখকের সুন্দরগঞ্জের গ্রামীণ আবহে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ও সরেজমিনে ঘুরে লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।]

বাজার
সাজিদ রহমান

বাজারে ঘরের মানুষ আছে, থাকে ঘরছাড়া মানুষও। ছোটবেলায় সব বাবা-মা সন্তানকে নিষেধ করে বাজারে বেশি না যেতে। শুধু সন্তান নয়, মানুষও নষ্ট হয় বাজারে। সমাজই খারাপ মানুষকে বাজারি বলে গালি দেয়। অথচ বাজার ছাড়া সমাজের চলে না। চোর বা সন্ন্যাসী, বেশ্যা কিংবা বুজুর্গ, বাজার সকলের। বাজার সমাজের এমন একটি অংশ যেখানে যোগী ও ভোগী উভয়কে পাওয়া যায়।

শুধু যোগী ও ভোগী নয়, সংসারের সকল শ্রেণির মানুষের আনাগোনা সেখানে। সেজন্যই বাজারকে সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে অদ্ভূত জায়গা বলা হয়। বাজারে দেখা মিলে সমাজের নানা শ্রেণির, হরেক পেশার মানুষের। গুণিজনরা একটা কথা বলে থাকেন, ছাত্রজীবনে যে মেস বা হলের গণরুমে দিন কয়েক কাটায়নি কিংবা পচা-কাদা মাড়িয়ে, দুর্গন্ধের সুবাস মেখে মেরে-কেটে দুই/চার দিন কাচা বাজারের ব্যাগ টানেনি, তার এক জীবনে কখনই আর যাই হোক পরিপক্কতা (ম্যাচিউরিটি) আসবে না।

গুরুজনদের সেই বাণী আমার কাছে অজানাই ছিলো। অনেক আগে থেকে বাজার করি বলে নিজেকে বাজার-পাশ ভাবতেই ভালো লাগে। বাজার-পাশ হলেই কি তাকে বাজারি বলা যাবে? সেটা অবশ্য জানা নেই। বাজারে যাই পেটের দায়ে। রোজ রোজ ক্ষুধার যে খোরাক, তা এই বাজারেই মিলে। বাজারে কি অন্য রকম ঘটনা ঘটতে পারে? একদিন সদাই কিনতে বাজারে গিয়ে তারই কিছু কিছু জবাবের সন্ধান খুঁজে ফিরি।

২.

বাসায় বাজার সদাই নাই। একটা ব্যাগ ও ফর্দ নিয়ে সেই বাজারের নিয়াতে রিকশায় উঠি। মাছের রাজা ইলিশ, জামাইয়ের রাজা পুলিশ। সবই পাওয়া যায় এই বাজারে। পুলিশ যখন বাজারে যায়, ইলিশ-পুলিশ দুইজনকেই পাওয়া যায়। বাজারে ঢুকে সোজা সবজির বাজারের দিকে চলে যাই। কলমি শাক, পালং, কাঁচ-কলা, বরবটি, টমেটো কিনি। সবচেয়ে বেশি শব্দের হল্লা চলে মাছ-বাজারে। ইচ্ছে না থাকলেও সেখানে যেতে হয়। আমার বাসার ছোট-বড় সকলে ছোট মাছের ভক্ত। কিন্তু মাছ বাজারে এলেই মনে খচখচ করে, বেশি দামে পচা মাছ গছিয়ে দিলো নাকি! তবুও খোদার উপর ভরসা

রেখে মাছ কিনতে হয়। কিছুটা দেখে আর বাকিটা খুব মাছ চিনি ওরকম ভাব নিয়ে টেংরা-কই-গচি-পোয়া পাঁচ-মিশালি মাছ কিনি।

আগের আমলের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। এই খান আমির, শাহরুখ কিংবা সালমান খান নয়। পরিবার ভেঙে 'যার যার তার তার' হয়ে গেছে। সেই জন্য বাজার হয়েছে 'যার যার তার তার' পরিবারের যৌথ প্রযোজক। বাজার নিজ দায়িত্বে হলুদগুঁড়া, মসলাগুঁড়া থেকে শুরু করে অনেক কিছুই রেডি করে দিচ্ছে। এমনকি বাজারে আছে সুলভে মাছ কাটার সুব্যবস্থা। মাছ পাল্লায় উঠানোর সাথে সাথে মাছ কাটার খালারা ডাকতে থাকেন। প্রায়শই একজন খালার কাছে মাছ কেটে নেই। সেই খালা মাছ কাটতে খুব এক্সপার্ট। তবে ছোটমাছ কাটতে বেশ সময় লাগে। খালাকে মাছ কাটতে দিয়ে বাকি বাজার সারতে থাকি। অনুপস্থিতিতে মাছ সরানোর কোনো ভয় নাই। আবার অন্য কোনো কাজ না থাকলে পাশে অপেক্ষাও করি কখনও কখনও।

খালার কাছে জানতে চাই, মাছ কিনে ঠকলাম কিনা। বরাবর খালা মাছ কেনার প্রশংসা করেন। কখনও মনে হয়, মাছ খারাপ হলেও মিছামিছি প্রশংসা করে। মাছ পচা বলে আমাকে কিংবা মাছের দোকানদার কাউকে রুষ্ট করতে চায় না। এর সাথে জড়িয়ে আছে খালার রুটি-রুজি। বড় মাছ হলে নাড়ি-ভুড়ি, চর্বি, কলিজা একপাশে সুন্দর করে রেখে দেয়। সম্ভবত এসব দিয়ে তাদের আমিষের অভাবও পূরণ হয়।

৩.

খালাকে মাছ কাটতে দিয়ে যাই মুদির দোকানে। মুদির দোকানে দাড়াতেই গোটা কয়েক ছোকড়া আমাকে ঘিরে ধরে। গৃহস্থ বাড়িতে সাগাইয়ের জন্য মুরগী জবাই করলে আশেপাশের কাক সমাজে খবর চলে যায়। গিন্নি সেই মুরগির ঠ্যাং কিংবা নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিলে সেটার দখল নিতে কাকদের মাঝে লড়াই শুরু হয়। গাঁও গ্রামে গেলে এরকম দৃশ্য চোখে পড়তে পারে। আর বাজারে গেলে এদের দেখতে পাই। ব্যাগ ভরে যে বাজার নিচ্ছি সেটা বয়ে নিতে আমার কষ্ট হবে। ওরা আমার কষ্ট লাঘব করতে চায়। ওদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স আবার একদম কম। ৭-৮ বছর হলেও হতে পারে। শার্ট-প্যান্ট ময়লা, মাথার ঝাকড়া চুল একদম অগোছালো। এসব দেখতে দেখতে অন্য কিছু খেয়াল করা সম্ভব হয় না। মলিন মুখটাতে হাসি হাসি ভাব করে একজন বলে, 'স্যার, ব্যাগ টানা লাগবে?'

আজকে বাজারের তালিকা অত লম্বা ছিল না। ব্যাগের ওজনও খুব বেশি

হবে না। ব্যাগ টানতে হবে না বলতে গিয়েও চুপ থাকি। লাগবে না, বললে মুখের অবস্থা কী হবে সহজেই পড়ে নিতে পারি।

তবুও একটু রাগ রাগ ভাব নিয়ে একজনকে বলি, 'তুই পারবি?'

'মাথায় উঠায় দিলে একদম মেইন রোডে পৌঁছে দিবার পারিম, স্যার।' ঝটপট উত্তর দেয়। ব্যাগ দিতে রাজি হয়েছি বুঝতে পেরে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওদেরই অন্য একজন ব্যাগ মাথায় তুলতে সাহায্য করে। বাকিরা অন্য ব্যাগের সন্ধানে চলে যায়। বেশ করিতকর্মা। মেইন রোডে রিকশা ঠিক করে ব্যাগ উঠিয়ে দিয়েছে। দশ টাকা নিয়ে খুশি মনে ফিরে যায়। আমার মতো অন্য কারও খোঁজে, নতুন ব্যাগের সন্ধানে।

৪.

সময় ঘুরে ঘুরে ঈদের মৌসুম আসে। উৎসবের এই সময়টায় বউ-বাচ্চা নিয়ে ঈদের শপিং এ বের হই। শপিং মলের দোকানগুলোতে নতুন নতুন ছেলেদের আমদানি হয়েছে। ঈদ-পূজা এলে শপিং মল জুড়ে মৌসুমি চাকরির ব্যবস্থা হয়। এদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা দোকানের ভিতরে কাজ করে। তাদের কাজ মূলত কাস্টমারকে দেখানোর পর অগোছালে শার্ট, প্যান্ট কিংবা থ্রি-পিছ গুছিয়ে রাখা। অন্যদিকে দুয়েক জন থাকে কাস্টমার আসলে দোকান/শোরুমের গেট খোলা-বন্ধ করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়তি কিছু ফুট-ফরমায়েশ তামিল করতে হয়। সেদিন এক পিচ্চির কাছে জানতে চাইলাম, 'কত দেয়?' রোজা শেষে ফিক্সড আড়াই হাজার দিবে। ব্যবসা হাউজফুল হলে আরও কিছু পাবে। এমন আশায় কাজ করে যাচ্ছে।

৫.

রমজান মাসের সময়টাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বেশ পরিবর্তন আসে। আমার মতো মানুষেরও ধর্মীয় অনুশাসনে চলার বেশ চেষ্টা থাকে। বাজারের পাশে মসজিদ। সেখানে এশা ও তারাবির নামাজ আদায় করি। নামাজ শেষে হাঁটতে হাঁটতে একটা স্কুলের সামনে চলে আসি। সেই মোড়ে রয়েছে একটি বঙ্গবন্ধুর ম্যূরাল। সাম্য শান্ত দৃষ্টি। আয়তনে বিশাল। সুদৃশ্য। মুরালের পাশে মহাসড়ক। রাত দিন সেই মহাসড়কে আসা যাওয়া হাজারও মানুষের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। পাশে একটা চায়ের টং দোকান। আগেই সময় দেয়া থাকে। একে একে সেখানে জড়ো হয় কয়েক জন বন্ধু। বন্ধুর কলিগ।

কলিগের বন্ধু। সেখানে বসলেই পাশের টং এর মামা চা দিয়ে যায়। কখনওবা আখের রসও খাই। মসজিদ থেকে ম্যুরাল পথে রাস্তার পাশে কয়েক জন বয়স্ক লোক বসে। কেউ বেচে শাক, কেউবা কলা। বাজারের চেয়ে বেশ কম দামেই এখানে শাকসবজি কিংবা কলা পাওয়া যায়। কয়েক দিন থেকে খেয়াল করছি, রাত ১০টা বাজে বাজে। পাশে বৃদ্ধ চাচা ছোট একটা কুপি জ্বালিয়ে নিজের ও তার দোকানের অস্তিত্ব জানান দেয়। আন্দাজ করি বয়স ৭০ ছুঁই ছুঁই হবে। সম্ভবত বাসায় কলা আছে। তবুও সেই চাচার দোকানের সামনে দাঁড়াই। দুইটা কলা কিনে খাই। খেতে খেতে চাচার বাড়ি-ঘর, সংসারের হদিস জানতে চেষ্টা করি। চাচার ৩ মেয়ে, ২ ছেলে। ছেলেরা দেখে কিনা এই প্রশ্নও করে বসি।

'সবার সংসারত অভাব বাহে, কায় কাক দেখে'?

ঠিক এভাবেই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন চাচা। চাচা জানেন এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। তাঁকে দেখে বুঝতে পারি, তিনি জবাব আশাও করেন না। হয়ত সেই প্রশ্ন অদৃষ্টের কাছেই করে রাখেন। মনে মনে একবার ভাবি, চাচাকে কয়টা টাকা দিয়ে সাহায্য করি। আবার চিন্তা করি, চাচা ব্যবসা করে সংসার চালান। যদি এরকম অযাচিত অনুগ্রহ নিতে অস্বীকার করেন? সেটা মাথায় আসতেই ঐ চিন্তা থেকে পিছু হটি। আর আমার যৎ-সামান্য অর্থ চাচাকে রাত জেগে কুপি জ্বালিয়ে কলা বেচা থেকে রেহাইও দেবে না। বাসার জন্য আরও কয়টা কলা নিই। কলার দাম মিটিয়ে সামনে চলে যাই।

৬.

এমন লাখো মানুষ সারা দেশে। একটা করে বছর আসে, সাথে নিয়ে আসে ঈদ। সেই ঈদ আনন্দময় করার জন্য মজুর-মুটে-রিক্সাচালক-দোকানের ছোকরা-কুপি জ্বালিয়ে কলা বেচতে থাকা চাচা কাজ করে যায়। বাজারের হাজারও উপাদানের মধ্যে ওরাও থাকে। এক একটা ঈদ নিয়ে আসার কথা অনাবিল আনন্দ। বয়ে যাওয়ার কথা প্রশান্তির ধারা। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না। বাজারে জিনিসপত্রের লাগামহীন দামে নাভিশ্বাস ওঠে। দুনিয়ার এই বাজারে এঁরা যেন পায়ে গলানো জুতার মতো। ঘরে-বাইরে চলতে গেলে যে জুতা শরীরকে রক্ষা করে নোংরা হওয়া থেকে। সেই জুতা আনন্দের সাথে নোংরা নিজের গায়ে মেখে নেয়। তবু তার নিস্তার নেই। সেটা ছিঁড়ে গেলে ডাস্টবিনে ছুড়ে দিয়ে নতুন এক জোড়া পায়ে গলিয়ে নেই।

মোড়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের দিকে ফের দৃষ্টি যায়। আয়তনে বিশাল। সুদৃশ্য। ম্যুরাল তাঁর সাম্য শান্ত দৃষ্টি নিয়ে অপলক চেয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধী জিতু রায়ের সফলতা

স্বপন চৌধুরী

প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলেই সমাজে আর দশজনের মতো প্রতিবন্ধীরাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেই অন্যের করুণায় বেঁচে থাকতে হবে এমনটি নয়-তার প্রমাণ দেখিয়েছেন রংপুরের জিতু রায়। বন্ধুসহপাঠী, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশিদের অবহেলা-তাচ্ছিল্য তাকে দমাতে পারেনি। প্রতিবন্ধী জিতু সমাজের বোঝা না হয়ে নিজেকেই শুধু স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলেননি, ইচ্ছাশক্তি আর নিজের বুদ্ধিমত্তায় অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে না পারা জিতু এখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া একজন উদ্যোক্তা, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

রংপুর নগরীর তাজহাট মোল্লাপাড়া এলাকার মহেন্দ্র রায় ও মঞ্জু রানী দম্পতির প্রতিবন্ধী ছেলে জিতু রায়। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় তিনি। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জন্ম নেওয়া জিতু তিন বছরের মাথায় পোলিও আক্রান্ত হন। বাবার কোলে-পিঠে চড়েই শুরু হয় বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা। এরপর শারীরিক প্রতিবন্ধীতার কারণে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পেরুনো সম্ভব হয়না তার। জিতুর অনিশ্চিত জীবনের চিন্তায় পরিবারসহ আত্মীয়-স্বজন দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাকে নিয়ে পরিবারের কষ্টের বিষয়টি বুজতে পেরে নিজে কিছু একটা করার জেদ চেপে বসে জিতুর মাথায়। সবার মতো হাটাচলা করতে না পারা জিতু বাবার পিঠে চড়ে প্রথমে শুরু করেন পুরাতন লোহা-লক্করের (ভাংরি) ব্যবসা। পরবর্তীতে মোবাইল সার্ভিসিং এর সাথে যুক্ত হন। কিন্তু তিনতলা ভবনে উঠে মোবাইল সার্ভিসিং করা প্রায় অসম্ভব ছিল তার জন্য। পরে জিতু রায় ফ্রিল্যান্সার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে প্রথমে একটি কম্পিউটার প্রয়োজন। অভাবি পরিবারের সদস্য হিসেবে যা তার ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না। এমন অবস্থায় তিনি অনেক স্থানে কম্পিউটার শেখার চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হন। সেই সময়ে কেউ তাকে ফ্রিল্যান্সিং বিষয় শেখাননি কিংবা শেখানোর সহানুভুতিও দেখাননি। বরং তাকে দেখলে বাড়তি বোঝা মনে করে কম্পিউটার বন্ধ করে দিতেন। তাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দেওয়া হতো তাকে।

তৌফিক নামের এক বাল্যবন্ধু এক সময় এগিয়ে আসেন। নিজের কম্পিউটার দিয়ে সহযোগিতা করেন জিতুকে। ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জেদ থেকে

টানা তিনমাস দিনরাত কম্পিউটারে গুগল ও ইউটিউব দেখে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শেখেন জিতু রায়। সময়টা ২০১১ সালের শেষের দিকে। পরে মায়ের জমানো টাকা ও ধার করে একটি কম্পিউটার কেনেন তিনি। শুরু হয় জিতু রায়ের ফ্রিল্যান্সিং যুদ্ধ। এর পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি জিতুকে। সফলতা হিসেবে ২০১২ সালে ফ্রিল্যান্সিং থেকে প্রথম আয় করেন ৫০০ ডলার। তারপর শুধু এগিয়ে যাওয়ার গল্প। এখন জিতু রায়ের প্রতিষ্ঠানে তার তত্বাবধানে কাজ করেন শতাধিক নারী-পুরুষ। ইউএস'র প্রায় ১০০ জন ক্লায়ান্ট'র নিয়মিত কাজ করছেন জিতু। তবে শুরুটা সহজ ছিল না তার। শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে এগিয়ে যাওয়ার পথে হাজারো প্রতিবন্ধকতায়ও দমে যাননি তিনি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন। নিজ হাতে ধরেছেন সফলতার চাবি। একসময় অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাচল করতে না পারা জিতু এখন চড়েন ব্যক্তিগত গাড়িতে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে প্রতিবন্ধীতা জয় করে জিতু হয়ে উঠেছেন একজন সফল উদ্যোক্তা।

ফ্রিল্যান্সিং থেকে স্বপ্ন পূরণের যাত্রা শুরু হলেও তিনি বর্তমানে তৈরি করছেন শিশুদের পোশাক সামগ্রী। দেশে আমদানি নির্ভরতা কমাতে ২০২১ সালে উদ্যোক্তা হিসেবে এ ব্যবসার সাথে যুক্ত হন তিনি। রকমারী শিশু ঘর ডটকম নামে ওয়েবসাইট ও পেজ খুলে শিশুদের পোশাক সামগ্রী অনলাইনে বিক্রি করছেন। তার এই প্রতিষ্ঠানে অনলাইন মার্কেটিংয়ের জন্য কয়েকজন তরুণ রয়েছে। যারা অনলাইনে অর্ডার নিয়ে পণ্য ডেলিভারি করেন। শুরুতে বাড়ির আঙিনায় অস্থায়ীভাবে শিশু সামগ্রী তৈরি করা হলেও ভালো সাড়া পাওয়ায় বড় পরিসরে করার পরিকল্পনা থেকে তৈরি করেছেন স্থায়ী কারখানা। যেখানে শিশুদের জন্য নকশী কাঁথা তৈরি করে অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে। কারখানায় শতাধিক কর্মী কাজ করার পাশাপাশি জিতু রায়ের কাছ থেকে কাজ নিয়ে নকশী কাঁথা সেলাই করেন আরো শতাধিক নারী। নিজ নিজ বাড়িতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা সেলাই করেন সেই নকশী কাঁথা। নগরীর ডিমলা এলাকায় গড়ে ওঠা জিতুর কারখানার কর্মীরা জানান, কাজের ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫ হাজার থেকে সর্বনিম্ন ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনে কাজ করেন তারা। সোহেল মিয়া নামের এক কর্মী বলেন, 'ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও জিতু রায় অনেক কিছু করে দেখিয়েছেন। তার কারখানায় কাজ করে আমাদের খাবার জুটছে।'

এক বছরের বেশি সময় ধরে কারখানায় কাজ করা মালেকা বেগম বলেন,

শিশুদের পোশাক তৈরির কাজ করি। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে মাসে আট হাজার টাকা বেতন পাই।

অনিশ্চিত জীবনের প্রতিবন্ধী জিতু রায় এখন সফল উদ্যোক্তা। সময় পেলেই ব্যক্তিগত গাড়িতে ঘুরে বেড়ান শহরজুড়ে, আছে গাড়িচালকও। এছাড়া রয়েছে আরো দুটি তিন চাকার মোটর বাইক। যা তিনি নিজেই চালান। নিজস্ব জায়গায় তিনতলা বাড়ি বানাচ্ছেন। জিতু রায় এখন স্ত্রীসহ দুই ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও বাবা-মাকে নিয়ে স্বচ্ছল ও সুখের সংসারের প্রধান। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু অসহায় মানুষদের কর্মসংস্থান করতে পারায় গর্ববোধ করেন তিনি। জিতু রায় বলেন, ‘বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে দেখেছি আমাকে নিয়ে অনেকে হাসি-ঠাট্টা করেছে, নানাভাবে তাচ্ছিল্য করেছে। বলেছে, আমাকে দিয়ে শুধু ভিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমাকে নিয়ে তাদের সেই নেতিবাচক ধারণাই আমার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।’ একেবারে নিজের চেষ্টায় এতদূর এসেছেন উল্লেখ করে জিতু বলেন, সরকার প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনেক কাজ করছেন, আমার স্বপ্ন পূরণে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহলে শিশুদের পোশাক সামগ্রী তৈরির পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নসহ দেশে আমদানি নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে।

এ ব্যাপারে সমাজসেবা অধিদপ্তর রংপুরের উপ-পরিচালক আব্দুল মতিন বলেন, প্রতিবন্ধী হয়েও জিতু রায়ের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় সরকারি যে কোনো ধরণের সহযোগিতা করতে সমাজসেবা অধিদপ্তর পাশে থাকবে। আমরা প্রতিবন্ধীদের সমাজের মুল ধারায় নিয়ে আসতে কাজ করছি। সেক্ষেত্রে জিতু রায়ের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে সবধরণের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হরিজন সম্প্রদায়: পথের ধারেই বেড়ে ওঠে ওরা

সাহিনা সুলতানা

প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সময় দেখি- গাড়ির কোলাহলকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার ধারে, ময়লার স্তূপে বসে আছে কিছু মানুষ। রাস্তার ধুলোবালি মেখে চলছে তাদের খাওয়া-দাওয়াও, হাসি ঠাট্টা, গল্প-গুজব আর ঢলাঢলি। রাস্তা দিয়ে কত মানুষ হেঁটে যায় তাতে ওদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। রাস্তার ধারে বসেই পলিথিন অথবা বাড়ি থেকে আনা গ্লাসে চা পান করেন। হোটেল মালিকরা তাদের দামি পাত্র ব্যবহার করতে দেয় না।

যাদের কথা বলছিলাম, তারা দলিত বা হরিজনরা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। রংপুর মহানগরীর ব্যস্ততম সড়ক সেন্ট্রাল রোড আইডিয়া প্রকাশনের সামনে এদের এখান থেকেই ওদের কাজের ডাক আসে জমায়েতের স্থান।

হরিজনরা হোটেল থেকে খাবার কিনে খেলেও হোটেল ম্যানেজার সরাসরি হাতে হরিজনের টাকা স্পর্শ করেন না। ওরা টেবিলে রেখে দেয়-এরপর ওরা চলে গেলে ম্যানেজার টাকা ড্রয়ারে রাখেন।

এক মিটিংয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করার বিষয়ে আলোচনা চলছিল- আমার কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা হলে, আমি হরিজনদের নাম প্রস্তাব করি। উপস্থিত সভার লোকজন-হায় হায় করে উঠলেন! কী যেন অন্যায় কথা বলে বসলাম! মানে তাদের সাহায্য করতেও লোকের মধ্যে এক প্রকার জাত বৈষম্য আছে।

হরিজনরা নিজেদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। যখন স্যানিটেশন পরিষ্কার ব্যবস্থা মানুষ নির্ভর ছিল। তখন তারাই ছিল একমাত্র ভরসা। ভোরবেলায় তাদের হাকডাকে ঘুম ভেঙে যেতো। একটা বালতি, ঝাড়ু হাতে এখনও ঘুরে বেড়ায় ওরা। হরিজনদের ধর্মিয় ও সামাজিকভাবে নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজের সকল নিচু স্তরের কাজগুলো তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়।

ব্রিটিশ আমলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (১৮৩৮-১৮৫০), চা-বাগানের কাজ (১৮৫৩-৫৪), জঙ্গল কাটা, পয়োনিষ্কাশন প্রভৃতি কাজের জন্য ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কিছু হতদরিদ্র-দলিত মানুষকে এ দেশে আনা হয়। তাদের থাকতে দেওয়া হয় কাজের জায়গায়, কলোনিতে। তাদের চিহ্নিত করা হয় হরিজন হিসেবে। সেলুন, রেস্তোরাঁ, রেলের কামরা, স্কুল—কলেজ পরিষ্কার করবে এরা।

বলা হয়, কথিত এসব ‘অচ্ছুত’ মানুষকে সম্মানজনক অবস্থান দেওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাদের নাম দিয়েছিলেন হরিজন। মানে ঈশ্বরের সন্তান।

নিশুতি রাতে অনেকটা জনমানবশূন্য ফাঁকা রাস্তায় কাজ করেন হরিজন এই পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। কোথাও মধ্যরাতে, কোথাও শেষ রাতে শহরগুলোকে ঝেড়ে–মুছে দিনের উপযোগী করে তোলেন তাঁরা। নিভৃত সেই কর্মপরিবেশ নানা অপরাধীর মুখোমুখি হয়ে যেতে হয় তাঁদের।

ভারতের কেরালায় পুলিশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শুধু নিরাপত্তাই দেয় না, নারী কর্মীদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার কাজটাও করে থাকে। খুঁজলে উদাহরণ হয়তো আরও পাওয়া যাবে।

শুধু অবাঙালি দলিত হরিজন নন; দেশে স্থানীয় দলিতরাও আছেন। বাঙালি দলিতরাও অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। চর্মকার, মালাকার, কামার, কুমার, জেলে, পাটনী, কায়পুত্র, কৈবর্ত, কলু, কোল, কাহার, ক্ষৌরকার, নিকারী, পাত্র, বাউলিয়া, ভগবানীয়া, মানতা, মালো, মৌয়াল, মাহাতো, রজদাস, রাজবংশী, কর্মকার, রায়, শব্দকর, শবর, সন্ন্যাসী, কর্তাভজা, হাজরা প্রভৃতি সম্প্রদায় আজ আমাদের স্বাধীন দেশে অস্পৃশ্যতার শিকার হচ্ছে।

সর্বোপরি ওরা ভালো নেই-ওদের পূর্ণবাসন প্রয়োজন। সম অধিকার দরকার সকল ক্ষেত্রে। সুযোগ পেলে ওরাও দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। সোনার বাংলাদেশ গড়তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদের।

বিয়ে সংস্কৃতি: রংপুর অঞ্চল

ময়নুল ইসলাম

সংস্কৃত সুতিকার গোপালের মতে, 'পিত্রাদি কর্তৃক কন্যোৎসর্গান্তরং বরংস্বীকারো বিবাহ।' অর্থাৎ পিতা কর্তৃক কন্যা সম্প্রদান এবং কন্যা কর্তৃক বর বরণের নাম বিয়ে। অতীতে বিবাহ শব্দটিকে 'কৌনা জোড়া' বলে অভিহিত করা হতো। একটি মনসা মঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথিতে কৌনা জোড়া শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। লখাই বা লখিন্দরের বিবাহ স্থির হলে বাবা চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহের জন্য তৈরি হলেন।

'কালাই পাইয়া সাধুর আনন্দিত মন
কৌনা জুড়িবারে সাধু করিল গমন'

যাহো বিশ্বব্যাপী বিবাহপ্রথার প্রচলন বিদ্যমান। জৈব প্রয়োজনীয়তা বিয়ের একমাত্র লক্ষ্য নয়। এর অন্তরালে নিহিত রয়েছে নর-নারীর জীবনের নিরাপত্তা ও বংশরক্ষার বাসনা। বলা যায়, প্রজনন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার একটি সামাজিক চুক্তির নাম বিয়ে। বিয়ে জীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই বিয়ে সম্পাদন প্রক্রিয়ার রীতিনীতিতে রয়েছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিয়ের সকল প্রক্রিয়া ও রীতিনীতি একরকম নয়। এখানে রংপুর অঞ্চলের বিয়ে প্রথায় প্রক্রিয়াগত রীতিনীতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। বিয়ে বিষয়টি মূলত কোন জায়গায় হুট করে সম্পন্ন হয় না। এরও নিজস্ব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান রেওয়াজ, পদ্ধতি রয়েছে। সাধারনত বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর হলে বিবাহপোযোগী বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের মতো এতদাঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রচলন এখনও কোথায় কোথায় রয়েছে। তবে সম্ভবত বাল্যবিবাহ প্রথার কুফল সম্পর্কে অত্রাঞ্চলের অধিবাসী অধিক সচেতন হওয়ায় বাল্যবিবাহের ক্রমাবনতি হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও বিয়ে সংঘটনে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর শারীরিক গঠন, গায়ের রং, পারিবারিক সাদৃশ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, বংশমর্যাদা- এ সব কিছু মাথায় রাখতে হয়। সবকিছু মিলিয়ে পাত্র-পাত্রী মিল করা বেশ দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার।

সাধারণত এই দুঃসাধ্য কাজটি করে থাকেন একজন ঘটক। ঘটক অর্থ ঘটনার সংঘটয়িতা বা যে ঘটায়। পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে বিয়ে সম্পাদনে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিই হচ্ছেন ঘটক। অতীতে ঘটককে বলা

হতো কাড়োয়া বা বাড়িখাটাও এবং এদের বৃত্তিকে বলা হতো কারুয়াগিরি। পাত্র ও পাত্রীর মিলন ঘটানোই ছিল এদের কাজ। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে অনেকেই ঘটকালির কাজটিকে ইন্টারনেটভিত্তিক করে নিচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে এখন ঘরে বসেই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রোফাইল সাবমিট করে অন্যদের প্রোফাইল দেখে নিজেরাই সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিয়ের প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তবে রংপুর অঞ্চলে এটি এখনও খুব বেশি জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠেছে বলে মনে হয় না। অত্রাঞ্চলে অধিকাংশ বিয়ে এখনও ঘটকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। পেশাদার ঘটকেরা বিভিন্ন মাধ্যমে বর বা কনের নাম ঠিকানা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য তথ্যাদি যোগাড় করে তা পাত্র ও পাত্রী পক্ষের অভিভাবককে অবহিত করেন এবং তাঁদের পছন্দ ও সম্মতিক্রমে বিয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপেশাদার ঘটক, পরিচিত, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমেও বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হতে দেখা যায়। যার মাধ্যমেই হোক বিয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে সংঘটিত হয় কনে দেখা পর্ব।

অতীতে কনে দেখার পর্বটি এখনকার মতো অত সহজ ছিল না। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি আপলোড করে বা শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, চিড়িয়াখানা বিনোদন পার্কে খুব সহজেই বিয়ের পাত্রীকে দেখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী একসাথে চলাফেরা করার সুযোগ থাকে। বরপক্ষের অভিভাবক বা তাঁর প্রতিনিধি কনেপক্ষের বাড়িতে কনে দেখতে যায়। কনে দেখতে যাওয়ার সময় মিষ্টান্ন, ফলমুল নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ এ এলাকায় দীর্ঘদিনের। অতীতে বর্তমানের মতো মিষ্টি বা ফলমুল পাওয়া যেতো না। তাই সেসময় কনে দেখতে গেলে পান সুপারি, চিনি বাতাসা ইত্যাদি নিয়ে কনে দেখতে যাওয়া হতো তাই বিয়ের এপর্বের নাম ছিল পানচিনি পর্ব। বর্তমানে কনে দেখা পর্বে আগত অতিথিকে বিভিন্ন ফলমুল, মিষ্টি, হাতে তৈরি খাবারসহ বাহারি নাস্তায় বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চা নাস্তা খাওয়া শেষে কনে দেখার মুল পর্ব শুরু হয়।

কনেপক্ষ তাদের আদরের মেয়েটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে-গুজিয়ে বরপক্ষের লোকদের সামনে হাজির করেন। সাধারণত উত্তম সাজে হবু কনে বা পাত্রী বাটায় পান সুপারি নিয়ে বরপক্ষের নিকট হাজির হয়। এখনও গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো কনের মাথায় লম্বা ঘোমটা থাকে। কথা বলে মৃদুস্বরে। বরপক্ষ কর্তৃক এসময় কনেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

কনের সৌন্দর্য্য, উচ্চতা, চুলের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয় খুঁটিয়ে দেখা দেশের

অন্যান্য এলাকার মতো এতদাঞ্চলে চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হয়েছে অনেক আগে থেকে।

এসময় মেয়ের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নসহ বিভিন্ন ধরনের ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়।

অতীতে কনে দেখা পর্বে বরপক্ষ শুধু প্রশ্ন বা ধাধা জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হতো না, মেয়ের চুল কতটা লম্বা বেণি খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে হতো বরপক্ষকে। মেয়ে ল্যাংড়া কি-না তা দেখার জন্য হাঁটানো হতো তাকে। পায়ের নিচে পানি দিয়ে জায়গাটাকে পিচ্ছিল করে তাকে হাঁটতে বলা হতো। পরীক্ষা করে দেখা হতো পিচ্ছিল জায়গায় মেয়ে ঠিকমতো হাঁটতে পারে কি-না। হাতের কোষে পানি দিয়ে দেখা হতো আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি পড়ে কি-না। দাঁতগুলো মুক্তার মতো ঝকঝকে, না আঁকাবাঁকা, দেখার জন্য হাঁ করতে বলা হতো মেয়েকে। পায়ের কাপড় সরিয়ে দেখা হতো দুই পায়ের পাতা। খুঁটিয়ে দেখা হতো আঙুলগুলো ঠিক আছে কি-না। গায়ের রঙ কালো, শ্যামলা, না ফর্সা, হাতের কবজি পর্যন্ত দেখিয়ে প্রমাণ দিতে হতো মেয়েকে। লেখাপড়া জানলে হাতের লেখা দেখার জন্য তার ঠিকানা লিখতে বলা হতো। ভালো রান্নাবান্না করতে পারে কিনা, কত রকমের আচার ও পিঠা বানাতে পারে, শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করতে পারবে কিনা এ ধরনের প্রশ্নও করা হতো। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, বরপক্ষের পছন্দ হলে পানের বাটায় দিত নগদ টাকা। কিংবা আঙুলে পরিয়ে দিত আংটি অথবা নাকে নাকফুল।

কনে পছন্দ হলে বিবাহের মুল আলোচনা শুরু হয়। নিজের বাড়িতে পাত্রী দেখানোর ক্ষেত্রে একই দিনে কিংবা অন্যত্র পাত্রী দেখানোর ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মতামতের ভিত্তিতে একটি নির্ধারিত দিনে কনে পক্ষের বাড়িতে বিবাহের মূল আলোচনা করা হয়।

বিবাহের মূল আলোচনায় দেনমোহর, যৌতুক, বিবাহের তারিখ, বিবাহ অনুষ্ঠানে বরযাত্রীর সংখ্যা, বিবাহ পড়ানোর খরচ স্থানীয় ভাষায় খুলি খরচ ও অন্যান্য বিষয় থাকে।

আলোচনার মুল বিষয়বস্তু হিসেবে দেনমোহর ও যৌতুকের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। অনেক ক্ষেত্রে যৌতুক কী হবে বা বরপক্ষকে কী দেয়া হবে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে বা ঘটকের মাধ্যমে বরপক্ষকে নিশ্চিত করা হয়।

বাংলাদেশে বিয়েতে যৌতুক দাবি করার বিষয়টি আইনে নিষিদ্ধ হলেও, অনেকটা গোপনেই যৌতুকের লেনদেন হয়। কনেপক্ষও বেশিরভাগ সময়

কনের কল্যাণের কথা চিন্তা করে যৌতুক প্রদান করে। যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা, মোটরসাইকেল, গাড়ি ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্ণের গহনা ইত্যাদি দেয়া হয়। অত্রাঞ্চলে যৌতুক না দেওয়ার কারণে অনেক বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটেছে। বাস্তবদৃষ্টে যৌতুকবিহীন বিবাহ বলা যেতে পারে অত্রাঞ্চলে বিরল।

মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুকের পরে আলোচনার বিষয়বস্তুতে দেনমোহর বিষয়টি আসে। দেনমোহর বিবাহের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয়। মোহর শব্দটি আরবি, মহর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দান-অনুদান।

'মহর' হলো বিয়ের সময় বর কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত সম্মানী; যার মাধ্যমে সে স্বামীর অধিকার লাভ করে। মহর নগদে প্রদান করা উচিত। উভয় পক্ষের সম্মতিতে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাকিও থাকতে পারে। তবে তা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। কিন্তু অত্রাঞ্চলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর কর্তৃক মোহরানা পরিশোধ করা হয় না। স্ত্রী বেঁচে থাকতে স্বামীর মৃত্যু ঘটলে স্ত্রী কর্তৃক দেনমোহর মাপ করে দেওয়া হয়। দেনমোহর বিষয়ক আলোচনার পর একে একে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ, প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে বরযাত্রীর সংখ্যা, বিয়ে পড়ানো খরচ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে যাওয়া ও তাকে আংটি বা ঘড়ি পড়ানোও অঞ্চলে রেওয়াজ বলা যেতে পারে।

বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হলে কনের অভিভাবক বিবাহের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় হিসাব করার পর তা কীভাবে যোগাড় করা যায় তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হন। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে একমাত্র জমি বিক্রি, বা অন্য কোনোভাবে জমানো টাকা কিংবা বিভিন্ন বেসরকারি আর্থিক সংস্থা থেকে টাকা লোন (যা স্থানীয় ভাষায় কিস্তি তোলা) করে বিয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিয়ের ব্যয় বলতে বাড়ির সদস্যদের জন্য পোশাক-আশাক, বরের নতুন পোশাক, কনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও বিয়ের দিন প্রীতিভোজের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার, অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াতের কার্ড ও অন্যান্য বিষয় থাকে। তবে নিকট অতীতে রংপুর জেলার হারাগাছ অঞ্চলে বিড়ি ফ্যাক্টরির বিড়ি নম্বর বিক্রি করে টাকা যোগাড় করে মেয়ের বিয়ের টাকা যোগাড় করা হতো।

বিয়েকে কেন্দ্র করে বর এবং কনে দুই পক্ষেরই বাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিয়েকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে হাতে পায়ে মেহেদি মাখার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। সাধারণত মেহেদি গাছের কচি পাতা বাটা মেহেদি অথবা বাজার থেকে কেনা মেহেদী উৎসবমুখর পরিবেশে কনেসহ কনের বাড়ির ছোট ভাই

বোন ও আগত আত্মীয়রা হাতে পায়ে বিভিন্ন আল্পনায় আঁকে কেউ কেউ মেহেদি পাতার সঙ্গে খয়ের, পোড়ামাটি ও কচুর ডাঁটা একসাথে চূর্ণ করে মিশ্রণ করে। বিয়ের বা গায়ে হলুদের আগের সন্ধ্যায় মেহেদি দেয় মেহেদী সন্ধ্যা নামে পরিচিত। বিয়ের পর্বটি এ কাজের সাথে সাথে মেয়েরা গীত গায় ও নাচে। গীতগুলো এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত।

মেহেদী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিয়ে উপলক্ষে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান বাঙালির একটি অপরিহার্য সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণত বিয়ের দিন বা বিয়ের আগের দিন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা হয়। বর ও কনে দুই পক্ষই মূলত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। গায়ে হলুদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো কাঁচা হলুদ। বরপক্ষ বা কনেপক্ষ থেকে অপরপক্ষের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপহারসামগ্রী পাঠানো হয় এ অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি সাধারণত যে পক্ষ আয়োজন করে তারাই উপস্থিত থাকে। অপর পক্ষেরও দু-একজন অতিথি উপহার সামগ্রী নিয়ে এই আচারে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বর বা কনেকে একটি পাটি অথবা জলচৌকির উপর বসানো হয়। ছোট-বড় সবাই তার গালে বা কপালে হলুদ বাটা মাখিয়ে দেয়। হলুদ বাটা মেখে দিয়ে তার হাতে দেয়া হয় ও অন্যান্য উপহার প্রদান করে টাকা। বর বা কনের সামনে রাখা মিষ্টি ও ফলমূল জাতীয় দ্রব্যাদির কিছু অংশ তাকে খেতে দেওয়া হয়। গায়ে হলুদে যে উপকরণগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় তা হলো- ডালা কুলা, হলুদের বাটি, হলুদের পাটি, ঢাকনা, চন্দন, পালকি, সোহাগপুরি, চন্দন তেল, সোন্দা, মেহেদি, আপসান, মেহেদির তোয়ালে, হলুদের রুমাল। শালবন মিস্ত্রিপাড়া, রংপুর এর ওয়াহিদা ইয়াসমীন জানান অষ্ঠানে তাঁর গায়ে হলুদ। বরপক্ষ থেকে গরুর গাড়িতে একটি ডালায় করে শাড়ি, হলুদ, মেহেদি, পান, মাছ ও অন্যান্য কসমেটিকস উপহার হিসেবে বরের চাচাতো, মামাতো ও নিজের বোনেরা নিয়ে এসেছিল। পানের সাথে টাকা দিয়ে মাছের মুখ ঢেকে দিয়েছিল। তার হলুদ মাখানো ও গোসল করানোর সময় বিয়ের গীত পরিবেশন করা হয়েছিল।

বিয়ের অনেক ধরনের প্রস্তুতির মধ্যে বিয়ের গেইট হলো একটি। বর্তমানে বিয়ের বাড়িতে ৫ তলা, ৭ তলা বাহারি ডিজাইনের চোখধাঁধানো গেইট দেখা গেলেও নিকট অতীতে এ অঞ্চলে কলা গাছের গেট, গায়ের চাদরের গেট, বাঁশের পাতলা বেড়ার গেট, সুতলিতে রঙিন কাগজের গেট প্রচলিত ছিল। রাতের বেলা বরযাত্রীর আগমনের অপেক্ষায় এসব গেটে হ্যাচাক বাতি, হারিকেন বাতি রাখা হতো। বেশিরভাগ বিয়ে বাড়ির গেইট দেওয়ার

উদ্দেশ্য হলো বরযাত্রীকে আটকে টাকা আদায় করা। বরযাত্রী আসার সময় হলে গেটে ফিতা বেঁধে গেটের সামনে টেবিল বসানো হয়। টেবিলের ওপর থাকে মিষ্টি, শরবত, ফুলের পাপড়ি। সাধারণত গেটের সামনে হবুবরের বেশ কয়েকজন শালী সম্পর্কীত আত্মীয়রা থাকে যারা বরযাত্রীর প্রবেশের জন্য টাকা দাবী করে। অনেক সময় ধাধা ধরা, ধাধার উত্তর দেয়া, কৌতুক, একে অপরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাসহ প্রবেশ মূল্য নিয়ে দামাদামি হয়। একপর্যায়ে অভিভাবকের হস্তক্ষেপে প্রবেশমুল্যের রফাদফা হলে বর বা বরের ভগ্নিপতি কাঁচি দিয়ে ফিতা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় মিষ্টি বা শরবত খাওয়ানো হয়। বিয়েরর গেট নিয়ে রংপুরের হারাগাছ সরকারি কলেজ ছাত্রী মাহফুজা সিন বলেন, বিয়ে বাড়িতে যদি গেইট দেওয়া না হয়, তাহলে বিয়েটায় যে একটা সৌন্দর্য আছে সেটা ফুটে ওঠে না তাই বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠানে একটি গেইট দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে উত্তরাঞ্চলে বিয়ের গেইটকে কেন্দ্র করে বিয়ে ভেঙে যাওয়া, দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, কথাকাটাকাটি, তুমুল ঝগড়া লাগারও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানটিই বাংলাদেশের বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বরপক্ষ পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সমন্বয়ে গঠিত বরযাত্রী নিয়ে উপস্থিত হয়। সাধারণত অনুষ্ঠানে বর ও কনের জন্য আলাদা আলাদা স্থান থাকে। বর গিয়ে তার জন্য নির্ধারিত আসনে আসীন হয়। মুসলমানদের বিয়েতে এসময় একজন কাজীর দ্বারা 'আক্দ' পড়ানো হয়। আক্দ হলো বর ও কনের পারস্পরিক সম্মতি জানার সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রথমে বর ও কনেপক্ষের মুরব্বিদের উপস্থিতিতে বিয়েতে কনের সম্মতি জানা হয় এবং পরে একই কাজীর দ্বারা বর ও কনেপক্ষের মুরব্বিদের উপস্থিতিতে বরের সম্মতি জানা হয়। এভাবে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হিন্দু বিয়ে রীতিতে পুরোহিতের উপস্থিতিতে ৭ চক্কর দিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এ অঞ্চলে বিয়ে উপলক্ষে প্রীতিভোজ বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। এ অনুষ্ঠানে বরপক্ষ ছাড়াও কনের অভিভাবক পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়েদের বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দেওয়া হয়। অতিথিরা সাধ্যমত উপহার নিয়ে দাওয়াত খেতে আসে। অবস্থানুযায়ী খাওয়ার আয়োজন করে থাকেন। বিয়ের খাবারের মেনুতে সাধারণত পোলাও, বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, কোরমা, কাবাব, রেজালা, বোরহানি থাকে। মূল খাবারের শেষে মিষ্টান্ন হিসেবে দই, পায়েস, জর্দা, মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। কোথাও কোথাও খাওয়া শেষে পানেরও আয়োজন থাকে। আবার বর আগমনের সময় বরকে

শরবত ও মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। বরের জন্য আলাদাভাবে খাবারের থালা সাজানো হয়। খাওয়ার আগে শালীরা বরের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেন। এজন্য তারা বরের কাছ হতে সম্মানি আদায় করে থাকেন। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কমিউনিটি সেন্টার আর ক্যাটারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতায় এই আয়োজন সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রীতিভোজ সম্পর্কে আদিতমারী লালমনিরহাটের ৬৫ বছর বয়সী রুবিনা বেগম জানান, তাঁর বিয়েতে বরপক্ষের লোকদের বাসায় রেখে সাতদিন পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছিল। সেসময় বরপক্ষকে এভাবে খাওয়ানো এ সম্পর্কে একটি আচার ছিল বলে তিনি জানান। প্রীতিভোজের এরকম আচারকে পথফিরানী বলা হতো।

বিয়ে পড়ানোর সময় বা পরে কিংবা ভোজন পর্ব চলাকালীন বরের জুতো লুকিয়ে রাখার মতো উত্তেজনার জিনিস আর কী বা আছে! বিয়েতে আসা বরকে লজ্জায় ফেলতে-বরের জুতা-সরিয়ে ফেলায় এ অঞ্চলের বিয়ের কীতিয় অংশ কনেপক্ষ মুখত জুতো লুকানোর কাজটি করে। সাধারণত বরের শালা বা শালীরা সুযোগ বুঝে একটি বা দুটো জুতোই সরিয়ে রাখো করে। বরপক্ষ থেকে জুতো ফেরত চাইলে দাবী করা হয় মোটা অঙ্কের টাকা। সাধারণত বরের ভগ্নিপতির বা বন্ধুদের সাথে দরকষাকষি নিয়ে ঘটে বাকবিতন্ডা। এমনকি জুতো ফেরতের দাবী করা টাকা নিয়ে বিয়ে অনুষ্ঠানে অনেক ঝগড়া বা বিয়ে ভেঙে যাওয়ারও ঘটনাও অত্র এলাকায় ঘটেছে।

ভোজন পর্ব শেষে সঁপে দেওয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। সঁপে দেওয়াকে কেন্দ্র করে একটি আবেগঘন আবহ তৈরি হয়। কনের মা বাবাসহ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে। সঁপে দেওয়া সম্পন্ন হলে কনের সাথে বয়স্কা দাদী নানীকে সাথে দেয়া হয়। সাথে থাকা এরকম দাদী নানীকে বলে দানীবুড়ি। সাধারণত কনে নতুন পরিবেশে নতুন বধুর কাজকর্মে দানিবুড়ি পরামর্শ দেয়। রংপুর অঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় দানিবুড়িকে নতুন কাপড় দিয়ে খুশি করা হয়। কিন্তু ইদানিংকালের বিয়েতে দানীবুড়ির পরিবর্তে চাচাতো ফুফাতো বা খালাতো ছোট ভাই বোন কনের সাথে পাঠানো হয় বলে দৃশ্যমান হচ্ছে।

নতুন বৌ আসলে সাধারণত পরের দিন সকাল থেকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নতুন বৌ দেখার জন্য গ্রামের মহিলারা একে একে বরের বাড়িতে ভীড় জমায়। নতুন বৌয়ের হাতে পান সুপারি খায়। বৌ দেখে গ্রামের মহিলারা নিজেদের মধ্যে বৌ এর সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলাবলি করে।

রংপুর অঞ্চলের বিয়ে সংস্কৃতিতে উপরোল্লিখিত রীতিনীতি ছাড়াও বরপক্ষের দিক হতে বৌভাত অনুষ্ঠান কনে পক্ষের দিক হতে প্রথম দাওয়াত ২য় দাওয়াতের প্রচলন দেখা যায়। তবে অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারে ও ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চবিত্ত পরিবারেও উপরোল্লিখিত ব্যত্যয় ঘটে।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত রীতিনীতির মধ্যে যৌতুক প্রথা ও প্রীতিভোজের কারণে নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারে এ অঞ্চলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা বা বিবাহোপযোগী কন্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য: শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ২০১৪
বাঙ্গলার ইতিহাস: কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বইপত্র, ২০১৯
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস : এম এ রহিম, বাংলা একাডেমি,
বাংলার লোকসংস্কৃতি: ওয়াকিল আহমদ, গতিধারা, ২০১২
নির্বাচিত প্রবন্ধ : শামসুজ্জামান খান, বিজয় প্রকাশ
বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, দে'জ পাবলিশিং (ভারত), ২০১৬
বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ : যতীন সরকার, চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৬
বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিবাহ: মোমেন চৌধুরী, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫

কাঁটাতারের ওপারে

উত্তরবঙ্গ-ইতিহাস, নামকরণ ও শিল্পের অনুসন্ধানে

দেবদত্তা বিশ্বাস

উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি ও ধাত্রীভূমি। বৃহত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বে শ্বেতশুভ্র হিমানীর পাদদেশে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাত মাথায় নিয়ে উত্তরবঙ্গ তার সবুজ সেনানীর ঘেরাটোপে দিনের পর দিন এক বিশুদ্ধ প্রাণবায়ুর জোগান দিয়ে প্রত্যেক উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এক অফুরান জীবনী শক্তির ভান্ডার।

বৈদিক যুগের পুণ্ড্রবর্ধন আজকের বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। পৌরাণিক ত্রিস্রোতা উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। ত্রিস্রোতার অন্যতম ধারা করতোয়ার পশ্চিম তীরে ঘোড়াঘাটের কাছে অবস্থিত মহাভারতীয় বিরাট রাজার রাজধানী। পঞ্চপান্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন এখানেই। বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে।

নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্॥
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়া তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ববস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাত সর্ববশাস্ত্রেসু নিশ্চিত॥
ত্রিংশদ্ যোজেন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনং।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুক্তসম।
-যোগিনী তন্ত্র, একাদশ পটল।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে বহু প্রাচীনকাল থেকে উত্তরবঙ্গ নিজস্বতায় উপমহাদেশের এককোণে সমুজ্জ্বল। দক্ষিণী চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলও তার বঙ্গদেশ আক্রমণকালে এই অঞ্চলকে 'উত্তরীয় লারম' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মানচিত্র আঁকতে গিয়ে উত্তরবঙ্গকে করতোয়া নদীর পূর্বসীমা, মহানন্দার পশ্চিম সীমা, তিস্তার উত্তর সীমার মধ্যবর্তী অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ভূভাগের দক্ষিণে গঙ্গা নদী। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন 'রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলা লইয়া আধুনিক রাজশাহী বিভাগ গঠিত। তাহাই উত্তরবঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহার কিয়দংশ মিথিলায় কিয়দংশ বরেন্দ্রের এবং কিয়দংশ পুরাতন কামতাবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগের সময় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের সাথে যুক্ত হলেও প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় সদর দপ্তর জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়। কারণ ১৮৭৫ সাল থেকে জলপাইগুড়ি রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় সদর দপ্তর ছিল। ১৯৬৩ সালের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নতুন বিভাগ খোলেন। এই বিভাগের নাম হলো জলপাইগুড়ি বিভাগ। ভৌগলিক ক্ষেত্র বিচারে এতদিন পূর্ববঙ্গের তুলনায় ভারতস্থিত উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গ শব্দটির ব্যবহার বেশি ছিল। ১৯৬৩ সালের পর থেকে প্রশাসনিক বিভাজন শুরু হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ স্থিত উত্তরবঙ্গে আটটি জেলা বর্তমান।

উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের চল: উত্তরবঙ্গ শব্দের অস্তিত্বের প্রাচীত্ব খুঁজতে গেলে দেখা যায় পৌণ্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্র, উত্তরীয়, উত্তর দেশ, কামতাবিহার জাতীয় শব্দগুলি ইতিহাসের পাতায় রূপান্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ শব্দে পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ শব্দের প্রথম লিখিত ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১৮৮০ সাল) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। কোচবিহারের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ শব্দটির বারংবার প্রয়োগ করেছেন ইতিহাস প্রণেতা ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৭ সালে রংপুর থেকে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ হিতৈষী নামক এক পাক্ষিক পত্রিকায় ও উত্তরবঙ্গ শব্দটির ব্যবহার হয়। সাংগঠনিকভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ (১৯০৫ সাল) এবং ১৯০৮ সালে এই পরিষৎই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন করেন। যে প্রতিষ্ঠানটি পরোক্ষভাবে উত্তরবঙ্গ শব্দ ব্যবহারে সহায়তা করেছিল তা হলো বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি (১৯১০ সাল)। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে নর্দান বেঙ্গল শব্দ প্রয়োগের এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নর্দান বেঙ্গল টি কর্পোরেশন (১৮৮২ সাল) নামে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা স্থাপনের সময়। এছাড়াও নর্দান বেঙ্গল মাউন্টেড রিফলস নামে এক আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিলেন ইংরেজ সরকার ১৯০৮ সালে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গে ১৯৫২ সালে প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের সময় উত্তরবঙ্গের সংসদীয় কেন্দ্রের নাম ছিল নর্থ বেঙ্গল পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউন্সি। ১৯৬০ সালে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন নামে প্রথম সরকারি সংস্থা স্থাপিত হয়। এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ

উন্নয়ন তহবিল, উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ একে একে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও শিল্প অনুসন্ধান: উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বপ্রথম এর ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা জরুরি। ভৌগলিকভাবে আমরা যে অঞ্চলকে উত্তরবঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করি তার জন্ম ১৮৬৪-৬৫ সালের দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধের ফলেই আজকের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স ও দার্জিলিংয়ের তরাই অঞ্চল বঙ্গদেশে প্রশাসনিকভাবে যুক্ত হয়। এই নতুন জনপদের নতুন পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙাল সম্প্রদায়, নানান উপজাতি, রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রাদায় মিলেমিশে জন্ম নিল নতুন উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ ভাগে মালদহ, দিনাজপুরে এই জাতীয় সমস্যা ততটা ছিল না। বর্তমানে উত্তরভাগে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেশভাগেরণ পরিণতি। তবে মিশ্র সংস্কৃতি বোধ নিয়েই উত্তরবঙ্গের শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে তার নিজস্ব ছন্দেই। এই নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করাই যাক।

চা শিল্পের অতীত ও ভবিষ্যৎ: উত্তরবঙ্গ নামের সার্থকতা খুঁজতে আপামর জনসাধারণের মানসপটে যে ছবিটি সর্বপ্রথম ভেসে ওঠে তা অতি অবশ্যই উঁচু নিচু পাহাড়ি জমিতে চা বাগিচার সমারোহ। ইউরোপীয় বাজারে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অসমের জঙ্গলে যে উপদেয় পানিয়ের গাছটি খুঁজে পেয়েছিল তার আশীর্বাদ আজও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির এক বিশেষ স্তম্ভ। দার্জিলিং পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে অত্যন্ত সুগন্ধি চা প্রস্তুত হয় তার নাম বিশ্বজোড়া। নিমতিঝোরা, তুরতুরি, মকাইবাড়ি, রাধারানীসহ প্রচুর চা বাগান এখন বিশ্বের দরবারে পরিচিত নাম। ডুয়ার্সের বাগানগুলিতে ক্রাসিং টিয়ারিং এন্ড কার্লিং (C.T.C) যন্ত্রে যে লাল দানাদার চা প্রস্তুত হয় তা সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর গুণ সম্পন্ন। তবে চা বাগানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সর্বপ্রথম কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান ও তার নিরসন করা জরুরি। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ও জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নুন্যতম চাহিদাগুলো পূরণ করার দিকে নজর দিতে হবে।

বন্যপ্রাণ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ: বৈকুণ্ঠপুর, লাটাগুড়ি, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, চিপড়ার অরণ্যে নির্ভীক চিত্ত বন্যপ্রাণ ও মাদার রুদ্রপলাশ, শিমুল, শাল, সজনের অফুরন্ত সম্ভার বহুদিন থেকেই উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের ভরকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান তো বটেই, ভবিষ্যতেও যা নতুন

নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখিয়ে চলছে অবিরত। প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ষায় যে পরিমাণ বৃষ্টি নিয়ে আসে তা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক জলের ঘাটতি মেটায় তাই নয় উপমহাদেশীয় অনেক বড় বড় ঘন সবুজ অভয়ারণ্য সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। বন্যপ্রাণ ও সবুজ বনানী উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির উন্নয়নের অপর একটি স্তম্ভ। লোকগানে বন্যপ্রাণ প্রকাশ পায় এইভাবে- 'পানি খাবা গেল বাছা তিস্তা নদীর কূলে রে/হায় বাছা সৈয়দ রে/পানি খাইতে বাঘে ধরিয়া খালেক রে/হায় বাছা সৈয়দ রে।'

বর্তমান উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত পর্যটন স্থান ছাড়াও অপেক্ষায় স্বল্প পরিচিত প্রাকৃতিক নানা সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর পর্যটন স্থানগুলি খুব অল্প সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। এই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হোমস্টে ব্যবসা। চিলা পাতার জঙ্গল হোক বা দার্জিলিংয়ের নির্জন পাহাড়ি গ্রাম হোমস্টে ব্যবসা স্থানীয় মানুষদের অর্থনীতিকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রজাপতি ও পাডলিং, এক নতুন অনুসন্ধানঃ জীবন চক্রের বৈপরীত্য প্রজাপতিকে অন্য সমস্ত প্রাণী থেকে অনন্য করে তুলেছে। লার্ভা বা পিউপা অবস্থা প্রাপ্ত একটি প্রাণের সাথে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির সৌন্দর্যের এতটাই তারতম্য যে সাধারণের কাছে তা চিরকাল ভীষণ আকর্ষণীয়। উল্লেখ্য লার্ভা অবস্থায় প্রজাপতি নিজের জীবনের বেশিরভাগ শক্তি সঞ্চয় করে থাকলেও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তার আসল কাজ বংশবৃদ্ধি করা। এই সময় তার প্রয়োজন লবণ ও খনিজ। যে স্থানে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান বেশি পাওয়া যায় সেখানেই তারা দলে দলে ভিড় করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই জমায়েতকে পাডলিং বলা হয়।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট, পুখুরি লেকের পাশে, পূর্ব জলদাপাড়ার সিসামারায়, চিলাপাতার অরণ্যে বা সুনতালিখোলায় নির্জনে এই পাডলিং দেখতে আজ অনেক পর্যটক ভিড় করেন। এশিয়া স্যাংচুয়ারি নামে একটি সংস্থার হিসেবে পাডলিংকৃত প্রজাপতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০ ছাড়িয়েছে। উল্লেখ্য এক একটি প্রজাতি এক এক ধরনের গুল্ম, গাছে পাতায় ডিম পাড়ে। উত্তরবঙ্গের যে ধরনের গাছ ও তার বিভিন্নতা দেখা যায় তা অন্য কোনো স্থানে দেখা মেলে না। তাই পাডলিং আজ একটি নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প।

পর্বতারোহণ, এডভেঞ্চার স্পোর্টস, তার নেশায় উত্তরবঙ্গঃ পর্বতারোহণ যে একটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস হতে পারে তা অষ্টাদশ শতকের আগে ঠিক জানাই ছিল না। মানুষের জানবার অনুসন্ধিৎসা তাকে সুউচ্চ শিখরে

পৌঁছে দেয় একসময়। গত শতকের মাঝামাঝি থেকে হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতে আরোহণের যে প্রবণতা শুরু হয় তাতে সিলমোহর পরে ২৯ শে মে ১৯৫৩ সালে। তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারির এভারেস্ট জয়ের মধ্যে দিয়ে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা পূরণ করার উদ্দেশ্যে দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এর অবদান অনেক বড়।

১৯৫৪ সালে স্থাপিত বিশ্বের প্রাচীন এই সংস্থাটি ইতিমধ্যে দেশি-বিদেশি পঞ্চাশ হাজার অভিযাত্রীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। শুধু প্রশিক্ষণই নয় এখানে রয়েছে সমৃদ্ধ প্রদর্শনশালা ও গ্রন্থাগার। ২৮ দিনের প্রাথমিক কোর্সের সঙ্গে অ্যাডভান্স কোর্স, রক ক্লাইম্বিং, ট্র্যাকিং, ওয়াটার স্পোর্স রয়েছে। আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় নানা দেশ থেকে আগত মানুষের কাছ থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে এই সংস্থাটি।

টিবেটিয়ান রিফিউজি সেলফ হেল্প সেন্টার, এক ইচ্ছে পূরণের গল্প: ১৯৫৯ সালে দলাই লামার তিব্বত ত্যাগের সাথে সাথেই ভারতে তিব্বতিদের ঢল নামে। অরুণাচল প্রদেশের মিসামারি ও উত্তরবঙ্গের বক্সাদুয়ারে তাদের শিবির করা হলেও ক্রমশ চাপ বাড়ছিল। উদ্বাস্তু সংখ্যা ৯০০০ পৌঁছালে তাদের হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর, কালিম্পং ও দার্জিলিঙে পাঠানো হয়। দার্জিলিঙে একটি সেন্টার গড়ে ওঠে লেবঙের পশ্চিমে থাকা হার্মিটেজ এলাকায়। ৩.৪৪ একর জমি লিজ নিয়ে যে সেন্টারটি গড়ে ওঠে তার বর্তমান জনসংখ্যা সাতশো ছুঁই ছুঁই। সেলফ হেল্প আদর্শে দীক্ষিত এই সেন্টারটির অর্থের মূল উৎস এখানকার বাসিন্দাদের হাতে বোনা নানা জিনিস। চর্ম জাত জিনিস থেকে কাঠ নির্মিত জিনিস, শীতবস্ত্র, কার্ড, কার্পেট, ঘর সাজানোর নানা জিনিস যা তারা বর্তমানে পৃথিবীর ৩৬টি দেশের রপ্তানি করে থাকে।

ইতিহাস বিজড়িত মৃৎশিল্পের হাটে: উত্তরের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে নিম্নাভিমুখে মহানন্দার এলোমেলো গতির সাক্ষী হয়ে আমরা যেই মুহূর্তে আত্রাইয়ের কোলে ঝাঁপ দেই উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলিতে ধ্বনিত হয় অসংখ্য ঘোড়ার পদধ্বনি। হ্যাঁ এই দিনাজপুর থেকে শুরু হয়েছিল বখতিয়ারের বাংলা শাসন। সম্ভবত বখতিয়ারের বাংলা জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে দিনাজপুরের হাটপাড়া কুনারের মৃৎশিল্পীরা বাধ্য হয়েছিলেন মাটির ঘোড়া তৈরি করতে। যেই ঐতিহ্য আজও সমান ভাবে জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার হিসেবে বাঁকুড়ার ঘোড়া প্রসিদ্ধ হলেও দিনাজপুরের মাটির ঘোড়ার চল বহু যুগ থেকে। উচ্চতায় ছয় ইঞ্চির মতো ঘোড়াগুলির কান খাড়া, মুখ সোজা সামনের দিকে তাকানো, দুকানের মাঝে চুলের ঝুঁটি, বাঁকানো লেজ, তুলনায়

লম্বা পা। ঘোড়াগুলির গা জুড়ে যুদ্ধ সাজে গয়না পোড়ানো। বড় ঘোড়াগুলির উচ্চতা দেড় ফুটের মতো। যুগ যুগ ধরে নিজেদের এলাকাভিত্তিক এই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছেন গুটি কয়েক মানুষ।

গমিরার মুখোশ: মালদায় বহুল প্রচলিত গম্ভীরা গান। দিনাজপুরে যা মোখাখেল বা গমিরা। চামুণ্ডা ও কালীকেন্দ্রিক এই গমিরার বৈশিষ্ট্য মুখোশ বা মোখানাচ। মোখানাচের সাতদিন আগে থেকে গমিরার দিন পর্যন্ত শোলার তৈরি মুখোশ দিয়ে দেবদেবীর নাচ হলেও শেষ দিনে নাচতে হয় কাঠের মুখোশ দিয়ে। গমিরার মোখানাচের মুখোশ বংশানুক্রমিকভাবে তৈরি করে আসছেন চাকলা সংলগ্ন মুস্কিপুরের মালাকার পরিবার। দিনাজপুরের হেমতাবাদ ও কুশমন্ডি এলাকার কাঠের মুখোশ ও আবার বহু প্রাচীন। যদিও বাংলার মুখোশ বলতে ছৌ নাচের মুখোশের কথা মনে পড়ে কিন্তু উত্তরবঙ্গের গমিরা কেন্দ্রিক এই মুখোশ শিল্পীর সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয়। যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচার ও প্রসার ভীষণ জরুরি।

মখমলের মোলায়েম পরশ: মখমলের নাম শুনলেই যদিও সুদূর কাশ্মীরের নাম মনে পড়ে কিন্তু ঘরে বসে উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জের খুব কাছে পাওয়া যেতে পারে উন্নতমানের মখমলি কার্পেট।

১৯৮০ সালে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে মালগাঁওয়ের আবু তাহের বেনারস থেকে কার্পেট বোনার প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামে ফিরে আসতেই ঘটে গেল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। তাঁত তৈরি করে গ্রামের যুবকরাই নতুনভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তৈরি করে ফেলতে লাগলেন সদৃশ্য মখমল। কর্মসংস্থান হলো হাজার হাজার যুবক যুবতীর। পরিযায়ী হয়ে আজ আর মালগাঁওয়ের কাউকে কর্মসংস্থানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয় না অথবা দূর দূরান্তের হাটে গিয়ে পসরা সাজিয়ে বসতে হয় না। আজ তারা স্বনির্ভর। গ্রামের ছেলেরা ঘরে বসেই তৈরি করছেন মহার্ঘ্য মখমল বা কার্পেট।

গঙ্গারামপুরের দই, জামালদহের মিষ্টি, অথবা বেলাকোবার চমচমের প্রসিদ্ধি ও মিষ্টি শিল্পের ভবিষ্যৎ: যেকোনো প্রসিদ্ধ মিষ্টি তার অতীতের এক বৃহৎ ইতিহাস নিয়েই এগিয়ে চলে। শেষ পাতে বাঙালির মিষ্টি খাবার প্রচলন স্থান ও কাল বিশেষে নানা জায়গার প্রসিদ্ধি ঘটিয়েছে নানা সময়। উত্তরবঙ্গের নানা জায়গাও এর ব্যতিক্রম নয়। সে আপনি গঙ্গারামপুরের দই বলুন বা বেলাকোবার চমচম জিভে জল আনা মিষ্টিগুলোর সাথেই জড়িয়ে আছে মিষ্টি শিল্পীদের ভবিষ্যৎ। কোথাও বংশানুক্রমে কোথাও বা স্থানীয় হিসেবে এক একটি মিষ্টি নিজেদের মান বজিয়ে রেখে আপনার রসনা তৃপ্তি করে

চলেছে দীর্ঘ সময় থেকে। বেলাকোবার ক্ষেত্রে ধীরেন সরকার ও কালিদাস দত্তের হাত ধরে টাঙ্গাইল থেকে উঠে চলে আসা এক মিষ্টি ব্যবসা শুধু যে রসনা তৃপ্তি করেছে তাই নয় বেলাকোবার নামের প্রসিদ্ধি ঘটিয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে। আবার গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে তৈরি মিষ্টির কদর বজায় রাখতে বর্তমানে উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ। অনেকটা কর্পোরেট ধাঁচে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে এই দইয়ের প্রচার প্রসার ও মান বজায় রাখার জন্য কাজ করে চলেছে এই পরিষদ। এছাড়াও জামালদহের আম দই এর মধ্যে আপনি পাবেন আসল আমের স্বাদ।

একদা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'বাংলার ইতিহাস নাই। অতএব তা কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।' আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান। উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাংলার কথা ভাবাই যায় না। এ যেন মুন্ডহীন দেহ। সাহিত্য সম্রাটের ভাষায় 'ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে'। বাংলার ইতিহাস, ভবিষ্যৎ আগামীর সম্ভাবনা নিয়ে যদি বিস্তর আলোচনা করতেই হয় তবে উত্তরবঙ্গকে ছাড়া এই আলোচনা অনর্থক। উত্তরবঙ্গের চালচিত্র নির্মাণে বিভিন্নতা, প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহাওয়া তার জীবনশৈলীতে প্রভাব বিস্তার করে আসছে প্রতিনিয়ত। দেশভাগের ক্ষত বুকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্থিত উত্তরবঙ্গ নতুন রূপে সজ্জিত হয়ে শিল্প সম্ভাবনায় এগিয়ে চলেছে এভাবেই। বৃহৎ শিল্প নির্মাণে ক্ষুদ্র শিল্প ও স্থানীয় লোকশিল্প বিন্দু বিন্দু আকারে সিন্ধুতে জল ভরার কাজ করে চলছে প্রতিনিয়ত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে পরিশেষে দেবেশ রায়ের কিছু কথা না বললেই নয়- 'উত্তরবঙ্গ যেন একটাই জেলা বা একটাই শহর বা কেউ যদি নিন্দে করে বলতে চান বলতে পারেন একটাই গ্রাম। কত মুখ ! কত পোশাক! কত ভাষা! হঠাৎ মনে হয়- এখানে গঙ্গার এই পারে, পাহাড়ের আর ফরেস্টের আড়ালে আমাদের একটা এই আলাদা পৃথিবী। একেবারেই আলাদা। একেবারেই পৃথিবী।'

জলপাইগুড়ি, ভারত।

উত্তরবঙ্গের মৎসজীবীদের জীবন-জীবিকা: এক আলোকপাত

পার্থ সারথি চক্রবর্তী

'মাছে-ভাতে বাঙালি'। এই আপ্তবাক্যটি বাস্তবায়িত করতে দু'দুটি সম্প্রদায় বা জীবিকার মানুষের অবদান প্রয়োজন। একজন কৃষিজীবী ও অপরজন মৎসজীবী। এই দুই সমাজবন্ধুদের মধ্যে মৎসজীবীরা অনেক বেশি উপেক্ষিত। এই মৎসজীবীদের জীবন, জীবিকা, সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই লেখার অবতারণা।

উত্তরবঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল। এখানে বসবাসকারীরা বেশিরভাগ মৎসখেকো। তাই সাধারণ সমস্যার সাথে সাথে এই লেখায় আমরা উত্তরবঙ্গের মৎসজীবী সম্প্রদায়ের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করব।

নতুন প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষের খাবারের জন্য পশু ও ফলমুলের অভাব দেখা দিতে থাকে। অপরদিকে বরফগলা জলে প্রচুর মাছ জন্মাতে থাকে। পুরুষেরা মাছ শিকার শুরু করে, কেননা মাছ সহজপাচ্য, সুস্বাদু ও অনেক রকমের খাদ্যগুণ বিশিষ্ট। জন্ম হয় মৎসজীবী সম্প্রদায়। তারা এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। তাদের নিজস্ব জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও পেশানির্ভরতা গড়ে ওঠে। কিন্তু কৃষিরও আগে সৃষ্ট এই পেশা, কৃষির উন্নতির সাথে সাথে ক্রমশ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে থাকে।

তার কতগুলো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হতে পারে-

১. বাঁধ-অনেকদিন ধরেই জলসেচের জন্য বিভিন্ন নদীপথে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে জলসেচের জলের প্রাচুর্য্য হওয়ার কারণে কৃষিকাজের সুবিধা হলেও, মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে মাছ চাষ ব্যহত হয়েছে।

২. জলসংকট- গোটা বিশ্বে আজ চরম জলসংকট। নদীতে যা জল আছে, তার অনেকটাই কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবুজ বিপ্লবে চাষের উন্নতি হলেও মাছচাষের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সফল বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নীল বিপ্লব কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে।

৩. দূষণ- জমিতে উচ্চ ফলন লাভের আশায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়াই দোকানদারদের কথাতেই জমিতে যথেচ্ছ সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে চাষের মাটি পরীক্ষাও করা হচ্ছে না। এর ফল হচ্ছে

বিষময়। এই বিষ বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করছে। পুকুর, খাল, বিলে মাছ আক্রান্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত কীটনাশকের অপরিমিত প্রয়োগের ফলে জলদূষণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। এই দূখিত জলের জন্য মাছের মড়ক দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই না, এই জলদূষণ মৎসচাষিদের জীবনকে ভীষনভাবে বিপন্ন করে তোলে। তাদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই পাট পচানো হয় খানা খন্দে। তার প্রভাবেও জল দূষিত হতে থাকে।

এই কারণগুলোকে পর্যালোচনা করা হলে কৃষির সাথে ব্যাস্তানতপাতিকভাবে মাছচাষের অবনতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এছাড়াও চরদখল, মাছধরার সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধি ও অপ্রতুলতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ জলই অপেয়। আর ভৌম জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ক্রমশ গোটা বিশ্বকে জলসংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নদী কোনো সীমারেখা মানে না। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নদীর জলবন্টনের তীব্র সমস্যা বিদ্যমান। বিভিন্ন জলচুক্তি সম্পাদন ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বারবার চেষ্টা করা হলেও জলসংকটের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সব কিছু প্রভাব ফেলছে মৎসজীবীদের জীবন ও জীবিকার ওপরে। আবার ভারতীয় বন্য আইন-১৯২৭, পশ্চিমবঙ্গ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৫৯,১৯৭২-৭৪ এর মধ্য দিয়ে অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন ও জাতীয় উদ্যান তৈরি করা হয়েছে। ফলে মৎষচাষিদের বনসংলগ্ন নদী, ঝোরা খালবিল ইত্যাদিতে প্রবেশ বা বিচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ ফিশারি অ্যাক্ট কার্যকর না করাতে মৎসজীবীদের সমস্যার কোনো সুরাহা করা যায়নি। পাশাপাশি বনদপ্তরের সাথে মৎসদপ্তরের লড়াই চিরদিনের। আগে বর্ষাকালে রুই, কার্প, কাতলা, মৃগেল মাছ স্রোতযুক্ত জলে ডিম ছাড়ত। সেখান থেকে ডিম ফুটে বাচ্চা হতো। এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদের লালগোলা-ধুলিয়ান ও মালদহের মানিকচকের অঞ্চলের গঙ্গা থেকে ব্যাপক হারে মাছের ডিমপোনা সংগ্রহ করা হতো। এই মাছ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হতো। সর্যকারি পরিসংখ্যান দেখলে জানা যায়, এই মাছের চাহিদা দেশ-বিদেশে বেশ ভালোরকম থাকায় রপ্তানিও করা হতো। কিন্তু এখন পরিবেশ দূষণ, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে ডিম উৎপন্ন প্রায় হয় না বললেই চলে। ১৯৫৭ সালের পর থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের মাধ্যমে ডিম উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে রুই, কাতলা, কার্পজাতীয় মাছগুলোকে আবদ্ধ জলে ডিম পাড়তে বাধ্য করা হয়।

পাশাপাশি মাছ চাষের উপযোগী জলাশয় বা পুকুর তৈরি বা সংস্কার করা দরকার। কাদা পরিষ্কার, পাড় বাঁধানো, আগাছা পরিষ্কার করে জলাধারগুলোকে মাছচাষের জন্য উপযুক্ত করে তোলা দরকার। প্রয়োজনে জৈব সার প্রয়োগ, ফাইটোপ্লাংটন বাড়ানোর মধ্য দিয়ে মাছচাষের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যায়। তারপর মাছ বড় হলে সংগ্রহ করে উপযুক্ত পরিবহন দ্বারা বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়।

এভাবেই জল ও মাছ সংকটের সাথে সাথে মৎসজীবী শব্দের অর্থ ও পরিবর্তিত হতে থাকে। মাছধরা যাদের জীবিকা, তারাই মৎসজীবী। মৎসজীবী বলতে সাধারণ জেলেদের বোঝায়। যে বা যারা নদী-নালা, খাল-বিল থেকে জাল দিয়ে মাছ ধরে, তাদের মৎসজীবী বলা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মৎসজীবী কেবলমাত্র মাছ সংগ্রাহক বা জেলেতে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে, মৎসশিল্পের যে কোনো পর্যায়ের সাথে যুক্ত থেকে যারা জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, তারাই মৎসজীবী। প্রকৃতি হলো মাছের সবচাইতে বড় উৎপাদক। প্রাকৃতিক প্রজননের বড় ক্ষেত্র নদী ও তার অববাহিকা। বর্ষাকালে মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টির সাথে শীতল আবহাওয়া মাছকে প্রজনন করায়। ফলে মাছ ডিম ছাড়ে এবং তা থেকে বাচ্চা হয়। এর কিছু নিয়ে পুকুরে ফেলা হয়। বাকি অংশের সিংহভাগ মারা যায় ও কিছু অংশ নদীতে চলে যায়। সময়ের সাথে সাথে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। কৈবর্ত ও ধীবর সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ হতে থাকে। পরবর্তীকালে ধীবরেরা মূলতঃ মহাজনের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে। মাছ ধরার সরঞ্জাম কিনতে মহাজনদের থেকে অর্থ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়তে থাকে। তার দাদন সঠিক সময়মত দিতে পারা বা না পারার চক্করে পড়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অনেক কম দামে মহাজনদের হাতে তূলে দিতে বাধ্য হয় তাদের অনেক কষ্টার্জিত মাছ। এভাবে তৈরি হতে থাকে মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন শ্রেণি। মৎসচাষিদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে তীব্র গতিতে।

যখন তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়, তখন মৎসচাষিরাও আন্দোলনে সামিল হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ধীবরদের যত্রতত্র বিনা অনুমতিতে মাছ ধরার অধিকার খর্ব হয়ে যায়। এসবের ফলেই 'পোলো বিদ্রোহ' শুরু হয়, যা অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষের বিশেষত মাছচাষিদের সম্মিলিত জেহাদ। তেমনি বিলে বা পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বচসা, মারপিট, খুন জখম পর্যন্ত শুনতে পারা যায়। বর্তমানে ভেড়ি দখল নিয়ে

বিবাদ, সংঘর্ষের খবর শিরোনামে হামেশাই আসে।

সরকারি পরিকল্পনা: স্বাধীনতার পর কে.সি.সাহার Fisheries of West Bengal 1970 নামক রিপোর্টে সেকালের সমস্যার উৎস, মাছ সংরক্ষণ, সমবায়, মৎসচাষিদের দূরবস্থার কারণ সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে মৎসচাষিদের উন্নতি ও দূরবস্থার সমাধান সাধনের পথ বের করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

২০১৩-১৪ সালে টাস্কফোর্স গঠন করে উপগ্রহের মাধ্যমে জলাশয় চিহ্নিত করে সরকারি জলাশয়গুলোতে মাছচাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়। দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও শিক্ষার ইতিহাসের অধ্যাপক দীপক কুমার মনে করেন, আজকাল মাছচাষ কৃষিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারি রিপোর্টে বারবার ডিমওয়ালা মাছ ও মাছের বাচ্চা নির্বিচারে নিধন করাকেই মাছের অভাবের কারণ রূপে তুলে ধরা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে অনেক লুপ্তপ্রায় প্রাণীকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হলেও মাছের ক্ষেত্রে সেটা আজো সম্ভব হয়নি। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাছচাষের ক্ষতি ডেকে আনছে বহুমাত্রায়। সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় 'ফিশব্যাংক' তৈরি করা হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। দেশি মাছের লালনপালনের জন্য দূষণহীন আশ্রয়ে রুই, বা বিভিন্ন মিশ্র প্রজাতির মাছচাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃত্রিম ব্রিডিং বা প্রজননের মাধ্যমে মাছ উৎপন্ন করে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করা হয়।

ফিশব্যাংকের মাছ দিয়ে:

১। প্রজননক্ষম বাছাই মাছদের কৃত্রিম প্রজনন করা যায় এতে ডিমপোনা সহজলভ্য, ইনব্রিডিঙের কুফলমুক্ত, উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি হয়।

২। জীববৈচিত্র্যে- সিডব্যাংক, জিনব্যাংক তৈরি করা যায়।

৩। জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে মাছ উৎপাদন প্রকল্প চালু করা যায়।

মাছ ধরার সরঞ্জাম: পূর্বকাল থেকেই মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হতো যেগুলি গঠনগতভাবে সরল হলেও কার্যকর। বিভিন্ন ফাঁদ, জাল বা অস্ত্রজাতীয় জিনিস কাজে লাগান হতো।

যে দুটি হাতিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহার হতো, তার প্রথমটি কোঁচ বা বল্লম একত্রিত করে কাজে লাগান হতো। দুই বা তিনটি কোঁচ একসাথে করে ব্যবহৃত হতো। অপরটিতে সরল বল্লম বা এককাঁটা হিসেবে থাকত।

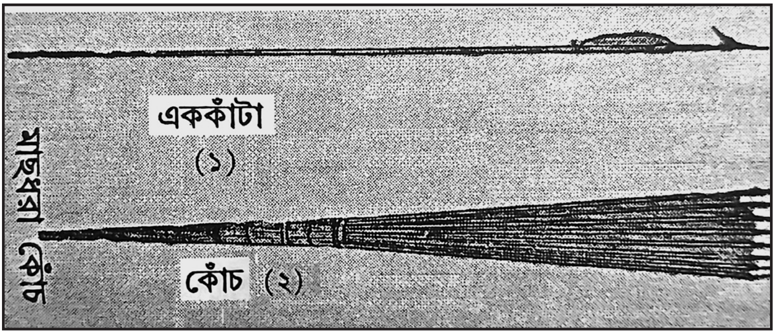

(চিত্র-১)।

কোঁচ- বাঁশের চেঁড়া সরু একটি বান্ডিলমতো যাতে তীক্ষ্ণ শঙ্কু আকৃতির লোহার সূচালো বল্লমাকৃতি দণ্ড আটকানো থাকে। ভাসমান দণ্ডে আটকে যায় আহত মাছ। তারপর টেনে ওপরে তোলা হয়।

এককাঁটা- একটি সরু বাঁশের দণ্ডের বর্শা একটি মাত্র খোঁচাযুক্ত কোঁচ থাকে। এটা দণ্ড থেকে আলাদা হতে পারে।

চল- হালকা সরু বাঁশের বল্লম যার শেষে দুই থেকে তেরটি কাঁটাযুক্ত শাখা আছে। কাঁটাগুলি দণ্ডের সাথে সরু সুতো দিয়ে আটকানো থাকে। শেষপ্রান্তগুলো লোহার তারের তৈরি একটি তাড়ায় সরু তার দিয়ে বাঁধা থাকে।

তীর-ধনুক- একজন দক্ষ তীরন্দাজের হাতে মাছ শিকারে তীর ধনুকের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

এই সরঞ্জামগুলোর ব্যবহার ইদানিং অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে।

ফিশিংম্যাট- এটি সাধারণত শরকাঠি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। এটি আড়া নামেও পরিচিত। কতগুলো লম্বা কাঠির মতো অংশ শক্ত নাইলনের সুতো দিয়ে বেঁধে লাগান হয়।

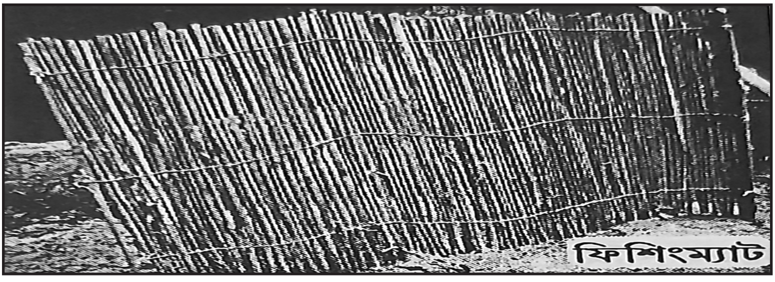

(চিত্র-২)

হোড়া বা হুড়ো- অতি সরল গঠনের মাছধরা প্রচলিত ফাঁদ। শ্যেওড়া গাছের ডালপালাকে বেঁধে নিয়ে পুপঁলির আকার দেওয়া হয়। অনেক সহজেই এর সাহায্যে একসাথে অনেকগুলো মাছ ধরা সম্ভব হয়।

এগুলো ছাড়াও কুঁড়োজালি, ঘুঘু, বিত্তি, পোলো, দোন ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(চিত্র-৩)।

বড়শি সহযোগে মাছশিকার এক প্রচলিত ফাঁদ।

জাল- জাল একটি পরিকল্পিত ফাঁদ। এটা তন্তু বা রশি দিয়ে তৈরি। জালের ইতিহাস বহু পুরনো। বিভিন্ন ধরনের ও মানের সুতো দিয়ে জাল বোনা হয়। মাছ সংরক্ষণের জন্য জালের বুননের ফাঁস এমন হওয়া দরকার যাতে ৯ ইঞ্চির ছোট মাছ ধরা না পড়ে। ফলে ছোট মাছগুলো পরিণত ও প্রজননক্ষম হতে পারে। মাছধরা জালের বেশি পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহারে জাল আধুনিক হয়েছে।

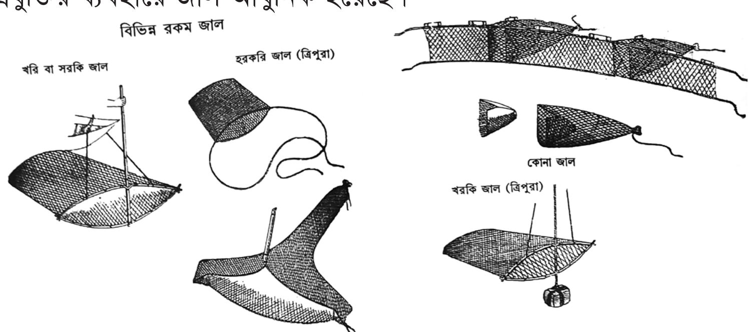

(চিত্র-৪)

মৎসজীবী সম্প্রদায়-

বাংলার মৎসজীবী সম্প্রদায়ের অঞ্চল অনুযায়ি ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কৈবর্তদের জমিজমা থাকলেও ওপার বাংলার কৈবর্তরা জলের উপর নির্ভরশীল। এদের সামাজিক রীতিনীতিও আলাদা আলাদা। তাদের আনন্দ, উৎসব ও জীবনযাত্রার পার্থক্যও বিদ্যমান।

আবার দক্ষিণ ভারতে মৎসচাষিদের সমুদ্রের উপরে নির্ভর করে থাকতে হয়। তারা দিনের পর দিন সমুদ্রে ট্রলারে করে ভেসে থাকে। দেব-দেবীর পুজাতেও মাছ উৎসর্গ করার চল আছে। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরে শুকনো মাছের ব্যবসায় নিযুক্ত মহাজনরা তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী।

সীমান্ত সমস্যা মৎসজীবীদের আরেকটি জ্বলজ্যান্ত সমস্যা। ভারতের জলসীমায় বিদেশি ট্রলারের অনুপ্রবেশ এলাকাকে ধীরে ধীরে মৎসশূন্য করে তুলেছে। তার উপর রয়েছে জলদস্যুর ক্রমাগত হানা। তাদের অনুপ্রবেশ, ট্রলার অপহরণ, লুটপাট ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা প্রায় নিয়মিত শোনা যায়। এসব ক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনীর কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগও শোনা যায়। এই সবকিছু মিলিয়েই এই পেশার উপর এখন অনিশ্চয়তার কালো মেঘ।

মৎসজীবীদের সমস্যাগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে পঞ্জীকৃত করা যেতে পারে-

১. জলাভূমি, খাল, পুকুর ভরাট নীত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পলি সংস্কার না করায় ও যথেচ্ছ নির্মাণকার্য চালানোর ফলে জলাশয় কমতে কমতে প্রায় শেষ হবার পথে।

২. বিশ্বজুড়ে এখন নদী বিপন্ন। বড় বড় ও বেশিরভাগ ছোট নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি মাছ। সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে মৎসজীবীদের ভবিষ্যত।

৩. বিভিন্ন দূষণের কারণে সমুদ্রে মাছচাযীদের স্বাস্থ্যহানির প্রভূত সম্ভাবনা। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে।

৪. অনেক প্রজাতির মাছ কমছে। তাদের অস্তিত্ব সংকটে।

৫. ধীবরদের জীবন অনিশ্চয়তার ভরা। না আছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, না আছে নিরাপত্তা। উত্তাল সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সামুদ্রিক ঝড়, জলদস্যুর কবলে পড়া বা বিদেশি উপকূলরক্ষীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া রোজকার ঘটনা।

৬. বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা, বন দফতরের সঙ্গে মুভেদ ধীবরদের এক জ্বলন্ত সমস্যা।

৭. ভেড়ি দখল, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সরকারি দপ্তরের সমন্বয়ের অভাব।

৮. আধুনিকীকরণের অভাবে নৌকা বা যন্ত্রচালিত ট্রলারের মধ্যে বিভেদ বিদ্যমান। মৎসচাষিদের অসুবিধা ও অসন্তোষ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ হামেশাই উদাসীন।

এসবের মধ্যেই তারা জাল বোনার সময় নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তিন থেকে পাঁচজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক বরণডালা নিয়ে নতুন

জলকে বরণ করে। মাটির প্রদীপ, সিঁদূর ইত্যাদি দিয়ে বরণডালা সজ্জিত হয়। অশুভ শক্তির হাত থেকে জালকে অক্ষত রাখতে এরূপ আচার-অর্চনা সাহায্য করে বলে বিশ্বাস। সমরেশ বসত তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে ধীবরদের মা গঙ্গার পুজোর উল্লেখ করেছেন। নৌকো নির্মাণের সময়েও বিভিন্ন নাচ-গানের উৎসব হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে ভাটিয়ালি গানের চল দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের বোরোলি মাছের খ্যাতি জগতজোড়া। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, উত্তরবঙ্গ বলতেই তার বোরোলির কথা মনে পড়ে। একে অনেকে 'তিস্তার ইলিশ' বলে ডাকে। তোর্ষার বোরোলির মানও চমৎকার। স্রোতের বিপরীতে ঝাঁক বেঁধে চলে বোরোলি। এর সঙ্গে চাপিলা, কাজলি, মৌরলারও প্রভূত কদর রয়েছে। অনেক খ্যাতিমান লোকের এসব মাছের প্রতি ভালোবাসার অনেক গল্প শোনা গেলেও মাছচাষীদের কিন্তু জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। বর্তমানে জল সংকট, জলদূষণ ইত্যাদির জন্য এসব মাছ অনেক কমে গেছে। সরকার কিছু কিছু কৃত্রিমভাবে চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠছে বারবার। ফলে মাছ শিকার কার্যত দিনদিন কমে যাচ্ছে। ফলে মৎষচাষিদের জীবন ও জীবিকা দুই'ই বিপন্ন হচ্ছে।

সর্বশেষ একথা বলাই যায় যে, সার্বিক নিরাপত্তার অভাবে এই সুপ্রাচীন মৎসজীবীদের জীবন-জীবিকা আজ অনেকটাই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। উত্তরবঙ্গের নদীমাতৃক অঞ্চলের মৎসজীবীদের নিরাপত্তা ও সর্বসাধারণের সুবিধার্থে কিছু সুপরিকল্পিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

তথ্যসূত্রঃ

১. মাছ জল মৎসজীবী- সূর্যেন্দু দে
২. K.C.Saha: Fisheries of West Bengal
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা

উত্তরবঙ্গের অন্যতম জীবিকা-পাটিশিল্প

ডলি সাহা

প্রেক্ষাপট: দুই বাংলার উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পাটিশিল্প এক প্রাচীন কুটির শিল্পের নাম। এটি একটি প্রাচীন জীবিকা হওয়ার সাথে এই শিল্প আমাদের সভ্যতা বৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের একটি অংশ। যখন দেশ ভাগ হয়নি তখন নিম্ন আসামের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো ও বর্তমান পূর্ববঙ্গের সিংহরাগী, সিরাজগঞ্জ, হিঙ্গানগর এমনকি ঢাকা জেলারও আশেপাশের সিলেট, কাশিপুর প্রভৃতি জায়গায় এই প্রাচীন কুটির শিল্পের দেখা পাওয়া গিয়েছিল।

যার একটি বৃহৎ অংশ দেশভাগের সময় বা তারপরে অনেক পাটিয়াল অথাৎ পাটি কারিগররা আমাদের দেশের উত্তরবঙ্গে, কোচবিহার জেলার ঘুঘুমারি, দেওচড়াই, নিশিগঞ্জের শিববাড়ি ও কিছু পাটিয়াল চকচকায় বসত গড়ে তোলে। এখানে নতুন বসত গড়ে উঠল ঠিকই কিন্তু তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পাটি তৈরি করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু পাটি তৈরি করার জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন তার অভাব দেখা দিল প্রকটভাবে। তবে ঠিক যে কারণে তারা এই দেশে পাড়ি দিয়েছিল সেটা হলো ঘুঘুমারির ভৌগোলিক পরিবেশ। সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রায় একই। প্রাথমিকভাবে কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে তারা প্রথমে আসাম থেকে পাহড়ি বেতগাছ নিয়ে এসে কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে সেখান থেকে চারাগাছ সংগ্রহ করেনিজেরাই সামর্থ্য অনুযায়ী জমি প্রস্তুত করে নেয়।

এখানে বলা প্রয়োজন- যে বেত দিয়ে পাটি প্রস্তুত করা হয় সেটা দিয়ে কিন্তু ধামা, কুলো, পুলিশের লাঠি বা আসবাবপত্র তৈরি হয় না। সেই বেতগাছ বেশ কিছুটা মোটা ও শক্ত ধরনের এবং গাছের গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে।

বেত বা পাটি গাছের চাষ: প্রথমে পাটিয়ালরা আসামের পাহাড়ি জংলা জায়গা থেকে অনায়াসেই বেতের চারা নিয়ে এসে যার যতটা জমি ছিল তা রোপণ করে বেতের চাষ শুরু করল। গাছগুলো গুল্ম প্রকৃতির, বাঁশের মতো ঝোপ ঝাড় বিশিষ্ট। একবার বেতগাছের চারা রোপণ করা হলে বা পুরনো ক্ষেত্রের পরিণত বয়সের বেত গাছ কাটা হলে, প্রায় তিন বছরের জন্য সেই ক্ষেত্র ছেড়ে দিতে হয়। কাটা গাছের গোড়া থেকেই আবার নতুন বেতগুলো বেড়ে ওঠে। সুতরাং পুরনো ক্ষেতে আর নতুন করে চারাগাছ রোপনের প্রয়োজন হয় না।

এখানে আরও একটি বিষয় বলা দরকার, মূল গাছ থেকে যে কঞ্চি বা ডাঁটি বের হয় তা থেকে শীতলপাটি মূল গাছের তুলনায় বেশি ভালো ও উন্নতমানের

হয়। এই চাষের আরেকটি রহস্য গল্প আছে: দেশভাগের পর যে যতটা তার সাধ্য মতো বেত চাষের জমি তৈরি করেছিল, পরবর্তীকালে পাটিকর ব্যতীত অন্য কেউ কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকায় নতুন করে বেত চাষ করতে পারবে না। কারণ স্বরূপ বলা হলো যে এই বেত গাছগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বাবুই পাখির বাসা তৈরি করে এবং এই বাবুই পাখিগুলো আশেপাশের ধানক্ষেত তথা ধান নষ্ট করে ফেলতো। যারফলে পাটিয়াল ও কৃষকদের মধ্যে শুরু হয় মনোমালিন্য, ঝগড়া, মারামারি এমনকি জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই কৃষক সম্প্রদায় স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। ধানের চাষ না হলে মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। তাই এর একটা মীমাংসা করার জন্য ১৯৮৮/১৯৮৫ সালে স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যস্থতায় চাষী ও পাটিয়ালদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পাটি জীবিকাকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত হয় যে, যার যে পরিমাণ জমিতে বেত চাষ করেছে ততটাই থাকবে। (ঘুঘুমারি এলাকায়) নতুন করে কোনো জমিতে পাটির জন্য বেতের চাষ করা যাবে না। আজ পর্যন্ত মেনে চলেছেন তারা সেই স্থানীয় রীতি। সেই সময়ে কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল এই জীবিকা।

একবিঘা জমি থেকে মোটামুটি ছোটো বড় মিলিয়ে ৩০০টি পাটি হতে পারে। উল্লেখ্য, বেতের কোনো অংশই ফেলনা নয়। বেতের সব অংশই কাজে লাগে। পাটি তৈরি করার পর বাকি অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বেত থেকে পাটি তৈরি: জমি থেকে প্রথম বেত গাছগুলো কেটে নিয়ে এসে ভালো করে গায়ের নোংরা পরিষ্কার করে কান্ডগুলোকে বিশেষ ধরনের বটিতে লম্বালম্বি চরে কমপক্ষে চারটি ফালি করা হয়। কান্ডের ভেতর ভাগের নরম অংশকে বলে বুকা। এই বুকা চেঁচে ফেলে দেওয়া হয়। যা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যারা পাটিশিল্পী তাদের বলা হয়- পাটিকর বা পাটিয়াল। এই পাটি ব্যবসাকে আরও লাভজনক করার জন্য পাটিকরের মূল লক্ষ্য থাকে। মূদ্রার ছাল থেকে যতটা সম্ভব সরু ও পাতলা বেতি তৈরি করা। বেতি যত পাতলা ও সূক্ষ্ম হবে পাটি ততটাই নরম ও মসৃণ হবে। খুবই দক্ষ হাতে আঙুলের নখ দিয়ে বিশেষ কায়দায় বেতি ছিলে নেওয়া হয়। বেতি তোলার সময় পাটিশিল্পী বুড়ো আঙুলের ও মধ্যমায় কাপড় পেঁচিয়ে নেন যাতে বেতির ধারে আঙুল কেটে না যায় বা আঙুল সুরক্ষিত থাকে। বেতি তৈরি হওয়ার পর একটা বিরাট গুচ্ছাকারে বাধা হয়। যাকে বিরা বলে। তারপর বেতির বিরা মটকা বড় পাত্রের জলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। এই সময় ভাতের মারে বা ফ্যানের মধ্যে সেগুলোকে দুই থেকে তিন দিন ভিজিয়ে রেখে সেদ্ধ করা হয়। এর ফলে বেতি হয় চকচকে।

তাছাড়া রঙিন বেতি তৈরি করার জন্য তারা সেদ্ধ করার সময় যার যেমনটা রং প্রয়োজন সেই অনুযায়ী রং মিশিয়ে সেদ্ধ করলেই রঙিন বেতি তৈরি হয়। একজন দক্ষ কারিগর একটি মূত্রা থেকে সরু বা পাতলা বারোটি বেতি তৈরি করতে পারেন। বেতগাছের পিঠের অংশ বা ছাল দিয়ে সেদ্ধ করা বেতি দিয়ে হয় শীতলপাটি ও কোমলকোশ আর তার পরের স্তর, মাঝখানের বুকা অংশ দিয়ে হয় সাধারণ পাটি বা বুকা পাটি।

এক সময় এই শীতলপাটির ও কোমলকোশের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। গরমে শীতল পাটির শীতল পরশ আমাদের শান্তি দেয় ক্লান্তি দূর করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে ও এই শিল্পের কদর কিন্তু কমেনি। শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় শীতলপাটিতে ফুটে ওঠে বিভিন্ন বর্ণের ফুল, ফল, পশু পাখি, প্রিয়জনের অবয়ব এমনকি বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্সাও। আগেকার দিনে যখন বিদ্যুৎ ছিল না তখন মেঝেতে বা তোষকের উপর মিহি বেতের নক্সা করা এক ধরনের পাটি ব্যবহার হতো তাতে শয়ন করলেই শরীর ও মনে দুই শীতল পরশ অনুভূত হতো। তাই হয়তো নাম দেওয়া হয়েছিল শীতল পাটি।

পাটির ব্যবহার শুধুমাত্র শোয়ার বা বসার জন্য এমনটা নয়। বিদ্যুৎতের অবর্তমানে অতীতে জমিদার বাড়ি বা সরকারি কার্যলয়ে শীতল পাটির মাদুর দিয়ে টানা পাখার ব্যবহার ছিল। এই পাখা হাত দিয়ে টানা হতো। আজকাল শীতল পাটি শুধুমাত্র সেভাবেই ব্যবহার হয় না, বরং রুচিসম্মত সাজ সজ্জার উপকরণ, খাওয়ার টেবিলে, ব্যাগ, জলের বোতলের ব্যাগ, জুতা, চশমার খাপ, দেওয়াল হ্যাঙ্গার, বড় বড় হোটেলের দেওয়াল, মেঝের সজ্জায় সজ্জিত হয় এই হাতে বোনা পাটি। এর পেছনে রয়েছে উত্তরবঙ্গের পাটিশিল্পীদের নিখুঁত কাজ যার ফলে এই লাভজনক ব্যবসা অন্যমাত্রা পেয়েছে। তাছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ে বা পূজা যেটাই হোক না কেন এই পাটি ছাড়া সেটা সম্পূর্ণ হয় না। এই ব্যাপারটাও কিন্তু এই ব্যবসায় উন্নতির একটি দিক। আর এর প্রচলন বহুকাল ধরে হয়ে আসছে।

পাটিশিল্প হলো পরিবার নির্ভর অথাৎ স্বনির্ভর একটি জীবিকার নাম। যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশি তার আয়ও তত বেশি। পাটিশিল্পী অর্থাৎ শ্রমিকের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে পাটিয়ালদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটা সময় ছিল যখন তারা পরিবারের ছেলেদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিত। কারণ ক্ষেত থেকে মুত্রা কাটা, বেতি তৈরি করে পাটি বানানোর যোগ্য করে তোলা সব কিছুতেই ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া। দক্ষ শিল্পীদের হাতের পরশে শীতল পাটিতে ফুটে ওঠে বিভিন্ন বর্ণের ফুল, ফল, পশুপাখি,

বিখ্যাত মনীষীদের ও প্রিয়জনের অবয়ব বা কোনো জ্যামিতিক নকশা। পাটিশিল্পীরা দেশভাগের আগে ও দেশ ভাগের পরে এসেও এই পারিবারিক ব্যবসাকে রপ্ত করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

সুতারাং জীবিকাটি এক প্রকার উত্তরাধিকারী হিসেবে পেয়ে থাকে পাটিয়ালরা। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসা করেই শিল্পীদের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এখন বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি কাজে নিযুক্ত হলেও যারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলতে পেরেছেন, তারা এই ব্যবসা করে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছেন।

এখনো অনেক পরিবার আছে যারা পুরোপুরিভাবে এই জীবিকার উপরে নির্ভরশীল। যদিও আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানুষের জীবন ধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যৌথ পরিবার ভেঙে হয়েছে ছোট ছোট পরিবার। তথাপি যেহেতু এই পাটির ব্যবসাটা পরিবার নির্ভরশীল তাই এই ব্যবসায় অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও এখনও সমানতালে এগিয়ে চলছে।

সর্বত্র কোমলকোশ শীতল পাটির চাহিদা থাকলেও এর যোগান এখন নিম্নমুখি। কাঁচমালের অভাব না থাকলেও অভাব রয়েছে সুলভ করিগরের। ১৯৯০-১৯৯২ সালের পর থেকে শিল্পী সংখ্যা আর বাড়েনি।

উল্লেখ্য, অনেক পাটিয়ালরা তাদের কাঁচামাল বিক্রি করে শুধুমাত্র শিল্পীদের কাছ থেকে পাটি ক্রয় করে ব্যবসা করছে এমনকি আসাম ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাজারে রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। করোনাকালে এই ব্যবসা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে অনেকেই অনলাইন ব্যবসার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার অনেক পরিবার বিভিন্নক্ষেত্রে শ্রমিক লাগিয়ে পাটির বুনন সম্পূর্ণ করে বাজারে পাটির চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসা উত্তরবঙ্গের জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। একদিকে লাভজনক অপর দিকে এই শিল্পকে ভালোবাসা- দুইই উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন ও জীবিকায় পাটিশিল্প বা পাটি ব্যবসা ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে।

পাটির প্রচলনকে ধরে রাখতে ও ব্যবসার অগ্রগতির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সর্বতভাবে। এক কোটি টাকা ব্যয় করে নলুয়া বাড়িতে বানিয়েছে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। রাজ্যের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের উৎসাহ বাড়াতে সরকারের তরফ থেকে মাসে তিন হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীর সংখ্যা মোট ৫০ জন। এছাড়াও আছে ৮-৯ হাজার শিল্পী কার্ড প্রদান করা হয়েছে। যারা

সরকারের ডাকে বিভিন্ন সময়ে সরকারি স্তরে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যদি শিল্পী সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় তবে কোমলকোশ ও শীতলপাটির এই লাভজনক ব্যবসা উত্তরবঙ্গের মানুষের অন্যতম জনপ্রিয় জীবিকা হিসেবে দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে তা হলফ করে বলাই যায়।

পুনশ্চঃ লেখাটি সরেজমিনে পরিদর্শন ও পাটিশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে তৈরি করা।

কোচবিহার, ভারত।

উত্তরবঙ্গে প্রান্তভূমির জনজাতির জীবনযাত্রা

কুণাল নন্দী

উত্তরবঙ্গ বলতে আমরা যে এলাকাকে চিহ্নিত করি বা বলে থাকি সেটি হলো করতোয়া-গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গকে বুক চিরে দুটো ভাগে ভাগ করেছে, গঙ্গার ডানদিকের জেলাগুলিকে আমরা দক্ষিণবঙ্গ বলি আর বাম দিকের জেলাগুলিকে উত্তরবঙ্গ বলে থাকি।

এর মধ্যে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিংপঙ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এই আট জেলা নিয়েই আমাদের উত্তরবঙ্গ। এই উত্তরবঙ্গের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পশ্চিমে বিহার ও নেপাল, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মোট ক্ষেত্রফল ২১৮৫৪ বর্গ কিলোমিটার রাজ্যের আয়তনের প্রায় ২৪.৮৮% মাত্র। জনসংখ্যা ১.৫ কোটির কিছু বেশি, জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭০০ কিছু বেশি।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব অপরীসীম, কারণ, উত্তরবঙ্গের তিন পাশে আন্তর্জাতিক সীমানার কারণে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হলো শিলিগুড়ি শহর। আবার প্রতিবেশী রাজ্য ও রাষ্ট্র ভুটান ও সিকিমে প্রবেশ করতে গেলেও এই উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়েই।

উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ তিন ভাগে বিভক্ত (ক) পার্বত্য অঞ্চল (খ) তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল (গ) সমভূমি অঞ্চল। দার্জিলিং কালিংপঙ ও জলপাইগুড়ির কিছু অংশ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল, আবার দার্জিলিং জেলার কিছু অংশ ও জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্বের অংশ নিয়ে তড়াই ডুয়ার্স অঞ্চল। এদিকে জলপাইগুড়ির দক্ষিণ অংশ, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মালদহ নিয়ে সমভূমি অঞ্চল।

নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গে অনেক নদ-নদী এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে তিস্তা, তোর্ষা, সংকোশ, কালজানি, জলঢাকা, রায়ডাক, মেচি, বালাসান, মহানন্দা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন এগুলি এর অধিকাংশ নদীগুলিই হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে এসে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে তার মধ্যে টাঙ্গন ও মহানন্দা মালদহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে।

উত্তরবঙ্গের এই বিস্তির্ণ এলাকায় বিভিন্ন জনজাতির বসবাস, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ১.৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে, তপশিলি জাতি ১৮% এবং

তপশিলি উপজাতি ৯% সম্প্রদায় ভুক্ত, এই এলাকায় প্রায় ২৫টি জনজাতির বসবাসের খোঁজ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কোচ, রাজবংশী, মারু, ধামাল রাভা, টোটো, বোড়ো কাছারী, মেচ, ভুটিয়া, লেপচা, গারো, মুন্ডা, সাওতাল, নাগেশিয়া, মাহালী, কোরা হাজং, মগ, ওরাও, লোহা, মালপাহাড়িয়া, হাজং, ম্রু, গম, ভুকশা, লিম্বু, তুরি, ধীমাল ইত্যাদি।

এই জনজাতিগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-

(১) আদি জনজাতির মধ্যে মেচ, রাভা, গারো, টোটো, লেপচা, ভুটিয়া, এরা সবাই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর।

(২) বহিরাগত জনজাতি, সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুন্ডা, ওঁরাও, খাসিয়া এরা অস্ট্রিক/দ্রাবিড় ও কোল গোষ্ঠীর।

(৩) আধুনা বিলুপ্ত বা স্থানান্তরিত জনজাতি, পানিকোচ, ধীমাল, চেয়ো, ধামি, ডয়া, তন্ত, কিচক, মলদা ইত্যাদি এরাও মাঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর।

এই সকল জনজাতির মানুষজন নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে বসবাস করে নিজেদের মতো করে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে আসছে।
বর্তমানে বক্সাদুয়ার অঞ্চলে নেপালী বসতি হলেও ঐ এলাকায় ৫/৬টি গ্রাম **ডুকপা:** জনগোষ্ঠীর বসতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের জীবিকা বলতে তেমন কিছু নেই গৃহ সংলগ্ন সামান্য জমিতে চাষবাস করে থাকে, তাদের মধ্যে একটি অংশ ফরেস্ট মজুরের কাজ করে এবং কেউ কেউ পূর্ত দপ্তরের রাস্তার মেরামতির কাজ করে থাকে। এছাড়া ঐ অঞ্চলের তাদের উৎপাদিত আদা, স্কোয়াশ, কমলা, ইত্যাদি বয়ে শহরে এনে মজুরি অর্থ উপার্জন করে, আবার এরা গরু পালন করে তার দুধ, ছানা সমতলে এনে বিক্রি করেও কিছু আয় করে থাকে।

ধীমাল রাভা: এই রাভাদের জীবন-জীবিকা মূলত কৃষি কাজ এর উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করতে করতে কৃষি কাজে রপ্ত হয়ে ওঠে, কোনো এক সময়ে এরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজন মিটিয়ে নিত, কিন্তু এখন বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে তারা হাট বাজারের উপর নির্ভর হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষকতা ও অন্যান্য চাকরিতেও যুক্ত হয়েছে।

মেচ: এক সময়ে মেচরা কৃষি কাজের সঙ্গে থাকলেও পাশাপাশি চা শ্রমিকের কাজও তারা রপ্ত করেছে। নেপাল ও তরাই অঞ্চলে বসবাস করে এসেছে, এখন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষি কাজ, চা শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি

শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে, শিক্ষকতা, সরকারি চাকরি ও ছোট খাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে।

গারো: অতীতে গারোরা ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের পর, তারা কেউ উন্নত কৃষি কাজ জানতো না, ফলে তাদের আদিম কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহার করে ঝুম চাষ করতো। এদের ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা ছিল, ফলে এরা গরু, মহিষ, ছাগল, শুকোর, মুরগি এই সব পালন করেও জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা তাদের উৎসবগুলিতে এই সব প্রাণীকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো। বর্তমানে শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে তাদের অধিকাংশই প্রতীরক্ষাসহ পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, শিক্ষকতার সঙ্গেও অনেক যুবক-যুবতীরা পেশায় কর্মরত।

টোটো: পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে টোটোরা একটি জনগোষ্ঠী, এক সময় এরা যাযাবরের মতোই জীবন যাপন করতো। এরা উন্নত কৃষি কাজে রপ্ত না হলেও ঝুম চাষ ও স্থানান্তর চাষ অর্থ্যাৎ কাউ, ভুট্টা, মাড়োয়া, ধান, কার্পাস ইত্যাদি চাষ করে আসতো। এ ছাড়াও তারা বনে বনে ঘুরে বনের ফলমূল বনজ শাক সব্জী সংগ্রহ করে এবং বনের পশু শিকার করে, বন থেকে ঔষধী গাছ সংগ্রহসহ মধু, গালা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ সমতলে বিক্রি করে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতো, এর পাশাপাশি মহিলারা কাঠের টাকুতে সুতো কেটে তাঁতে নিজেদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র উৎপাদন করতো। বাঁশের কাজে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন মাছ ধরার যন্ত্র তৈরি করে মৎস শিকারেও এরা খুবই পারদর্শী।

লিম্বু: লিম্বুরা নেপালে থাকাকালীন তাদের মূল জীবিকা ছিল কৃষি কাজ ও পশুপালন, এই এলাকায় বসবাসকালে তারা কৃষি ও অধিকাংশই চা বাগিচার শ্রমিকের কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও এখন তারা শিক্ষার আলোয় এসে ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নেপালী ভাষাকেই বেছে নিয়ে কথা বলে।

ভুটিয়া: ভুটিয়াদের এক সময় মূল পেশা ছিল ব্যবসা ও পশুপালন। বিশেষ করে শীত প্রধান পাহাড়ি এলাকায় দীর্ঘ লোমযুক্ত বিভিন্ন পশুপালন করে তার লোম সংগ্রহ করে পশু লোম বিক্রি, পাশাপাশি ঐ লোম দিয়ে নানান শীত বস্ত্র তৈরি করে সমতলের বিভিন্ন শহরে তা বিক্রি করে জীবীকা নির্ভর করে, এই কাজে মহিলাদেরই বেশি দেখা যায়, অন্য সময়ে তারা কৃষি কাজেই যুক্ত থাকে।

লেপচা: এরা ভারতের অঙ্গরাজ্য সিকিমে ও দার্জিলিং পার্বত্যভূমির উপত্যাকা

গুলিতে কৃষি কাজের মধ্যে দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতো। উপজীবিকা হিসেবে ছিল পশুপালন। তাদের উৎপাদিত কৃষি ফসল হিসেবে এলাচ একটি মূল্যবান বস্তু।

তুরিঃ এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো অতি দরীদ্র শ্রেণির, কৃষি কাজ করবার মতো জমিজমা নেই বললেই চলে। অধিকাংশই বাঁশের কাজ করে আসছে। তাদের তৈরি বাঁশ দিয়ে বাঁশের পাত্র, কৃষকের মাথায় বাঁশের ছাতা (মাথাল), মাছ ধরার নানান যন্ত্র, ডালা, ঝুড়ি, পাখা এই সব নানান ধরনের জিনিসপত্র তৈরি ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

ধীমালঃ ধীমালরা কৃষি কাজে খুবই পটু, তরাই অঞ্চল থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কৃষি সম্প্রসারণে এরা অনেকটাই এগিয়ে, আবার চা-বাগানের শ্রমিকের কাজেও যথেষ্ট দক্ষ, কৃষি ও শ্রমিকের কাজে আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে এরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছে।

এই সকল জনজাতির জীবনধারা পরিবর্তনশীল, কারণ শিক্ষা বিস্তার ও শহরে ছোয়া এদেরকে স্পর্শ করেছে বলেই এদের জীবনযাত্রায়ও তার প্রভাব পড়ছে। শিক্ষা ও বিভিন্ন চাকরি ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর থেকে তা বদলাতে শুরু করেছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই এলাকায় বসবাসের সূত্রে নানান জনজাতির মধ্যে একটি পারিবারিক মিশ্রণ তৈরি হয়েছে, যার ফলে আগামী প্রজন্ম হয়ত বা তারা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার ও জীবন যাত্রা খুব দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলবে বলে মনে হয়। সেটা দেখা মুধু সময়ের অপেক্ষায়।

উত্তরবঙ্গে জীবন-জীবিকার পরিবর্তন: একটি রেখাচিত্র

রণজিৎ কুমার মিত্র

উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন এই শিরোনামে লেখার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলে নেয়া ভালো যে কোনো ছকভিত্তিক পরিসংখ্যান বা থিওরি অনুসারী কোনো প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এই লেখা নয়, অনুজ প্রতিম সাকিল মাসুদের অনুরোধেই তার পত্রিকার জন্য আমার অভিজ্ঞতার থেকে কিছু দৃষ্টান্তমূলক রেখাচিত্র তুলে ধরেই এই রচনার নির্মাণ। সুতরাং ত্রুটি বিচ্যুতি যদি কিছু ঘটে যায় তবে তার দায় একান্ত আমারই অনুজ-প্রতিম সম্পাদকের নয়।

অতীতের বৃহৎ উত্তরবঙ্গের সীমারেখা পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবন জীবিকারও বৃহৎ পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গ। একদিকে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার দার্জিলিং। আর একদিকে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর বগুড়া ও পাবনা। অতীতে এইসব জেলা ও জনপদগুলি নিয়েই ছিল অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গ। একই ভৌগোলিক পরিসর, গাছপালা নদ-নদী-মাটিতে উত্তরবঙ্গের মানুষেরা জীবন ও জীবিকাতে পরস্পর সংলগ্ন ছিলেন দীর্ঘকাল। বাংলাদেশ ও ভারতের অংশ মিলে উত্তরবঙ্গ ছিল এক বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলাকে উত্তরবঙ্গ নামে অভিহিত করেছিলেন।

১৮২৮ সালে রাজশাহী বিভাগ যখন গঠিত হয় তখন তার অন্তর্গত ছিল রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, মালদা ও পাবনা জেলা। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা তখনও প্রশাসনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ও ১৮৮০ সালে দার্জিলিং জেলার আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগেই রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত হয় আটটি জেলা, বৃহত্তর রংপুর-রাজশাহী-দিনাজপুর-মালদা-পাবনা-বগুড়া-জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং ও দেশিয় রাজ্য কোচবিহার। মোগল শাসনকালে কোচবিহার রাজ্যের রংপুরের বাহারবন্দ, ভিতর বন্দ ও ঘোড়াঘাট বন্দর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

রংপুরের অংশ ছিল বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। এই অঞ্চলটি উত্তর রংপুর হিসেবেও পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসকেরা বৃহদায়তন রংপুরকে

ভেঙে তিনটি জেলা তৈরি করেছিল রংপুর-জলপাইগুড়ি-গোয়ালপাড়া। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুখ্যত বাণিজ্যিক স্বার্থেই এইসব পরিবর্তন করত। বলা বাহুল্য এইসব ঘটনা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন ও জীবিকাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করতে এসেই ভারতবর্ষকে দখল করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগে উত্তরবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার ভয়ংকর ক্ষতি হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয়নি। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলে অষ্টম শতাব্দী থেকে পূর্ব হিমালয়ের তিব্বত পরবর্তীকালে ভুটান ও সিকিমের শীতকালীন বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। শীতের সময় তিব্বতি-ভুটানি -সিকিমিরা আসতেন, এদের সমুলে প্রবেশদ্বার ছিল ভুটান।

দেশভাগের পর এই ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে যে জেলার যা বিখ্যাত তাই নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করাই ছিল ইংরেজ বণিকদের এদেশে বসবাস করবার অগ্রাধিকার। মালদহের আম-ধান, রংপুরের ধান-পাট,গুড়। দিনাজপুরের চাল, চিরা, গুড় জলপাইগুড়ির পাট-চা-তামাক। এসব ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে ছিল প্রচুর বন সম্পদ। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা মুনাফা লোভে কাঠের ব্যবসায় নেমেছিল। সে সময় কাঠের আসবাবপত্র ও রেল লাইনের জন্য কাঠের খুব চাহিদা ছিল। এসবের পরেই নতুন বাণিজ্য ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, চা বাগান প্রথমে আসামে পরে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে।

অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়ি ও রংপুরে ব্যাংকিং ব্যবসাও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্থিক লেনদেন ও বাণিজ্য সহায়ক বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক ছিল। এই অঞ্চলে উৎপাদিত চা, পাঠ, তামাক, কাঠ, চিনি ইত্যাদি বিপণন ব্যাংকের আওতার মধ্যে থেকেও হতো। ব্রিটিশ ভারত উত্তরবঙ্গে কখনো শিল্প স্থাপনের কথা ভাবেনি। উত্তরবঙ্গ ছিল শিল্পের কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্র। পাট চাষের মূল ক্ষেত্রগুলি ছিল পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। কলকাতা ও হাওড়ার দুধারে ছিল অসংখ্য জুটমিল। রেল যোগাযোগ উত্তরবঙ্গকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, দেশভাগের পর তার অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।

১৮৯১ সালে লন্ডনের একটি রেলওয়ে কোম্পানি চা- শিল্পের অগ্রযাত্রার জন্য বেঙ্গল ডুয়ার্স নামে একটি রেল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই কোম্পানি লালমনির হাট থেকে মোগলহাট-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-মালবাজার হয়ে হিমালয়ের পাদদেশ ভুটান সীমান্তবর্তী ডুয়ার্স পর্যন্ত মিটারগেজ

রেলপথ নির্মাণ করেছিল। আসাম মেইল নামে একটি ট্রেন সান্তাহার স্টেশন থেকে আসামের আমিনগাঁও পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করতো।

১৯১৫ সালে পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হলে দার্জিলিং মেইল উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর এনেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরবঙ্গে যে বিস্তৃত জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল, ১৯৪৭ এর দেশভাগে উত্তরবঙ্গের মাঝখান দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া এই বিরাট জনপদের মানুষের জীবন ও জীবিকায় বড় আঘাত হেনেছিল।

দেশভাগের পর উত্তরবঙ্গ প্রান্তিক হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের ভূগোল, সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান, মানুষের জীবন-জীবিকা সবকিছু পাল্টাতে থাকে। রেডক্লিফ এর লাইন অনুযায়ী কাঁটাতারের বেড়ায় একই ভূখণ্ডের মানুষকে আলাদা হয়ে যেতে হলো। একসময় বাণিজ্য, চাকরির সন্ধানে দলে দলে মানুষ উত্তরবঙ্গে আসতেন। আর বর্তমানে দুই পাড়ের উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষ সস্তায় শ্রম বিক্রির জন্য ভিন্নরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে।

উত্তরবঙ্গের মানুষদের জীবন জীবিকাই এখন একটা বড় প্রশ্ন, পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হওয়া। জমির উপর অধিকার হারিয়ে বহু মানুষ ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছেন, তারাও নিয়মিত আজকাল গ্রামেগঞ্জে কাজ পান না। কাজের জন্য পাড়ি দিতে হয় ভিন্নরাজ্যে। ঢাকার রাজপথে এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে এক রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার ঘরবাড়ি রংপুরের একেবারে শেষপ্রান্তে, জলপাইগুড়ির তিনবিঘা সীমান্তের কাছে একটি গ্রামে। তেভাগা আন্দোলনের ফলে তার পূর্বপুরুষেরা যে জমির অধিকার আদায় করেছিল তা তারা ধরে রাখতে পারেননি। ক্ষেত মজুরি করে সারা বছর চলে না, তাই রিক্সা চালাতে হয়। গ্রামে কাজের হাহাকার। আগে সীমান্ত পেরিয়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতেও সে রিকশা চালিয়েছে। কারণ সেই জায়গাগুলি ছিল তাদের নিকটবর্তী, পরে সীমান্তে কড়াকড়ি হওয়ায় তারা দলবেঁধে ঢাকাতে এসেছে রিকশা চালাতেঅ দু-তিন মাস পর পর রোজগার যা করে তা নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়। সংসার চালানোর বন্দোবস্ত করে আবার ঢাকা শহরে ফিরে এসে রিক্সা চালায়। মতিঝিলের একটি বারোতলা হোটেলে কয়েকটি অল্পবয়সী হোটেলকর্মী ছেলের সাথে আলাপ হয়েছিল। সদ্য ইস্কুলের পাড়া শেষ করে তারা শহরে এসেছে কাজের জন্য, হোটেলে কাজ করছে, পয়সা জমিয়ে তারা বিদেশের হোটেলের কাজের জন্য পাড়ি দেবে মনস্থ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অংশের উত্তরবঙ্গে গ্রামের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষ যাদের নিজস্ব

জমি জমা নেই, ক্ষেতমজুরির কাজ ও গ্রামে পাচ্ছেন না, তারা নির্মাণকর্মী হয়ে দক্ষিণ ভারত ও বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছেন কাজের জন্য। করোনার সময় তাদের বাস্তব এবং করুণ ছবি সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকাগুলিতে কাজের জন্য ভয়ংকর হাহাকার।

দুইদেশের উত্তরাংশের জনপদগুলিতে উন্নয়নের তাগিদে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে গ্রাম জীবনের অলিতে গলিতে। মাটির খড়ের ঘরের সংখ্যা কমেছে। সড়কপথ মোরামের বদলে পিচ ঢালাই হয়েছে। গ্রামগঞ্জেও ঠিকেদার নামক এক শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে দুর্নীতি বেড়েছে। দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে গ্রামের একাংশের মানুষ বিত্তবান হচ্ছেন, আর একদল মানুষ দরিদ্র হতে হতে গ্রাম থেকেই উৎখাত হচ্ছেন।

আগেকার দিনের মতো বলদিয়া বলদের পিঠে বস্তা বোঝাই মালপত্র নিয়ে চলেছে এমন দৃশ্য আর দেখা যায় না। নদীপথে ব্রিজ হওয়ায় আগেকার মতো নৌকা পারাপার করে যেসব মাঝিরা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তারা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। পুরনো কৌলিক বৃত্তিগুলিও আজ আর তেমন নেই। অনেকেই আলোকপ্রাপ্ত, শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। গ্রামের সাবেক কুটিরশিল্পগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়। বাঁশ বাখারি বা কাঠ দিয়ে গৃহস্থালির নানা জিনিস যারা তৈরি করতেন তারা পেশা বদলে ফেলেছেন। তার বদলে প্লাস্টিক এনামেল, স্টিলের জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। কুম্ভকারের তৈরি মাটির বিভিন্নপাত্র এখন শুধু প্রদর্শনীর বস্তু।

গ্রামীণ হাটবাজারের চেহারাও বদলে গেছে। গ্রামের দিকে অনেকের ঘরেই এখন স্কুটার, সাইকেল। গ্রামে গ্রামান্তরে মেয়েরাও দূর-দূরান্ত থেকে সাইকেল চালিয়ে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। এইসব মেরামতি দোকানও প্রচুর হয়েছে। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলিরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন গ্রামীণগঞ্জেও সরকারি বিদ্যালয় এর পরিবর্তে প্রাণভেটের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলো গড়ে উঠেছে। সাধারণ নিম্নবিত্তঘরের ছেলেমেয়েদেরও অভিভাবকেরা অনেক কষ্টে টাকা পয়সা রোজগার করে এইসব স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গের সীমান্তের সমস্যা, ছিটমহল, ভূসংস্থানগত রাজনীতি এসবও জীবন- জীবিকার বড় অন্তরায়। একদা চাষের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল যৌথ পরিবার যৌথ অর্থনীতির সমাজ, আজ আর সেসব নেই। নতুন সমাজ অর্থনীতির ব্যবস্থার ধাক্কায় সব বদলে যাচ্ছে। জীবন-জীবিকায় স্বনির্ভরতা ও আধুনিকতার প্রতি মোহগ্রস্ততা এই সব কিছু নিয়েই উত্তরের মানুষের জীবন ও

জীবিকা এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ ও সমাজ এগিয়ে চলছে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আগামী দিনে সে কোথায় দাঁড়াবে, আবার কোনো নতুন সমন্বয়, নতুন সংস্কৃতি, নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর, এই প্রশ্ন নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, জলপাইগুড়ি, ভারত।

হাক-ডাক-পেশা: জীবন জীবিকা

দেবব্রত চাকী

সে নিতান্তই বালক বেলার কথা। বাড়ির সামন দিয়ে নিয়মিত এক ফেরিওয়ালার হাক-ডাক শুনতাম, হাতা ভাঙ্গা, তামা ভাঙ্গা টর্চলাইট ভাঙা সাইকেলের বেল অচল পয়সা আ-আ। একটা দীর্ঘ টান দিয়ে হাকটা শেষ হতো। সেটা ছিলো খুব শ্রুতিমধুর আমরা খেলারছলে সেটা ফিল করতাম। খুব মজা পেতাম কিন্তু তখনও আমাদের বোধজ্ঞান হয়নি। যে, সেটা একজন মানুষের জীবন-জীবিকা। জীবিকার টানেই সে ফেরি করে বেড়াত। ঐ বাতিল দ্রব্যগুলি স্বল্প মূলে ক্রয় করে তা আবার তার মহাজনের কাছে বিক্রি করতো। হয়তো এভাবেই তার সংসার জীবনের নুন্যতম চাহিদা পূরণ হতো। অনেক পরে বুঝেছিলাম এটাকে বলে পেশা। মানুষের জীবন ধারণের এক অন্যতম অবলম্বন।

ঐ সময়কালে বাড়ির সামনে আরেকজনের হাক শুনতাম এক টাকায় রসগোল্লা দশটা। তখন এক টাকার যথেষ্ঠ মূল্য। স্কুলের টিফিন টাইমে ৫ পয়সা দিয়ে আইসক্রিম কিনে খেতাম। যারা বিক্রি করতো তাদের আইসক্রীমওয়ালা বলে জানতাম। অশীমদা বলে, একজন কোচবিহারের জেনকিনস স্কুলের সামনে আইসক্রিম বিক্রি করতো। এটাই ছিলো তার গরম কালের পেশা। এই পেশার সাথে যুক্ত অনেককে দেখতাম শীতকালে তিলের খাজা বিক্রি করতে। এভাবেই হয়তো তারা সংসার নির্বাহ করতেন। নিঃসন্দেহে এক কঠিন জীবন সংগ্রাম। শুধু কি তাই? স্কুলের সামনে অনেককেই দেখতাম ঝালমুড়ি চানামসলা ছো-বুট আচার, এমনকি কেক-ফুচকা বিক্রি করতে।

মনেপড়ে মহারাজা নিপেন্দ্রনারায়ন হাইস্কুলের সামনে ঠাকুর নামের একজন তার ঠেলা গাড়িতে করে এই সমস্ত বিক্রি করতেন। যেমনভাবে শহরের দক্ষিণে নিউটাউন গাল্‌স স্কুলের সামনে এভাবেই গাড়িতে করে ছোলা-বুট, বাদাম, চানা-মসলা, বিভিন্ন রকমের আচার বিক্রি করতেন। আবাল বৃদ্ধাবনিতার কাছে তিনি রবি নামে অখ্যায়িত হতেন। এভাবেই হয়তো তিনি তার সংসার প্রতিপালন করে গেছেন।

সমম পাল্টায়, দিনবদলায় হয়তো তার সঙ্গে সঙ্গে সুখ শান্তিরও পরিবর্তন-ঘটে। কিন্তু আজও বিভিন্ন স্কুল কলেজের গেটে এই ধরনের মানুষদের সন্ধান মেলে, যারা বংশ পরম্পরা এই ধরনের ব্যবসা করে চলেছেন। এটাই তাদের জীবন-জীবিকা, স্বাচ্ছন্দের পেশা। অন্য পেশা হয়তো লাভজনক, কিন্তু

তাদের কাছে ঝুঁকির। ফলে পরিচিত পেশায় তুলনামূলক কম আয় হলেও তাদর কাছে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দের। এটাই তাদের জীবন ধারণের নিশ্চিত পথ হিসেবে বিবেচ্য।

যেমন শৈশবকাল থেকে দেখতাম দুজন মানুষকে আমাদের পাড়ায় সংবাদপত্রের হকারি করতে। একজনকে পাড়ার সকলেই ডাকতেন লামুদা বলে। পুরোনাম লামু চন্দ্র দে। তার সাকিন শইরের উপকণ্ঠে টাকাগাছি-রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের টাঙ্গনমারী গ্রামে আসে। পাজ্ঞাবি পাজামা পরিহিত দীর্ঘ মেদহীন চেহারার লমুদা যুগান্তর পত্রিকা বিলি করতেন। আমার ছোট জ্যেঠার (প্রফুল্ল কুমার চাকী) বাড়িতে তিনি যুগান্তর পত্রিকা দিতেন। সেই সময়কালে কলকাতা থেকে একদিন পর পেপার এস পৌঁছতে। দুপুরের পরে তা পাঠকের ঘরে পৌঁছে দিতেন লামুদার মতো পেপারওয়ালারা। সেই সময়কালে আরেকজন আন্দবাজার পত্রিকা পৌঁছে দিতেন সম্ভবত তার নাম ছিলো কালাচাঁদ তলাপাত্র। আমাদের নিউ টাউন সংলগ্ন চাকীর মোর এলাকায় তিনি থাকতেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। লামুদা পেপারের হকারি করেই সংসার প্রতিপালন করছেন। ৩ পুত্র ও এক কন্যাকে মানুষ করেছেন। এরকম উদাহরণ হয়তো অজস্র রয়েছে। প্রত্যেক শহর-গঞ্জ-আধাশহর কিংবা নগর সভ্যতা যেখানেই বিকশিত হয়েছে। সেখানেই সংবাদপত্র ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি বিক্রয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বহু মানুষ জীবন জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। তবে একটি বিষয় অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তাহলো— অতিমারী করোনা এই পেশার উপর যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলেছে এবং পরিস্থিতির চাপে অনেকেই পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এই পেশার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় গ্রেট অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে সংবাদপত্র পাঠ। এটা বিজ্ঞানের আর্শিবাদ না অভিশাপ তা সময় বলবে।

একটা সময় ছিলো সকল গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে বেত ও বাশের তৈরি সামগ্রীর বহুল প্রচলন ছিল। চেয়ার, টেবিল, সোফা, মোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মধ্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়ত এগুলির মেরামতের। ফলে কিছু মানুষ (এদরকে শিল্পী হিসেবে আখ্যয়িত করাই যথার্থ) পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলো। বেতের জিনিস ভালো করানো, রাস্তায় তারা হাক পাড়তেন। সমাজে তাদেন যথেস্ট কদরও ছিলো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেত ও বাঁশের ব্যবহার্য সাগ্রীর চল বা ব্যবহার কমছে। ফলে তাদের জীবন-জীবিকায়ও সঙ্কট ঘনীভুত হচ্ছে।

এরকম অপর একটি পেশা আমরা শৈশব কৈশোরে দেখেছি তাহলো

শীল্লাঠা ধার করানো। পাড়ায় পাড়ায় হাক ডাকতেন– 'শিল্লাঠা ধার করাবেন, শীলপাঠা? আজ রেডিমেট মসলা কিংবা মিক্সং মেশিনের দৌলতে শীলপাঠা আজ ক্রমশ ব্রাত্য। আজকালকার দিনে সংসার জীবনে শীলনোড়া বা পাঠা প্রকৃত অর্থেই মহাট কর্জন। শিল পাঠায় মসলা বাটতে অভ্যস্ত তা বর্তমান সময়কাল মধ্যবিত্ত জীবনে নিঃসন্ন্নেহে এক বড় প্রশ্ন। ফলে শীলপাঠা ধার করানো সম্পর্কীয় হাক যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মধ্য পঞ্চাশে এসে যখন কৈশোর-শৈশবের স্মৃতিকে রোমন্থন করি তখন আরও কিছু হাক কানের কাছে ভেসে আসে। যেমন একজন মাথায় একটা বড় গামলা নিয়ে হেঁকে যেতেন এক টাকায় রশোগোল্লা দশটা। হয়তো দু একবার খেয়েছি। খারাপ মনে হয়নি। কিন্তু বড়রা বলতো আমার রশোগোল্লা হয় কী করে! না উত্তর খোঁজার বয়স তখন আমার হয়ে উঠেনি। যেমন জনৈক ডিঙা ঘোষ কয়েকটি এ্যারামিনিয়াম এর ভান্ড দড়িতে ঝুলিয়ে হাঁক পাড়তে পাড়তে যেতেন– 'ক্ষিরের প্যারা লাগবে, ক্ষিরের প্যারা? তিনি ঘিও বিক্রি করতেন। সকালের দিকে একটা নির্দিষ্ট সময় তিনি ফেরি করে যেতেন। তার তৈরি প্যারা যথেষ্ঠই স্বুসাদু ছিল। ঠিক এরকমই একজন বিকেলের দিকে নিয়মিত ফেরি করতেন সুরেলা কণ্ঠে।

'দিলখুশ, খেলেই মন খুশ।' বেচাকেনা কম হলে তিনি সুর করে বলতেন– 'এ পাড়ার খরিদ্দাররা দেখছি সকলেই বেহুশ।' আমরা আবার পাল্টা বলতাম- 'দিলখুশ খেলে আফসোস।' উনি এর জবাব দিতেন– 'উল্টাপাল্টা কথা যে বলে তারা সবাই বেহুশ।' খুব মজা পেতাম কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি যে এটা ওনার পেশা, জীবন ধারণের মাধ্যমে। এভাবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে দিলখুশ নামক সুস্বাদু পাঁপড় বিক্রি করে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের অন্নের সংস্থান করেন। আজ সে কথা ভাবলে নিজের উপর ঘৃণা হয়, লজ্জাবোধ হয়। কারো পেশা জীবন-জীবিকা হাসির বস্তু নয়।

যাইহোক আলোচনার শেষ পর্বে আমি আরেকটি পেশার কথা উল্লেখ করবো– কুঠিরশিল্প বলাই ভলো, সেটি হলো ফাটিয়া শিল্প। পাঠের তন্তু দিয়ে দড়ি বানিয়ে সেটার সাহায্যে এক রকম থলি তৈরি হতো। যার মধ্যে তুলো ভরে তা বিদেশে রপ্তানি করা হতো, মূলত তিস্তা নদীর ডান পার্শ্বে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পাড় মেখলিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, বক্সিগঞ্জ, হেমকুমারী অঞ্চলে দেশি সুতি পাঠ দিয়ে তৈরি এই সকল থলি জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কিংবা মারোয়ারি মহাজনদের মারফত

মুম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে সরবরাহ হতো এবং সেখানে এগুলির মধ্যে তুলো বোঝাই করে তা মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সিনথেটিক ব্যাগ ব্যবহারের কারণে পাটজাত এই ফটিয়া শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজন বাধ্য হয়ে পেশা পরিবর্তন করে কৃষি কাজ, দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিকে পরিবর্তন হয়েছিলো। কালের নিয়মে আজ বহু পেশা অবলুপ্ত। জীবিকা পরিবর্তন আজ বহু মানুষের নিত্য দিনের সঙ্গি। হয়তো এটা কালের ধর্ম। জীবন-জীবিকা পরিবর্তনের এই স্রোতে টিকে থাকাটাই শ্রমজীবি মানুষের আসল লড়াই। এটাকেই হয়তো বা বলে জগৎ সংসার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আশুতোষ সরকার, মহঃ সৌকত আলী, মিতালী চাকী সরকার, প্রফুল্ল রায় ও স্বপন নন্দী।

লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গের যাযাবর জীবন ও তার সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ পান্ডে

উত্তরবাংলার গ্রাম শহর এবং তার মানুষজনকে ঘিরে জনজীবনের যে পরম্পরা প্রকৃতি তার ইতিহাস সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই প্রায় কোনো না কোনো লোক সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত। জীবনের সংহত বিকাশে আনন্দ দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা, কামনা ভালোবাসার মধ্যে সেইসব সম্পর্ক লোক-পরম্পরায় মিশে আছে। এই প্রজন্ম পরম্পরার বহমানতা পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে প্রবাহিত। লোকায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হলো সেই লোকজীবন যার বহমান ধারা ও তার অনুশীলন। বাস্থান, খাদ্য পানীয়, পোশাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, উৎপাদন, সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র ছড়া, ধাধা প্রবাদ, গীতি-গীতিকা, কথা, স্থান নাম, ব্যক্তিনাম, লোক আশীর্বাদ, অভিশাপ, শপথ, লোকগালি, বিশ্বাস-সংস্কার প্রথা, আচার, আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান, নৃত্য-অভিনয়, খেলাধুলা, আল্পনা, দেয়ালচিত্র, পটচিত্র, ঘটচিত্র, ইত্যাদিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতি। আমরা উত্তরবঙ্গের যাযাবর জনজাতির সংস্কৃতির যে ছাপ বা বৈশিষ্ট্য লোকজীবনে প্রভাব ফেলেছে এবং লুপ্তপ্রায় এই সংস্কৃতির বাহক যারা তাদের জীবন চর্চা বিশ্লেষণে তাদেরই ফিরে দেখার প্রয়াস খুঁজে নেব।

কারা এই যাযাবর? পশ্চিবঙ্গের উত্তরের কয়েকটি জেলায় হিমালয় পর্বতের সমতল ভূমির বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত সাধারণত ইন্দো মঙ্গোলয়ের বংশ ধরেরা বাস করত। এরা 'কিরাত' বলে পরিচিত। এই কিরাতেরা পরে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র 'উত্তর ভারতে।' স্থায়ী কোনো জনপদে এরা দীর্ঘদিন থাকতে রাজী ছিল না তার কারণ হিসেবে ভিন্ন কোনো শাখার বিশেষত ভূমধ্যসগারীয় জাতির কোনো শাখার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল এমনটা ভাবা হয়। পরে গঙ্গা উপত্যকা পথে পূর্বদিকে ছোটে। ক্রমশ উত্তর প্রদেশের গোরখপুর, দোহরিঘাট, সিবান বিহারের পাটনা, মুঙ্গের, সাহেবগঞ্জ ভাগলপুর, কাটিহারা হয়ে ঢুকে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষত মলেদা, নবাবগঞ্জ, বালুরঘাঁট এবং রাজশাহী (বাংলাদেশ) তে এরা ছড়িয়ে পড়ে। স্থায়ী কোনো বসবাসের লক্ষ্য এদের ছিল না। তাই দীর্ঘদিন একই স্থানে তারা থাকেনি। এদের সরকারি রাস্তার পাশে ফুটপাত, স্টেশন চত্বর কিংবা ভোল্টল্যান্ড জাতীয় ফাঁকা মাঠে তাবু খাটিয়ে থাকতে দেখা যায়। পশু শিকার মূলত প্রধান জীবিকা। তবে এই জীবিকারও বিবর্তন ঘটেছে। এখন পাখি শিকার, চুরি করে মোষ গরু বিক্রি করা এবং বিভিন্ন রকম শারীরিক কদরতের খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জনই

বর্তমান জীবিকা। সংঘবদ্ধভাবে চলাফেরা স্ত্রীপুত্রসহ দলের অন্য সদস্য প্রায় একশ বা তারও বেশি। জীবজন্তু নিয়ে বোঁদর, ঘোড়া, বেজি, খরগোশ খেলা দেখানো এদের জীবিকার অন্য একটি দিক ছিল।

জীবনকে বাজি রেখে চলার দুঃসাহসিক অভিযানকে ঘিরে যাযাবরী চর্যা এরা গ্রহণ করে বলে এদের বাজিকর বলা হয়। আত্মিক পরিচয়ের সংকট নিয়ে এরা প্রায় একশ-দেড়শ বছর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে খেলা দেখিয়েছে, দড়ির খেলা, ভানুমতীর খেলা, কিসিমের খেলা এমনিভাবে খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে দিন গুজরান করেছে, একটা সময় যুগ যন্ত্রণা ও সংকট এদের পীড়িত করে ফলে শিকার হয় সমাজ বাস্তবতার। এরা নিজেরা নিজেদের উৎস-উৎপত্তি-বিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজে পায় না। উত্তর পায় না কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তারা বয়ে বেড়ায় শরীরে আর রক্তে! হিন্দু না মুসলিম নাকি দুই পরিচয়ের বাইরের কোনো পরিচয়। বর্তমানে এরা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া রোহনপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে। এপারের বিশেষত দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ-মালদা বিহারের কিছু অঞ্চলে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তি, ঘোড়ার গাড়ি চালনা, গাছ গাছড়া ও পাহাড়ি অঞ্চলের কিছু শেকড় বাকড় নিয়ে টোটকা কবিরাজী শিখে তাকে উপার্জনের মাধ্যম করে নিতে দেখা যায়। জনসমাগম করে হাটে কিংবা শহরের ফুটপাতে এমনকি মেলাতে, তারা খেলা কিংবা জাদু প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন মেলায় এক্সপো, মিনা বাজার প্রভৃতিতে সার্কাস-শোতে এরা এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এভাবেই গতিশীল জীবনের আনন্দ দুঃখ বিষাদ মিলে মিলে অনুভবের অদ্ভুদ জীবন যাত্রা তৈরি হয়েছে এদের। চলমান জনগোষ্ঠীর যাযাবরী জীবনের প্রচলিত রীতিনীতি, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, লোক বিশ্বাস অন্য জীবন জীবিকার মতো অন্য কোনো গোষ্ঠীর মতো এক সময় সময়ের বৃত্তে ইতিহাস রচনা করে বসে। আলো প্রবন্ধে তারই সত্য অন্বেষণের পথ খোঁজার প্রয়াস তৈরি হয়েছে।

বাজীকর জনগোষ্ঠীর ভাষা: চলমান জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই জনগোষ্ঠীরা অর্থ্যাৎ দলের সদস্যরা যে ভাষা মুখে ব্যবহার করে তার সংহত ও নির্দিষ্ট রূপ পাওয়া মুশকিল কেননা এদের মুখে ব্যবহৃত ভাষা বা ধ্বনি বিভিন্ন স্থানিক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এদের নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গিমার সঙ্গে এলাকাগত অবস্থান কালে সেখানের ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য মিশে গিয়ে একটি মিত্র ভাষার অস্তিত্ব তৈরি করে। তাই বাজিকরের ভাষা আয়ত্ত করার

ভাষা। উত্তরবঙ্গে মালদা, দিনাজপুরের বাজিকরদের কিছু ভাষা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

শব্দ প্রসঙ্গঃ কেমন করে>কেংকা, দুঃখ>দুষ্কু, দুগ্ধবতী>গারতন দিদা>মনি, মোষ>বৈঁসী, কালীমাতা কালীমাই,কাজকর্ম,বিয়ানো>বিয়ালাক, মর্তন>পারা, পোষা মোয়েমানুষ>রাখনি প্রতাপ>পরতাপ, প্রীতম>পিতেম, প্রেমা>পেমা, গৃহস্থ>গোরস্ত, স্থিতি >থিতু, স্তম্ভ>খাস টানাগড়ি>টাঙ্গা, কৃপন>কশ্স্যা, সঙ্গীনের ছেলে>সাৎলাচোঁলা, আকাজ>আকাশ ইত্যাদি।

প্রবাদ প্রবচনঃ ১) যেমন পড়া, ২) ঘর পুড়ল্যা গরু্য সিন্ধ্যুরা মেঘেন ভরায়া, তজাত বদল্যালো হাড় বদল্যালো না, ৪) বাহিরে দ্যাখো ধূতির ফরকোন, ঘরে দ্যাখো ছুঁচার ঠকরান ৫) বুড়হার রোষ, বারো কোশ্ ৬) বেশি মাছে বোগলা কানা ৭) অন্যের পরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া ৮) সুতার সময় মুতার ধ্যারাম ৯) নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই ১০) ঘোড়া চেনা যায় মদ্যানে কুটুম চিনা যায় লেদ্যানে, প্রভৃতি। এদের উচ্চারণে ধরা পড়ে বরেন্দ্রী ও খোটাইয়ের রূপ। রাজমহল মানিকচক, কালিয়াচক, হাবিবপুর-গাজোল, বালুঘাট ও রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া পাচবিবি প্রভৃতি অঞ্চলের মুখের ভাষার শব্দ মিলে মিশে এক 'মিশাল ভাষা' তৈরি হয়েছে।

লোক উৎসব ও অনুষ্ঠানের পরিচয়ঃ উত্তরের কিছু লৌকিক শস্যোৎসব, ফসলকাটার গান, পাতা নাচ, হালু গান এই সমাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। হাপু একটি দীর্ঘ ছড়া। গান ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটা সুরে গাওয়া হয়। অনুষঙ্গে থাকে গায়কের হাতের একটি পাঁচল লাঠি আর মুখ নাক ও বগল বাজানো অদ্ভূত বিকৃত ধ্বনি। গানের সমে সমে লাঠি দিয়ে গায়ক তাঁর সর্বাঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করে।

বাজিকরদের বিবাহ প্রথা চালু আছে। অদ্ভূত পরিবেশ তৈরি করে পাত্র পাত্রীকে বসানো হয়। লাল সুতোয় ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে বর কনেকে বসিয়ে কাপড় দিয়ে ঘিরে ঘিরে রাখা হয়। বর কনের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। এদের মালা পুতির মালা হয়ে থাকে। এদের বিয়ের উল্লেখ্যগান যে গানগুলি সাধারণত মেয়েদের মুখেই গীত হয়ে থাকে।

বিয়ের গানঃ (এক) লার পাড়াঙ্গি রেশকি ডোরি........

(দুই) এসে হালাদি লাগিরে
এতো মায়েরা তেল মেশড়ে মুড়ে

(তিন) দেও আওয়েতো দেওরে ভাই,
বান্ধনা তো সারিমা দে

(চার) হালদি বাটা মরিচ বাঁটা জোড়া পুতল্যার বিহা
ওই যে আসিছে নয়া নসা গামছা মাথায় দিয়া
(পাঁচ) যাতা ভারি টিঁকি ভারি আর ভারি কি?
তারো চাইতে ওজুক ভারি শাশুড়ী শ্বশুরের জী।

লোকনৃত্য ও কর্মগীত: যাযাবর সমাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত কর্মসঙ্গীত, পাবনী সঙ্গীত ও লোক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন ক্রীড়া সংগীত যেখানে লোকনৃত্য ও গীত মিলে মিশে একাকার-

(এক) মাধোয়া ধাইর যারে/ মাধোয়া ধাইর যারে
ছোট ছোটানি মাধোয়া ধাই র যা
তিলেক পড়োয় তিলেক পড়োরে
ছোট ছোটান মাধোয়া ধাইর যা
হেড়াছ ফকরিরে হেড়ছি ফকড়িরে
(দুই) হিঃ মারো জ্জোয়ান
হ হ হঃ
হিঃ আউর খোরানি

(কর্মসঙ্গীত শ্রমের সঙ্গে যুক্ত সমবেত উচ্চারণ)

হ হ হঃ
হিঃ তোমার বলে
হ হ হঃ
হিঃ পর্বত টলে
হ হ হঃ
হিঃ বাপ ভাতারি...
(তিন) চটুল জীবিকা সঙ্গীত: ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ
(পায়ে ঘুঙুর বেঁধে টামাং নিয়ে) তেরে পাও পিছল গয়া
গ্রামেগঞ্জে গান গেয়ে প্রচার) টুট গইল ঘাঘরিয়া...

কিংবদন্তী লোকবিশ্বাস: (এক) বাজীকর বা যাযাবরদের নিয়ন্ত্রা হলেন রহুচন্ডাল, তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'কিংবদন্তী'। রহু যেন তাদের সহায়। রহু নির্দেশিত পথই এদের যাত্রাপথ।

(দুই) ভাগ্যগননার প্রতি এদের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ভাগ্য গননায় লক্ষণ বা চিহ্নের সঙ্গে হাতের রেখার মিল খুঁজে পায়। কখনো একে পেশাতেও পরিণত করে নেয়।

(তিন) গাছের গায়ে গরুর চামরা, জোড়া বাঁশি এবং শাল পল্লব সাজিয়ে

রাখার মধ্যে সমৃদ্ধি কামনা নিজের ও পরের।

(চার) বাজীকরেরা চাঁদনী রাতে তাঁবুর পাশের গাছের নিচে গিয়ে বসে এবং পূর্বপুরুষকে কামনা করে। এই পূর্বপুরুষ তাদের 'দনু'।

(পাঁচ) ঘোর অমাবস্যায় কোনো মেয়ের ছেলে হবে। সে হবে একমাত্র ছেলে তার। সে মরবে কোনো এক অমাবস্যার দিনে আর তার মৃতদেহ ভাসানো হবে সেই অমাবস্যার রাতেই। সেই লাশ গভীর নদী থেকে উঠাতে হবে আর তার কণ্ঠার হাড়ে বানানো হবে ভানমতির হাড়। সেই হাড় হলো রহু চন্ডালের হাড়। সেই হাড়কে যা বলা যায় তাই শোনে। হ্যাঁকে না, না কে হ্যাঁ করাতে পারে। খেলা দেখানো হয় এই হাড় সামনে রেখে।

লোকদেবতা: 'রহু', 'দনু', 'ভানমতী'-র পাশাপাশি ..../বিগামাই/কালীমাই/ ওলামাই এদের লোকদাতা; বাজিকর পথে পথে সংস্কার যা পায় তাকেই আত্তীকরণ করে বলে। অনেক সময় 'বিষহারি'-র গান গাইতেও এঁদের দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে এদেরই একটি গান:

ম্যানকা বলে ওগো বাপ
বড় পালু মনস তাপ
চক্ষে বহে মন্দা কিনি

লোকবাদ্য ও শিল্প: খেলা দেখাতে গিয়ে ঢোলকের ব্যবহার এরা বেশি করে। সঙ্গে বাঁদর ভাল্লুক, কাঠের পুতুল, কাঠের ময়ূর, কুকুর, ঘোড়া, গাধা নিয়ে যায়। হাতে লাঠি, বাঁশ, এসব উপকরণ হিসেবে থাকে। আদিবাসীদের মতো। তৃমদা ও 'ধামসা'র ব্যবহারও করে থাকে। বাঁশি বাজানো ও 'শিস' দিয়ে মৌখিক শিল্প পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। বাঁশশিল্প, পাটশিল্প সূতা ও সূচি শিল্প, কাঠশিল্পে এমনকি মৃৎশিল্পে পারদর্শিতা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদ: প্রতিটি দলে একজন করে গোষ্ঠীপাত্র বা দলপাত্র থাকে। দলপাত্র গলায় পাথর ও কাঁচের কাজ করা বস্ত্র পরিধান করে। প্রাচীনেরা নুগরু, কুর্তি, ঘাগরা এবং অন্যরা মাঝবরনী স্ত্রী কিংবা পুরুষরা লুঙ্গি, সিক্কা কুর্তি, ঘাগড়া পরে থাকে। তবে এখন পরিবর্তন এসেছে পোশাকেও যাযাবরদের মেয়েরা-বমনীরা ঘাঘরা আর কামিজ পরে এবং পুরুষেরা নুগরু ও কুর্তি। কোথাও কোথাও ধুতি আর লুঙ্গি পুরুষদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের শাড়ি পড়তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খাদ্যে: পশু শিকারের মাংস পুড়িয়ে খাওয়া কিংবা ফলমূল, গাছের শেকড় আকন্দ, মেটে আলু প্রভৃতি রান্না করে খায়। আদিবাসী সাঁওতালদের মতো ইঁদুর, শামুক, বিড়াল শিকার করে এরা। মৎস্য শিকার ও পশু পালনের গরু

কিংবা মোষের দুধ খায়। এদেশীয় বা পূর্ববঙ্গের মানুষদের সঙ্গে মিলে মিশে খাদ্যাভাস এখন বদলে গেছে। জমি জায়গা চাষাবাদের বিদ্যা এখন রপ্ত করতে পারায় ধান থেকে চাল এবং চাল থেকে সোঁকা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। কলাইডালের রুটি এদের প্রিয়।

বাজিকরদের বসতি অঞ্চল: যদিও স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই, তবে স্থিতির লক্ষ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল এক জায়গায় কর্মসূত্রে থেকে যাচ্ছেন। এভাবে সেই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে পরিচিত গড়ে তুলতে চাইছেন। যেসব অঞ্চলে এখন এদের অস্তিত্ব চোখে পড়ার মতো-

উত্তরবঙ্গের মালদা বোলায়: পীরগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ, রাজনগর, কালিয়াচক, সুজাপুর, পুকুরিয়া, ফারাক্কা রথবাড়ি, সামসী, হরিচন্দ্রপুর, রতুয়া, কোতোয়ালি, সাদালিচক, গাজোল, খেজুরিয়াঘাট, দারগাপাড়া, বুলবুলচণ্ডী, আইহো, হবিবপুর, বৈষ্ণব নগর, সাহাবানচক, শেরশাহী, জালালপুর, সাহাপুর, চাঁদপুর এছাড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত পিরোজপুর, মীরচক, প্রভৃ তি এলাকায় এদের অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখা যায়।

জেলা মালদার বাইরে বালুরঘাট, গা.... হিলি, চকভবানী, বুনিয়াদপুর, দৌলতপুর, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর কিশোরগঞ্জ, পেপড়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, রঘুনাথপুর, আজমপুর, ফতেপুর, মাসুমনগর, এবং বাংলাদেশের পাচবিবি, বগুড়া, আমুনাড়া, সিলেট, পাবনা, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী প্রভৃ তি এলাকায় এদের দেখা যায়। যোগাযোগ সূত্র বেড়ে যাওয়ায় এরা স্টেশনে স্টেশনে অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বসতি নির্দেশ করে থাকে। ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদের চিহ্ন ও সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম ও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতেও লক্ষ্য করা যাবে।

বাজীকর তথা যাযাবর, সংস্কৃতির বিপন্নতা: যে জনগোষ্ঠী ক্রমশ স্থিতির লক্ষ্যে ও নিয়তি নির্দেশিত পথে ক্রমশ পূর্বমুখী যাত্রা শুরু করেছিল তার গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে গেছে আজ। কেননা আত্মিক পরিচয়ের সংকট এদের মুক্তি দেয়নি। সমাজে অবহেলিত; নির্যাতিত ও নিন্দিত হয়েই এদের জীবন বয়ে চলেছে। কেউ বা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে হিন্দু কেউবা মুসলিম হয়েছে। আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী বা দল এখন ভ্রাম্যমান। তারা যাযাবরী রক্ত নিয়ে এখন যেন ছুটছে। তাদের কোনো পরিচয় নেই তারা যাযাবর বা নিজেদের পরিচিত করে বাজীকর বলে। সমস্যার কথা এদের যেহেতু কোনো সমাজই মেনে নেয় না বা গ্রহণ করে না। সেহেতু তাদের নিজেদের মধ্যেই বদ্ধ থাকতে হয়। ফলে দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে যেতে বসেছে এরা। এদের

মৃত্যুতে হাহাকার নেই, জন্মে আনন্দ নেই। অস্তিত্ব রক্ষার সংক্রমে কখনো বা স্বজন গমনই তাদের নিয়তি। একই রক্তের মধ্যে বারবার মিশ্রণে ঘটে চলে। শিশুমৃত্যু বাড়ে অকাল মৃত্যু বাড়ে। স্থিতি নেই নির্দিষ্ট ঠিকানা, নেই তাই ভোটাধিকার, তাই নেই রেশনকার্ড কিংবা নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণপত্র পেশাগত পরিবর্তনে কেউ গ্যারেজ, ফলে কারখানায় কাজ। করলেও জাতে ওঠা বাজিকরের নিয়তিতে নেই। বাজিকরেরা সেই অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়েছে। বদলে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তা ঘাট, বদলে যায় বাদা কিসমৎ মোহর, বদলায়না বাজিকর। আর যারা অর্থ্যাৎ যে গোষ্ঠী বা দল ধর্মান্তরিত হয়ে বাজীকর বলে আর নিজেদের চিহ্নিত করতে চায় না- গোপন করে রাখতে চায় স্বধর্মকে তারা সামাজিক স্থিতির লক্ষ্যে ছুটছে এদের এখন চেনা যায় না তবে রীতি নীতি সংস্কার বিশ্বাসে এদের চিহ্নিত করা যায়। আলো প্রবন্ধে বাজীকর ও যাযাবরী জীবনের সামাজিক স্থিতির লক্ষ্যে ছোটা ‘গোষ্ঠীর সংস্কৃ তি ও যারা আজও ছুটে চলেছে এবং আগামী দিনেও ছুটে চলবে তাদের সংস্কৃ তিকেই একটু খুঁজে দেখার অবকাশ তৈরি হলো মাত্র।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলার লোকসংস্কৃতি- আস্ততোষ ভট্রাচার্য
২. বাংলার লোকশ্রুতি- আশুতোষ ভট্টাচার্য
৩. রহুচন্ডালের হাড়-অভিজিৎ সেন (সুবর্ন রেখা, ৩য় সংস্করন)
৪. মালদহ চর্চা (সম্পাদনা) মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য।
৫. লোকনাটকের কথা গম্ভীরা আলকাপ ডোমনী
৬. শেরশাবাদিয়াদের কথা লেখ্য- আব্দুস সামাদ
৭. লোকারত দর্পনে বাজীকর সংস্কৃতি ও অভিজিৎ সেনের উপন্যাস (প্রবন্ধ)- রবীন্দ্রনাথ পান্ডে
৮. ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ (সম্পাদনা)- রতনদাস
৯. ছড়া বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা- ‘জোয়ার’ সাহিত্য পত্রিকা ২০০৪
১০. বন্দীয় লোকসংস্কৃতি কোষ/সম্পাদনা- বরনকুমার চক্রবর্তী।
১১. রাঢ় সংস্কৃতির অভিনয় ভগীরথ মিশ্রের মৃগয়া’- রবীন্দ্রনাথ পান্ডে
১২. ‘মধ্যবর্তী’- জুলাই ২০২৩
১৩. ‘সৃষ্টি সত্তার গভীরে’ (প্রবন্ধ)- অনন্য বড়ুয়া
১৪. ‘সংকেত’- ছোটগল্প আলোচনা সংখ্যা
১৫. ‘প্রবন্ধ সঞ্চয়ন’- সম্পাদনাঃ ড. সত্যবর্তী গিরি, ড.সমরেশ মজুমদার

হাটপুরাণ লোকপুরাণ
সুবীর সরকার

হাট। দুই অক্ষরের এই শব্দটির মধ্যে আমি একটা ম্যাজিক খুঁজে পাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাট ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে হাটকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন আবর্তিত হয়ে আসছে আবহমান কাল জুড়ে। গড়ে উঠেছে একটা 'হাটকেন্দ্রিক সংস্কৃতি'। যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজজীবনে, লোকজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্তের মানুষ। গঞ্জহাট ঘেরা জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার জন্ম আর বাল্য কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে উত্তরের ডুয়ার্স অঞ্চলের একটি সুবৃহৎ হাটের কোলে। মথুরার হাট। বহু বিচিত্র মানুষ, লোকজীবনের ছায়ায় ছায়ায় নিবিড় হাটকেন্দ্রিক সেই যাপন আমার কাছে মহার্ঘ্য হয়েই থাকবে আমৃত্যু। আমি দেখেছি একটা হাটের ভেতর থরে থরে সাজানো থাকে কতরকমের সব হাট।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রচুর হাট আমি অন্তহীন ঘুরেছি। দেখেছি বিচিত্র সব চরিত্র। চিলাপাতার হাটে প্রতি হাটবারে ঢোল মাদল বাজাতে বাজাতে আসতো কিন্ডাস এক্কা। সে শোনাতো করম পূজার গান। জল্পেশ হাটে দেখেছিলাম খড়ম জোতদারকে যিনি তার জোত জমির গল্প শোনাতেন। নিম্ন অসম রংপুর-দিনাজপুরের হাটে প্রচুর লোকগানের শিল্পীর দেখা পেয়েছি। কালিগঞ্জের হাটে প্রথম শুনি বৃহত্তর রংপুরের বিখ্যাত একটি গান–

'অংপুর হামার রঙ্গে ভরা রে
ও বন্ধুধন আইসেন হামার বাড়ি
ভোগ ধানের ভাত খোয়ামো
থাকেন দিনা চারি
বৈদ্যেশা বন্ধু রে...'

বিচিত্র মানুষ, মানুষের জীবন যাপনের বৈচিত্র্য, লোকজীবন জড়ানো গান, মানুষের না ফুরোতে চাওয়া সব গল্প কুড়িয়ে পেয়েছি হাটগুলিতে।

হাট ছিল বস্তুত বিনিময়ের কেন্দ্র। বাণিজ্য কেন্দ্র। দশ বিশ গ্রামগঞ্জের মানুষের দেখাসাক্ষাৎ, গল্প ও খবরাখবর বিনিময়ের উপযুক্ত স্থান। কবিরাজ, ফকির, মিসকিন আসতেন।

গৌরীপুরের হাটে দেখেছি ভিখিরিদের সুর করে গাওয়া সব গান। কুপির

আলোয় একবার ঢেঁকিশাক কিনেছিলাম ডুগডুগির হাটে। আদিবাসী নাচ গানের পাশে যৌবনবর্ধক ওষুধ বিক্রি হতো। গোপনে যৌনরোগ থেকে মুক্তির আশায় সেখানে সমবেত হতেন নানান বয়সের পুরুষেরা।

রাজনীতির মানুষ, পুরোন জোতদারের ক্যাম্প অফিস, গাড়িয়ালদের দই চিড়া খেয়ে ঘাড়ের গামছায় মুখ মোছা, রংপুরের খিলি পান, লণ্ঠনের আলোয় কথা বলতে থাকা মানুষদের উষ্ণতায় গমগম করে উঠতো অনন্তের সব হাটগুলো।

কবেকার কোনো এক হেমন্তের হাটে, হেমকান্ত দেখে ফেলেছিলেন। সেই জোড়া কৈতর। আর হাটে ঢুকে পড়া মেয়েরা তাদের শরীরে নাচ নিয়ে শুরু করেছিল গান—

'আরে নবরঙ্গের ময়না
ময়না না যান গৌরীপুরে রে...'

নাচের পর নাচ, গানের পর গান চলে, চলতেই থাকে হেমন্ত জুড়ে। মাঠে মাঠে সোনার ধান। মানুষের ঘরবাড়ি থেকে দৈনন্দিন কথা-বার্তা ভেসে। হিমে ভেজে খোলানের নিঃসঙ্গ আখা। দূরে কোথাও আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন ঘিরে মানুষের ছায়া আবছায়া। আল ও আলি দিয়ে দৌড়ে পালায় হেমন্তের ছাইবর্ণ শৃগাল। রহস্যময় মনে হয়, মনে হতে থাকে দূরে কাছের গ্রামদেশ। মস্ত চাঁদ ওঠে। জোড়াদিঘির জলে চাঁদ আর সুপুরি গাছের ছায়া। কোথাও পুঁথি পড়া হয়। আর গান জেগে ওঠে—

'বাপরে বাপ কী জার
মাওরে মাও কী জার
জারত কাঁপে দেখং এল্যা
দিন দুঃখির সংসার...'

এভাবে জীবন সেজে ওঠে। জীবন প্রবাহিত হয়। জন্ম আর মরণের ঘোর জাগিয়ে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন হেমকান্ত। আর হেমন্তের মাঠে খেতে হাহাকারের মতই ছুটে যায় গান—

'ওরে মানুষের দেহা
পবন গেইলে হবে মরা...'

সব হাট কি একরকম! সোমবারের হাটের ভেতর কি খুঁজে পাওয়া যাবে বুধবারের হাট! তামারহাটের রঙের সাথে কি পুরোপুরি মিল থাকা সম্ভব রতিয়াদহ হাটের! ছত্রশালের হাটের পাখিদের কি দেখা মেলে পানবাড়ির কোনো এক শনিবারের হাটে!

সব হাট একরকম হয় না। সব গান একরকম হয় না। সব গঞ্জ আর গাঙ একরকমের হতে পারে না। প্রবেশ আর প্রস্থান দিয়ে এক একটি হাটপর্ব রচিত হতে থাকে। আর লোকমান পাগলার হাটে ধুলোর ঝড়সমেত ঢুকে পড়ে জোড়া মহিষ। গদাধর নদীর কোনো বা চর থেকে বাথান ভেঙে এরা বুঝি চলে এসেছে এই হাটের ভেতরে। সমস্ত হাট জুড়ে একটা হুড়াহুড়ি লেগে যায়। মানুষের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মানুষ। তখন কোথায় ইয়াকুব ব্যাপারী, কোথায় মহিউদ্দিন ওস্তাদ, কোথায় লোকমান! ভরা হাটের কোলাহল থেকে সরে আসতে আসতে ময়কান্ত মৈশাল তখন খুঁজতে শুরু করে বাথান পালানো সেই জোড়া মহিষদের। তার হাতে দীর্ঘ পেন্টি। মাথা গামছা দিয়ে পাগড়ির মতো করে বাঁধা। প্রায় তিন কুড়ির পেশীবহুল সুঠাম শরীরের পেশীগুলো একত্রিত করে ময়কান্ত তার কণ্ঠে তুলে আনেন মহিষের কণ্ঠের আকুতি।

এই ডাক শুনে সেই জোড়া মহিষ কেমন থমকে দাঁড়ায়। তাদের বড় বড় চোখে কেমন মেঘের ছায়া! একটু বাদের দেখা যাবে সেই জোড়া মহিষ অদ্ভূত আহ্লাদ নিয়ে হেলে দুলে ময়কান্তর পিছনে পিছনে সেই বাথানের পথ ধরে ফেলেছে। গদাধর নদীর কোণ বা চরের খুব অন্দর থেকে ভেসে আসছে হাহাকার ভরা গানের সুর–

'আরে ও মৈষের দফাদার ভাই
ডালা সাজাও ডালা সাজাও
চল মৈষের বাথানে যাই রে...'

ময়কান্ত তার জোড়া মহিষ নিয়ে বাথানে চলে যেতে থাকে। কিন্তু হাট ভেঙে যায়।

ইয়াকুব ব্যাপারী মহিউদ্দিন ওস্তাদ লোকমান পাগেলাকে ভুলে গিয়ে আপাতত আমরা ঢুকে পড়তেই পারি বালাজানের হাটে। গঙ্গাধরের বাতাসে নদীর বালু উড়ে আসছে হাটের মস্ত খোলের ভেতর। শরীর ভর্তি বালুকণা মেখে গরুহাটির উত্তর শিথানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সাজু চোরা। না, সাজু চোর নয়। তার নাম সাজু মোহাম্মদ। হাটে হাটে গরুর দালালি করে বেড়ায়। আর 'চোর চুন্নি' পালাগানে সাজু চোরের ভূমিকায় অভিনয় করে। তার শরীরের পরতে পরতে তীব্র এক নাচের ছন্দ লুকিয়ে আছে। সাজু চোরার পালা দেখার জন্য মানুষ হামলে পড়ে গানবাড়িতে। সাজু মোহাম্মদকে এখন আর কেউ চেনে না। সবাই সাজু চোরাকে একনামে চেনে। সাজু যখন নেচে নেচে শরীরে অদ্ভূত পাক দিতে দিতে গেয়ে ওঠে–

'ও কী হায়রে হায়

আজি মনটায় মোর পিঠা খাবার চায়...'

তখন সমগ্র গানবাড়ি জুড়ে কী এক উন্মাদনা! সাজু চোরা ছিল গানমাস্টার মঈনুদ্দিন এর শিষ্য। মঈনউদ্দিন আবার ছিল আলাউদ্দিন এমেলের সাগরেদ। সারাজীবন এই গান, এই নাচ, রাতের পর রাত গানবাড়ি নিয়েই জীবন কাটে সাজু চোরার। গরুর দালাল সাজু চোরা গরুহাটির ভেতর দাঁড়িয়ে কী ভাবছিল! রহস্যমোড়া গানবাড়ির কথা। নাকি সওদাপাতি নিয়ে বাড়ি ফিরবার কথা! তার শরীর জুড়ে নাচের ছন্দ ক্রিয়াশীল থাকে আর হাটের অন্ত মধ্যে সাজু ছড়িয়ে দিতে থাকে গুনগুন সুরের কোনো এক গান, যা দূরাগত হওয়ার ডানায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমস্ত হাটের পরিসরে–

'ওরে ফুলবাড়িত ফুলমালার বাড়ি
হাট করিতে যামো হামরা গরুর গাড়িত চড়ি...'

এইভাবে পুরোন হাটপর্ব শেষ হয়ে যায়। নতুন নতুন হাটগুলোর হাট হয়ে উঠবার জন্যই হয়ত বা!

তামারহাটের ভেঙে যাওয়া হাটের বাইরে আসতে আসতে সিকান্দার মিস্তিরি তার ঝাঁকড়া চুল নাড়াতে নাড়াতে, বেশ মজাদার এক ভঙ্গি তার দীঘল শরীরে বহন করে আনতে থাকে আর কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়েই গানের দু এক কলি কিংবা গেয়েই ওঠে–

'ও কি মাহুত রে
মোক ছাড়িয়া কেমনে যাইবেন
তোমরা হস্তির শিকারে...'

এই গানের হাহাকারের মতই সুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত লয়ে। গঞ্জ বাজার খেত খামার আর মানুষের ঘরবাড়ি পেরিয়ে এই গান তার সুরসমেত মিশে যেতে থাকে গঙ্গাধর নদীর মস্ত বালার চরে।

সিকান্দারের চোখ ভিজে ওঠে। এই জীবন এই জীবন মায়া নিয়েই তো আবহমান বেঁচে থাকা মানুষের। সিকান্দার হাঁটতেই থাকে। লিলুয়া বাতাসে দোল খায় সিকান্দারের মাথার বাবরি চুল। ফাঁকা প্রান্তরে সে আচমকা দু তিন পাক নেচেই ওঠে আর ঝুঁকে পড়ে নতুন গানের ওপর–

'বিনা বাতাসে ভাসা
ঢোলে রে...'

সিকান্দার সিকান্দার হয়েই থেকে যায়। দূরে ক্রমে আবছা হয়ে আসে তামারহাটের ভরসন্ধ্যাবেলা। গঙ্গাধরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সিকান্দার মিস্তিরির শরীরের পুলক সহসা ভেঙে যায়। তার প্রাচীন কালের কালো

পাথরের মতো কপালে গভীর ভাঁজ পড়ে। সে কি তবে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়!

সিকান্দার আসলে নৌকো বানানোর দক্ষ এক কারিগর। আর এই জল ও জলার দেশে ধনী বলো, জোতদার বলো, জমিদার বলো বা গৌরীপুরের রাজাই বলো, নৌকো বানাবার কাজে প্রায় সারা বছরই ডাক পড়ে সিকান্দারের। প্রায় পঞ্চাশ বছর জুড়ে এই কাজ করে চলেছে সে। এই জনপদ তাকে সিকান্দার মিস্তিরি বলেই জানে, চেনে। একসময় সিকান্দার কালু বয়াতির দলে সারিন্দা বাজাতো। তার সারিন্দা কত কত ভরযুবতী নারীকে উন্মনা করেছে! কত নারীকে এক সংসার থেকে অন্য সংসারে ঠেলে দিয়েছে! কত চেংড়াকে বাউদিয়া করেছে! তার কোনো ঠায় ঠিকানা নাই। তাকে দেখলে এখনও কত মানুষ মজা করে গেয়ে ওঠে–

'কী ডাং ডাঙ্গালু বাপই রে
নাঠির গুতা দিয়া...'

তবে কি সিকান্দার তার সারিন্দার জীবনের কথা ভাবছিল! না কি গয়েশ্বর ধনীর জোতজমি আর বাইচের নাও তাকে আরো আরো এক ভাবনার জটিলতায় ঠেলে দিচ্ছিল!

কতরকমের হাটে হাটে জমে ওঠা আড্ডার ভেতর দিয়ে আস্ত এক জীবন কেটে গেল! শীত ও কুয়াশায় ঘন হয়ে ওঠা সেই কবেকার চিলাপাতার হাট। এই হাটের চারপাশে গহীন বনাঞ্চল। সন্ধ্যের মুখে অদ্ভূত এক ছমছমে রোমাঞ্চের আবহ। আন্দু বস্তি থেকে রাভা মেয়েরা আসতো।

বানিয়া বস্তি থেকে শুকরা ওরাও আসতো খড়ি বিক্রি করতে। কুর্মাই বস্তি থেকে আসতো চিত্তরঞ্জন রাভা। আমিও মথুরা থেকে সাইকেল নিয়ে চলে আসত চিলাপাতা হাটে। দেখতাম হাট হলো এক নকশাকাটা বর্ণময় শীতলপাটি। কত রকমের মানুষ। হাটে ঢুকছে। হাট থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের শরীরের পেশী জুড়ে তীব্র এক স্পন্দন। এই হাটেই পরিচয় হয়েছিল শিবজির সঙ্গে। চিলাপাতা মোড়ে তার দোকান ছিল। শিবজিকে একবার মহাকাল বাবা মানে হাতি শুঁরে তুলে আছার দিয়েছিল জঙ্গলের গভীরে বানিয়া নদীর পাড়ে। বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। আর তারপর থেকে শিবজির ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল। শিবজি ছিলেন গল্পের খনি। আমি তার কাছে জঙ্গল জনপদের গল্প শুনতাম।

মথুরার এক সোমবারের ভরা হাটে আমাকে মাছ ধরবার রাভা নৃত্য দেখিয়েছিলেন পুষনি রাভা ও তার দল। এখানেই দোলেশ্বর বর্মণের চায়ের দোকানের আড্ডায় পরিচয় হয়েছিল জার্মান রাভা, টুনুমনু এক্কা এবং ফুলজান

বর্মণের সঙ্গে। জার্মান রাভা, রাভা ভাষায় লোকনাটক লিখতেন। অভিনয় করতেন। আর তার সেই লোকনাটকের দলে বাঁশি বাজাতেন টুনুমনু এক্কা। কোমরে গোঁজা সেই বাঁশি কত যে শুনেছি। ফুলচান বর্মন ডুয়ার্সের হাটে হাটে টর্চ লাইটের দোকান নিয়ে ঘুরতেন। বিচিত্র এক জীবন অভিজ্ঞতার গল্পগুলি শোনাতেন তিনি। তিনি ছিলেন তেভাগার সৈনিক। জোতদারের গোলা লুঠের অংশীদার। আর কুচবিহারের মহারাজা পাতলাখাওয়ায় জঙ্গলে শিকারে এলে তিনি মহারাজার 'হাকোয়া বাহিনীতে' যোগ দিতেন। একটা ঘোরের ভিতর তিনি শোনাতেন দেশি বিদেশি রাজপুরুষদের হরেক রকম গল্প।

মহারানী ইন্দিরা দেবী, রাজকুমার ইন্দ্রজিতের গল্প। গৌরীপুরের রাজকুমার লালজির বাঘ শিকারের কথা। মনে হতো বুঝি রূপকথার গল্প শুনছি। সাহেবপোতার হাটে, পলাশবাড়ির হাটে, শালকুমারের হাটে আসতেন ইয়াকুব কবিরাজ। সেটা নয়ের দশক। ইয়াকুব কবিরাজ দোতরা বাজিয়ে গান গাইতেন আর কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করতেন। মাঝে মাঝে শোনাতেন নানান মজাদার শোল্লোক। তার কথা বলা, গায়নভঙ্গী, মাথা ভর্তি বাবরি চুলের দুলুনি একটা তীব্র আকর্ষণ তৈরি করতো। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াতাম একসময়। বিচিত্র রকমের সব মানুষজন দেখতাম।

জল্পেশ মন্দিরের কাছে চাকরি করতাম একসময়। খুব ঘুরে বেড়াতাম জনপদের পর জনপদ। নতুন নতুন আড্ডায় সামিল হতাম। জল্পেশ, জটিলেশ্বর মানে ইতিহাস। ইতিকথা। আড্ডা দিুম লোকগানের শিল্পীদের সঙ্গে। দীপ্তি রায়ের 'তুক্ষ্য গানের' প্রেমে মজেছিলাম। আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন কামেস্বর রায়, অঞ্জলী রায় ডাকুয়া তাদের ভাওয়াইয়া দিয়ে।

বৈশাখ মাসে প্রায় ৭/৮ দিন জল্পেশ মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াতাম 'মেচেনি গানের' দলগুলির পরিবেশনা দেখবো বলে। জল্পেশ হাটে পরিচয় হয়েছিল প্রায় ৮০ ছুঁই ছুঁই শ্রী হেরম্ব চন্দ্র বর্মন মহাশয়ের সঙ্গে। একসময় নিজস্ব 'পালাটিয়া গানের' দল ছিল ওনার। ভারি অদ্ভূত মানুষ! ওনার একটাই শখ ছিল। আশেপাশের সমস্ত হাটগুলোতে ঘুরে বেড়ানো। পুরোন গীদালের সন্ধানে। ওনার কাছ থেকেই জেনেছি পুরোন জোতদারদের গল্প। জল্পেশ হাটে উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের মিছিল (দেবেশ রায়ের তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্তে যার ছবি পাই আমরা)।

হেরম্ব বর্মন শুনিয়েছিলেন রাজারহাটের সেই দাপুটে জোতদার ভূপেন রায়কতের আখ্যান, যিনি পরিবারের সবাইকে গুলি করে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছিলেন। লাল শুক্রা ওরাও আর সতী সেনগুপ্তের লোককবিতার কথা হেরম্ব

বর্মন আজ নেই। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক। তাকে নিয়ে আমার লেখা একটি গদ্যের বই রয়েছে– 'হেরম্বচরিত'। বর্তমানে নিঃশেখিত।

নগরায়ন, সভ্যতার বিকাশ আজকের হাটকে অনেক বদলে দিয়েছে। কিছু কিছু গ্রামীণ হাট প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। হাটের তেমন গুরুত্ব আজ অনেকক্ষেত্রেই নেই। মানুষের প্রয়োজনে এখন প্রায় সব গ্রামেই নিত্যদিনের বাজার বসে। মোবাইলে চটুল গান শোনে আমাদের নতুন প্রজন্ম। তাই লোকগান, লোকগল্প আর জমে না। তবু হাট থাকে। হাট বসে নিয়মিত। হাট কখনোই তার বর্ণময়তা হারিয়ে ফেলতে পারে না। হাট আসলে আবহমান। চিরকালীন।

কোচবিহার, ভারত

প্রান্তীয় উত্তরের কিছু জীবিকার কথা
অম্বরীশ ঘোষ

অঞ্জন মুর্মু। জীবিকার জন্য সময় বরাদ্দ এক থেকে দেড় ঘণ্টা। আশেপাশের হাটগুলোতে ব্যবসায়ীরা ওকে এক ডাকে চেনে। ভালোও বাসে। হাট বসার পর এ দোকান সে দোকান ঘুরে ঘুরে পানীয় জল ও দোকানদারদের প্রয়োজনীয় জিনিস আনার ফরমাস নেয় এই লোকটি। মাসের শেষে সব দোকান থেকে চেয়ে নেয় পারিশ্রমিক। এই পারিশ্রমিকেই দিন গুজরান হয় তার চারজনের সংসারের। ধানুকা রাভা চষে বেড়ায় জলে জঙ্গলে। মুখ্যত কাঁকড়া শিকার করা তার পছন্দের কাজ। জঙ্গল সংলগ্ন নদীর ধারে ধারে বাঁশের তৈরি 'ডুকু'তে কাঁকড়া জোগাড় করতে দেখা যায় এই লোকটিকে। কিছু বাবুদের বাড়িতে অর্ডার নেওয়াই থাকে। সেখানে কাঁকড়া পৌঁছাতে হয়, অন্যথায় হাটে বাজারে ছুটতে হয়। পথ আর দূরত্ব এই মানুষটার কাছে কোনো বিষয়ই নয়। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বা মাইলের পর মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে হাসিমুখে। দূরত্বের বিষয় যখন আলোচিত হলো, তখন শিবেন সাহার নাম উল্লেখ করতেই হয়। শিবেন থাকে একটি শহর সংলগ্ন বস্তিতে। স্থানীয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি থেকে নানারকম আইসক্রিম সংগ্রহ করে তিন চাকার গাড়িতে করে অলিগলিতে সেগুলো বিক্রি করে। আর সপ্তাহে দুটো দিন চলে যায় কাছাকাছি বক্সা পাহাড়ের গায়ে। সেখানে জমায়েতের দিনে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দেয় ওই তিন চাকার গাড়িতে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় হামেশাই। বন্য জন্তুর করিডোর বা পারাপারের রাস্তা পেরিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় রাতে। ফিরে এলে হাসি ফোটে পরিবারের ভাত জোটে পরিবারের।

অনিকেত বর্মনদের প্রায় দু বিঘার ওপর জমিতে চা বাগান। সেই চা গাছের পাতা চা ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ভবেশ মিঞ্জের। ভবেশ মিন্স ভাগ চাষি। পাশাপাশি বউ-বাচ্চাগুলোকে একটু ভালো রাখার জন্য এই দায়িত্বও সামলায়। সাইকেলের ওপর সামনে ও পেছনে বড় বড় বস্তা বেঁধে সন্ধ্যার বেশ কিছুটা আগে রওনা দেয় সে ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্যে। চা পাতা পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে রাতে। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় উত্তরের তিন-চার জেলাতে এমন সব চিত্র এবং এমন সব চিত্র বাস্তবে রূপায়ণের মানুষ হামেশাই দেখা যায়। এরকম হাজারো মানুষ অদ্ভুত সব জীবিকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রাণের থেকে দুটো ভাতের দামই এদের কাছে বেশি। প্রিয়জনের মুখে

বাড়তি একটু সবজি বা পুষ্টি তুলে দেবার জন্য এরা হাসিমুখে প্রাণও দিতে পারে। এক টুকরো ছেঁড়া কম্বল আর পুরনো এক ফালি বালিশের স্বর্গে বিশ্রাম নেয় রাতটুকু। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আবার বেজে ওঠে জীবন যুদ্ধের দামামা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব-অনটন, কর্মস্থলের দূরত্ব– সবকিছুকেই এরা হাসিমুখে মেনে নেয়। শুধু মেনে নিতে কষ্ট হয় ফড়ে বা দালালদের অন্যায়-অত্যাচার।

ধানুকা রাভার যুবক ছেলেটা যখন কাজের খোঁজে শহরে যায়, তখন সমস্যা বাঁধায় এই দালালেরা। ভবেশ মিঞ্জ যখন বাচ্চাকে স্কুলে পাঠায় এবং বাবুদের ছেলেমেয়েদের থেকে ওর রেজাল্ট ভালো হয়, তখন বাবুদের কাছে নাজেহাল হতে হয় ভবেশ মিঞ্জকে। শিবেন সাহা যখন আইসক্রিমের গন্ডির বাইরে রাখতে চায় সন্তানদের, তখনই আক্রোশ বাড়ে ফ্যাক্টরির মালিকদের। কটু কথা, খারাপ ব্যবহার বিমাতাসুলভ মনভাবে আক্রান্ত হয়ে ওঠে শিবেনের পরিবার। ন্যায় মেলে না সামাজিক শোষণ যন্ত্রের বৃত্তে। সবাই একে অপরের সাথে যুক্ত সেখানে। নিরবে নিভৃতে চোখের জল গড়ায় এদের।

অদ্ভুত নানান পেশার লোকের আলোচনা যখন চলছে, তখন সুরেন দাসের নামটা না আনলে ঠিক হয় না। গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজারের মানুষের কাছে এই ক্লাস সেভেন পাশ করা মানুষটা কিন্তু ডাক্তার হিসেবে পরিচিত। একটা পুরনো সাদা শার্ট আর পুরনো সাইকেলের এই ডাক্তার প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি এলাকা চষে বেড়ান। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর অসংখ্য হাটে আয়ুর্বেদিক নানান ওষুধপত্র ছোট্ট কালো ব্যাগে বহন করেন এই মানুষটি। কোন ব্যানার-পোস্টার ছাড়াই চেয়ারে বসে থাকেন সাইকেলে পাশে রেখে। সর্দি-কাশি, মাথা ব্যথা, চর্মের সমস্যা, চুল উঠে যাওয়া, হাঁটু-কোমর ব্যথা এইরকম নানা অসুখের অব্যর্থ ওষুধ নাকি একমাত্র তার কাছেই পাওয়া যায়। সেই প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর উপকৃত মানুষ তাকে দেখামাত্র জিজ্ঞেস করে আন্তরিকভাবে, 'এলা কোটে রইস? দেখাংই না!' মাস তিনেক আগে এই ডাক্তারকে পড়তে হয় পুলিশ-প্রশাসনের রোষে। চলে যায় তার ভ্রাম্যমান ডাক্তারির স্বনিযুক্ত চাকরি। এখন তাকে গান্ধী মূর্তির পাশে চপ-পেঁয়াজি ভাজতে দেখা যায়। শহরের সফিস্টিকেটেড মানুষেরা চলাচলের পথে থামে আর বলে, 'দশ টাকার পেঁয়াজি দে তো। দেরি করিস না কিন্তু।'

আলিপুরদুয়ার, ভারত।

দেশভাগে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন সংগ্রাম

রুমি নাহা মজুমদার

'জীবনের কাছে হৃদয়ের মাঝে প্রতিধ্বনি
হাজার ধ্বনির,
আমাদের প্রিয় পৃথিবীর
আমাদের প্রিয় পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে আছে
মানুষের অনেক ইচ্ছার শব্দ...।'

কিন্তু সমাজে সব সময় মানুষের স্বীয় ইচ্ছায় সবকিছু কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, হয়ও না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করতে হয়। যেমন নিজের বাস্তুভিটে-দেশ ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হয় প্রবাসী হয়ে, সামাজিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে। যেমন অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্যান্য জাতি ও জনজাতির সমাহার দেখা গিয়েছিল ইংরেজ আমলে বা তারও বহু বৎসর আগে থেকেই। নানা অত্যাচার সহ্য করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ্য করা গেলেও নানা কারণে বিশেখু ব্রিটিশদের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ বহুবার দেখা গিয়েছে। নদীমাতৃক শস্য শ্যামলা এই দেশের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের লোভে বিভিন্ন জনজাতিসহ পশ্চিম মহাদেশের ইংরেজ, পুর্গিজ উপনিবেশ স্থাপন হয়েছে বারবার। কবিরা তাদের বাংলা ভাষায় কালে কালে মুক্তো ছড়িয়েছেন, তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে। বাংলাদেশের হাওয়ায় ভেসেছে মেঠো সুর যা পুষ্টি জুগিয়েছে কালে কালে বহু মানুষের হৃদয়ে।

কৃষিনির্ভর এই দেশে চাষিরা চাষ করেছে আনন্দে। বৃটিশরা রাজত্ব করার সময় থেকেই বাংলার কৃষকের প্রতি অসম্ভব নিপীড়নে সেই আনন্দধারা বারবার হয়েছে রুদ্ধ, প্রতিবাদের সুর হয়েছে জঙ্গম। কিন্তু ব্রিটিশ সূর্য অস্তমিত হওয়ার এবং উপমহাদেশের নতুন সূর্য উদয়ের প্রাক্কাল থেকে কিছু রাজনৈতিক প্রকৌশলীর জন্য বাংলার ভাগ্যে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করার অভীষ্ট পূর্ণ হয় রাজনৈতিক রণকৌশলে।

অথচ স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই জীবন জীবিকা সূত্রে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর নানা জনজাতির স্রোত বয়ে গেছে ভোট, চিনিও এবং আর্য গোষ্ঠীর ১০১টি শ্রেণি নির্ণিত ভাষা ছাড়াও নানা ভাষা, উপভাষা বিভাষার সন্ধান এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। অপরিচিত এই অঞ্চল ক্রমশই হয়ে উঠেছে গভীর মনোযোগের কেন্দ্র। এক কথায় বলা যায় উত্তরবঙ্গের এই

অঞ্চল লোকায়ত মানব মেলার সার্থক পূন্যভূমি। তাই এই ভূমিতেই বেশি নজর পড়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। ফলত এই ভূমির কৃষকদের ওপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। মানুষেরা অস্তিত্ব রক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য নানা সংগ্রামের সামিল হয়।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা এসেছে দেশকে টুকরো করে কাঁটাতারের হাত ধরে। রাজনৈতিক উস্কানিতে মাথা চাড়া দিয়েছে বিচ্ছিন্নবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু মুসলিম বিভেদ। নষ্ট হয়েছে সম্প্রীতির সুর। করতোয়া-তিস্তা-ব্রক্ষপুত্র, মেঘনা-যমুনার পবিত্র জল শোণিত ধারায় লাল হয়ে উঠেছে বারবার।

দ্বিখন্ডিত বাংলার এইপারের মানুষ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় পূর্ববঙ্গে তথা পূর্বপাকিস্তানে। আর ওই পারের অত্যাচারিত জনস্রোত চলে আসে এই পারে, উদ্বাস্তু হয়ে। নিজভূমে পরবাসে। ওইপারের পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তী নাম পরবর্তীত হয় স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। এই পারের নাম পশ্চিমবঙ্গ যে রাজ্য ভারতের অন্তর্গত।

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ চা শিল্পের বিস্তারসূত্রে উত্তরবঙ্গের উপনিবেশিত হতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত চা বাগানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সখ্যতা করে নতুন নতুন চা বাগান গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়। অসমের অনেক বাঙালি পরিবার আসাম আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করতে থাকে। এই রকম অভিবাসনের ফলে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের আর্থিক সামাজিক জীবনে দ্রুত অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে। দ্রুত নগরায়ন অর্থনৈতিক বেড়াজালের জটিলতায় উত্তরবঙ্গের চেহারা পাল্টে যায়।

বিশেষত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে পাল্টে যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। পাল্টে যায় উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও জনবিন্যাসের রূপ। তপশিলি উপজাতিভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীনকাল থেকে উত্তরবঙ্গে বাস করে আসছে। এদের মধ্যে মঙ্গোলীয় ও আদি অস্ট্রাল প্রধান এই দুই ধারা। প্রধান মঙ্গোলিওরা আদিকাল থেকে উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে উপনিবেশিত এবং এরা অভিবাসিত নয়। উত্তরবঙ্গে মেচ, রাভা, ভুটিয়া লেপচা, গারো, টোটো, লিম্বু, থারু প্রভৃতি তপশিলি উপজাতি প্রাচীন কাল থেকেই বসবাস করছে।

এখানে উল্লেখ্য বহুকাল থেকেই কিছু মানুষ কামরূপ, কোচবিহার, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি বিহারের কিছু অংশ, নেপালের ঝাপা, দিনাজপুরের

কিয়দংশে বসবাস করে আসছে।

ডক্টর সুখ বিলাস বর্মার মতে, 'খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে পৌন্ড্রবর্ধন থেকে দ্রাবিড় বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি অংশ (তৎকালীন কামরূপ) সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে। এর কিছুকাল পরে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত চিনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎ বোরো শাখার তিব্বত ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোরো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল অংশটি গোষ্ঠীর লোকেদের সাথে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জন গঠন করে। এই সমন্বিত জনগনই রাজবংশী সমাজ।'

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এখানকার জনগোষ্ঠী ছিল উদার মনোভাবাপন্ন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সুফি, তান্ত্রিক প্রভৃতি। সকল ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থায় পরবর্তীকালে এখানকার মানুষেরা একটি বিকাশশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

কারো কারো মতে, কামরূপের খেন বংশীয়রা প্রথমে ভুটানের দিকে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তারা প্রবেশ করে কোচবিহার এবং তার পারিপার্শ্বিক স্থানগুলোতে।

ডাক্তার হান্টার ও তার মতবলম্বীদের মতে, কোচ দলপতি হাজো কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য অধিকার করলে এই প্রদেশে কোচদের প্রাধান্য প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং বিশ্বসিংয়ের রাজত্বকালে রাজা বিশু, ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়। কোচদের সংখ্যা উত্তরবঙ্গে অত্যাধিক হারে পরিলক্ষিত হয়।

এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি, কেউ কেউ ছিলেন মৎস্যজীবী বা জেলে। তবে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোতে মধ্য ভারত, ছোটনাগপুর, বিহার থেকে আগত নানা জাতি উপজাতির লোক যথা ছোটনাগপুরের ঘাসি, তুরি, মাহেলি, বড়াইক, চিক বড়াইক, মুন্ডা, মাল পাহাড়ি, হেরিয়া, লোহার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেরা জীবিকার সাথে এসে বসবাস শুরু করে।

অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় মারওয়ারি, বিহারীরা চা বাগানে ব্যবসার জন্য ভিড় জমাতে থাকে। জোতদার ও বেনিয়াদের চক্রান্তে ভূমিহীন হয়ে পড়ে বহু কৃষক। মহাজনী প্রথায় দরিদ্র কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ ক্রমশ এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভের দানা বাড়তে থাকে, যার

বহিঃপ্রকাশ তেভাগা আন্দোলন। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জমির দখলদারি সুনিশ্চিত করতে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর বগুড়াসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

বস্তুতপক্ষে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার কৃষকের সামনে নেমে এসেছিল ত্রিমুখী আক্রমণ: ১. জমিদারি শোষণ, ২. মহাজনী শোষণ ও ৩. সরকার শোষণ। বছর পর বছর বেড়ে চলেছিল কৃষকদের ওপর খাজনা, চক্রবৃদ্ধি সুদসহ ঋণের বোঝা এবং সরকারি ট্যাক্স পরিশোধের দায় অতিষ্ট করে তুলেছিল দুর্দশাক্লিষ্ট কৃষককে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬০খ্রি. থেকেই ইংরেজদের এই শোষণ বঞ্চনা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দরিদ্র মানুষের ক্ষোভ বিদ্রোহের আকার নেয় বারে বারে। তারমধ্যে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকির মজনু শাহ, দেবী চৌধুরানী, মতি গিরি প্রমুখ। পরবর্তীতে রংপুরের পশ্চিমে মিঠাপুকুরের ফুলচৌকি গ্রামের নুরুদ্দিন বাকের মোহাম্মদ জং ফকির সন্ন্যাসী ও প্রজা বিদ্রোহের দলনেতা হিসেবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে চলা এই বিদ্রোহ সফল না হলেও ইতিহাসের পাতায় তাদের আত্মদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পরবর্তীতে তেভাগা আন্দোলন ছিল বর্গাদার বা ভাগচাষিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল ভাগচাষিরা ফসলের আধা ভাগের বদলে তিন ভাগের দুই ভাগ নেবে। ১৯৪৬-৪৭ এর দিকে তেভাগা আন্দোলনের একটি বড় সাফল্য হলো, নিরক্ষর ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন অনগ্রসর কৃষক সমাজকে এক মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

সেই সময়ে তেভাগা আন্দোলন এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় ব্যবধান দূর করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কৃষকদের এক পতাকার নিচে সমবেত হতে শেখায়। কোনো বড় আন্দোলনই আসলে আবেগ ছাড়া গড়ে ওঠে না। মেয়েরা নিজেদের বীরত্বের গাথা রচনা করে আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষিপ্রধান এলাকাগুলোর মধ্যে প্রধানত বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, সুন্দরদিঘী প্রভৃতি বিস্তীর্ণ কৃষক এলাকায় ১৯৩৮ সাল থেকেই কৃষকেরা তাদের শোষণের বিরুদ্ধে দুবেলা খেতে পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে।

আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ কৃষকশ্রেণি ছিল দারিদ্র সীমা সর্বনিম্নে। আর্থ সামাজিক পীড়নে, শিক্ষাহীনতায় সামাজিক মানসিক পুষ্টিহীনতায় এক

অন্ধকার জীবন যাপনে অভ্যস্ত কৃষক সমাজ যখন পঙ্গু, সেই পরিস্থিতিতে কৃষক নারীরা এগিয়ে আসেন আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। কৃষকদের শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে তখন থেকেই।

১৯৪২ সালে এ অঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। তাদের মধ্যে বুড়িমা- তিলকতারিনী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শিখা নন্দী, পূন্যেশ্বরী বর্মন যাদের ইতিহাসের পাতায় খুব একটা নাম দেখা যায় না, তবে তাদের নিয়ে আলোচনার এই সময়ে খুব প্রয়োজন। কারণ এই বুড়িমাদের গায়ে একটি মাত্র মলিন ফোতা, এক বেলার খাবার তেলহীন পেলকা শাক, নিরাভরণ ঘরে বাঁশের মাচা, কাঁচা কুয়ো, নিষ্প্রদীপ রাত্রি কেবলমাত্র তাঁদের এই অদম্য মনোবল, মানসিক দৃঢ়তা, আর লড়াইয়ের একাগ্রতা সাহসটুকু তেভাগা আন্দোলনের পথ প্রশস্থ করে দিয়েছিল।

উত্তবঙ্গে কৃষক-শ্রমিক-মহিলা-পুরুষ একসাথে শোষকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল।

এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে বাধিয়ে দেয়া হয় দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতায় এক রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটেছিল। যার ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সে সময় সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের মধ্যে দিয়ে দেশে যে স্বাধীনতা এলো তার ফলশ্রুতিতে কাতারে কাতারে মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে ভারতে এলেন। ভারত থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে ঘাটি জামালেন পূর্ব পাকিস্তানের এর পাবনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালিসহ বিভিন্ন জায়গায়।

পূর্ব বাংলার পাবনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালিসহ বিভিন্ন জায়গায় থেকে ভারতে আগত মানুষজন রাতারাতি চালচুলহীন হয়ে গেলেন।

দুই তিন দশক ধরে এসব মানুষেরা জীবন জীবিকা রক্ষার লড়াই করে নিজেদের অধিকার ফিরে পেয়েছেন। তারা অনেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। রয়েছেন দক্ষিণ বঙ্গেও।

স্বাধীনতা পূর্ব জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক বৃত্তে ছিল বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানার এলাকা গুলি। স্বাধীনতার পর এই এলাকাগুলি চলে যায় বাংলাদেশে।

১৯৪১ সালে জনগণনা অনুসারে জলপাইগুড়ি শহরের গ্রামাঞ্চলে লোক সংখ্যা ছিল ৮ ,২০,০৭৫ জন আর শহরাঞ্চলে ২৭,৭৬৬ জন।

১৯৫১ সালের গণনার ভিত্তিতে দেখা যায় সেই জনসংখ্যা বেড়ে গ্রামাঞ্চলে হয়েছে ৮,৫০,৬০২ জন এবং শহরাঞ্চলে ৬৬,১৪৫ জন।

ভিটেমাটি হারিয়ে যারা ভারতে চলে এসেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই এখন নানান পেশার সাথে যুক্ত। অনেকেই সরকারি চাকুরে, কেউ শিক্ষকতার সাথে যুক্ত, কারো ব্যবসা-বাণিজ্য। কেউ কেউ ভাগ্যবান যারা, তারা পেশা পরিবর্তন করেননি। যে গ্রামীণ ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছিলেন এদেশে এসে সেই কাজকেই পেশা হিসেবে নিতে পেড়েছেন, তবে তাদের সংখ্যা সমান্যই।

তথ্যসূত্র:
১. স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজ-প্রমোদ নাথ ।
২. উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার- ধনেশ্বর বর্মন।
৩. উত্তরধ্বনী পত্রিকা স্মারক সংকলন।
৪. পত্রিকা- পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা-১৪০৪
৫. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা- কৃষ্ণধর।
৬. জলপাইগুড়ির ইতিহাস- উমেশ শর্মা

টোটোদের কথা
অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের দিকে একটিবার চোখ বুলিয়ে নিলে সহজেই নজরে পড়বে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে ভুটান ও আসামের সীমান্ত লাগোয়া আলিপুরদুয়ার জেলাটিকে। এই জেলার অন্তর্গত মাদারিহাট-বীরপাড়া কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের আওতায় সবুজ চাদরে মোড়া ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম টোটোপাড়া। নামেই বোঝা যায় এখানে টোটোদের বাস। ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনজাতিগুলির মধ্যে পড়ে এই টোটোরা ইংরেজিতে যাকে বলে 'আইসোলেটেড ট্রাইব'। নিজেদের বিশিষ্টপূর্ণ গোষ্ঠী জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন টোটো সংস্কৃতি ও টোটো লোকজ্ঞান ভাণ্ডার, জন্ম দিয়েছেন টোটো ভাষাকে। ইতিহাসের একটা পর্যায় পর্যন্ত বাইরের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সংস্পর্শহীন অবস্থাতে বেঁচে থেকেছেন টোটোরা, বিকশিত করেছেন নিজেদের সমাজকে। (যদিও ভুটানের ডয়া জনজাতির সঙ্গে টোটোদের আদানপ্রদান ও সংযোগ দীর্ঘদিনের বলেই মনে করা হয়। এই দুই উপজাতির ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে।) তারপর একসময় রাজবংশী, নেপালি, বাঙালী, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা-সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটে। সময়ের দীর্ঘ সরণী পেরিয়ে টোটোরা টিকে আছে ওই ছোট্ট গ্রামটিতেই। এরা সবাই নিজেদের নামের সঙ্গে পদবি হিসাবে 'টোটো' ব্যবহার করেন।

ইদানিং অবশ্য উত্তরবঙ্গের শান্ত সবুজ পাহাড়ি গ্রামগুলো শহুরে পর্যটকদের ছুটি কাটানোর আস্তানায় পরিণত হয়েছে। হোমস্টে নাম নিয়ে সেসব জায়গায় গজিয়ে উঠেছে একাধিক আরামদায়ক হোটেল। তবে টোটোপাড়াকে কিন্তু একেবারেই সেই দলে ফেলা যাবে না। রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ভালো নয়, নদীখাতের পাথুরে জমি ধরে অনেকটা পথ যেতে হয় বলে মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ায় যাতায়াত করা আজও খুব অনায়াস বলা যাবে না। হাওড়ি নদীর বিস্তীর্ণ নদীখাত পেরিয়ে ভুটান সীমান্তের শেষ পাহাড়ের দক্ষিণ কোল ঘেঁষে এই টোটোপাড়া। গ্রীষ্মকালে নদীতে হালকা জলের রেখা থাকলেও বর্ষায় তা ফুলে ফেঁপে প্রায়ই অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে, কখনও আসে হড়পা বান। টোটোদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে চোদ্দটি টোটো পরিবার প্রথম এই অঞ্চলে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঘর বেঁধে থাকতে শুরু করেন, সূচনা করেন কৃষি ও পশুপালনের- তাদের উত্তরপ্রজন্মই আজকের টোটোরা। সেই চোদ্দটি পরিবারের প্রতিটির উত্তরপুরুষেরা একেকটি গোষ্ঠী তাই টোটোসমাজ আজও

চোদ্দটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। চারুচন্দ্র সান্যাল ১৯৫৫ সালে লিখেছিলেন-

তিস্তার পশ্চিমে বা সঙ্কোশ-এর পূর্বে টোটোদের বসতি স্থাপনের কোনও চিহ্ন নেই। তাই ধরা যেতে পারে যে তারা পশ্চিম ডুয়ার্সেই থাকত। গোটা পশ্চিম ডুয়ার্স তখন ভুটানের অধীন ছিল। ভুটিয়াদের হাতে পীড়ন, অন্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের কুখ্যাত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ- এই সমস্ত কারণে টোটোদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। কমতে কমতে শেষাবধি ডুয়ার্সের সমতল অঞ্চলের পুরানো বসতিগুলোয় টোটোদের আর চিহ্ন রইল না। প্রাণ রক্ষা করতে পারা অল্প সংখ্যক টোটো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ভবঘুরে গোষ্ঠী হিসেবে আশ্রয় খুঁজতে থাকল। এমন প্রমাণ আছে যে তাদের মধ্যে একটা অংশ মেচ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, একটা অংশ নেপাল ও ভুটানে গিয়ে সম্ভবত সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। আর অল্প কয়েকজন আশ্রয় নিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা এক পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর অংশে এবং সেই এলাকার চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল। এই স্থানটিই হলো টোটোপাড়া, যেখানে ধীরে ধীরে তারা সংখ্যায় বাড়ছে। আজকের টোটোপাড়া এমন একজনও নেই যে সেই প্রাচীন বাসস্থানগুলোয় টোটোদের দুর্ভোগের গল্প শোনাতে পারে।

কেমন আছেন ওরা? ওদের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক ধারণা হয়ত এই লেখা থেকে পাওয়া যাবে।

ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামটির অবস্থান একেবারে ভুটানের পাদদেশে। অর্থাৎ ভৌগলিকভাবে দেখতে গেলে উত্তরে ভুটান, পূবে তোর্ষা নদী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিতি রিজার্ভ ফরেস্ট। এই জঙ্গলের ধার ঘেঁষে বয়ে চলা হাউরি নদী গ্রামটিকে জঙ্গল থেকে আলাদা করে রেখেছে। আর আছে অনেক ছোট ছোট ঝোরা, অদ্ভুত মায়াবি তাদের নাম- গুয়াতি, নিতনতি, চুয়াতি, কাংদুনতি এইরকম আরও। দুদিকের দুটি পাহাড়কে ওরা বলেন হিসপা ও পুদুওয়া। নাপু, দুক্রুংলকা, লু ওদের কাছে পাথর দেবতা। ভূমি দেবতা হলেন সাত্রিং, জিদিং, কুংবি, ইত্যাদি। টোটোদের সমাজে প্রচলিত গান-মন্ত্র-শ্রুতি ইত্যাদি প্রায় সবই পূর্বপুরুষদের স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর আছে ঙয়ু, অঞ্চ, সরাদ, চইস্ন-চয়রা এইরকম কিছু সার্বজনীন গোষ্ঠীপুজো। এই জনজাতি আক্ষরিক অর্থেই প্রকৃতিবাদী। জংল-পাহাড়-নদী-ঝর্ণা সবই এদের আরাধ্য।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে টোটোপাড়ায় প্রবেশ করলে সেখানে চোখে পড়বে আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর, গ্রামীণ ব্যাংক, সীমারক্ষীবাহিনীর ছাউনি, সরকারি বিদ্যালয় ছাড়িয়ে টোটোপাড়া বাজার এলাকা। বাজার বলতে হাতে গোনা

গোটাকয় দোকান, প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় যেমন হয় আরকি। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে হয়ত দেখা যাবে টোটোদের পুরনো প্রথার কিছু ঘরবাড়ি- যেখানে মাটি থেকে কিছুটা ওপরে কাঠের খুঁটি ও বাঁশের তৈরি মাচার উপর ঘর ও বারান্দা। টোটোভাষায় বাসস্থানকে বলে 'সা'। 'দেই সা' মানে হচ্ছে টোটোদের ঘর। এককালে টোটোপাড়ায় প্রচুর বাঁশ পাওয়া যেত। আর ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার চা-বাগানে টুকরি, বেড়া, ইত্যাদি তৈরির জন্য বাঁশের চাহিদাও ছিল বেশি। তখন লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমসি, গারগান্ডা এইরকম বিভিন্ন চা-বাগান অঞ্চল থেকে ট্রাক এসে এই এলাকা থেকে বাঁশ নিয়ে যেত। আজকাল অবশ্য এইসব অনেকটাই কমে এসেছে। বাঁশও আর তেমন পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক অবস্থাই দারিদ্রসীমার নিচে। নেপালিদের সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি অনেককাল আগেই টোটোদের ছাপিয়ে গেছে। পঞ্চায়েত সদস্য-সংখ্যার নিরিখেও টোটোরা সংখ্যালঘু। ইদানিংকালে পঞ্চায়েত গাঁও, সুব্বা গাঁও, মণ্ডল গাঁও, মিত্রং গাঁও, দুমসি গাঁও, পূজা গাঁও এবং পাখা গাঁও, মোটামুটি এই সাতটি গ্রামে মূলত টোটোরা বাস করেন।

ফিরে তাকানো যাক টোটোদের জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের দিকে। ১৮৬৪-৬৫ সাল নাগাদ ডুয়ার্স যুদ্ধের পর ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশাপাশি টোটোপাড়াও ব্রিটিশদের অধীনে আসে। তার আগে অবধি এই অঞ্চল ছিল ভুটানের অধীন। তখন এখান দিয়ে ছিল বাণিজ্যপথ। টোটো, ডয়া, ডুকপা, জলদা, এইসব উপজাতির মানুষরা ছিল ভুটিয়া প্রভুদের বেগার-খাটিয়ে, যাদের বিনা পারিশ্রমিকে পণ্য পরিবহনে বাধ্য করত ভুটিয়া সামন্তপ্রভুরা। জংখা (ভুটিয়াদের ভাষা) ভাষায় এদের বলা হতো 'জাপো', যার বাংলা প্রতিশব্দ 'দাসপ্রজা'। এদের বসতিগুলো গড়ে উঠত দুর্গম অরণ্যঘেরা ভুটিয়াদের বাণিজ্যিক পথের এলাকাতেই। প্রায়ই সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে খাজনা লুট করে নিয়ে যাওয়া হতো এইসব এলাকা থেকে। অবশ্য বেগার খাটার পাশাপাশি টোটোরা নিজেদের গোষ্ঠীমালিকানাধীন কৃষি জমিতে ঝুম চাষ পদ্ধতিতে কাউন জাতীয় খাদ্যশস্য চাষ করত। অবশ্য বন থেকেও চলত খাদ্য সংগ্রহ। শিকার করা ছাড়াও জঙ্গলের ফল এবং মাটি খুঁড়ে যোগার করে আনা কন্দ ছিল ওদের আহার্য। বড্ড সরল ছিল সেকালে টোটোদের জীবনযাপন। দলপতির নির্দেশ মেনে চলা এই সমাজে ছিল না কোনো রাজনীতি ও ধর্মীয় ভেদাভেদ। গাছপালা, নদীনালা, খালবিল ও পাহাড় পর্বতের শক্তিকে বিশ্বাস করত ওরা। জীবনযাপনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্যই তো ছিল

উদার প্রকৃতি! তাছাড়া টোটোপাড়ায় তখন প্রচুর কমলালেবু ফলত, সেইসবের বিনিময়েও কিছু উপার্জন হতো বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যেত।

তবে ১৮৬৬ সালের পর ডুয়ার্সে ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হলে বেগার খাটা প্রথা থেকে মুক্তি পায় টোটোরা। ততদিনে কমলালেবু টোটোপাড়ার অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসলে পরিণত হয়েছে। অর্থ ও পণ্য বিনিময়ের অভ্যাসে কিছুটা ধাতস্ত হয়ে উঠেছে এই এলাকা। ঘটেছে বস্তুগত উন্নয়ন। কিন্তু ১৯৩১ সাল নাগাদ আচমকাই সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। মড়ক লাগল কমলা গাছে। অজানা রোগে টোটোপাড়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কমলালেবু গাছগুলো। উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে টোটোরা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থা এই সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। পেটের তাগিদে এবার টোটোরা হয়ে গেলেন জনমজুর। আবার কাজ করতে ওরা ছুটলেন ভূটানে।

তাছাড়া ১৯৬৯ সাল নাগাদ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা ভূমিসংস্কার ও জমি জরিপের উদ্দ্যেশ্যে এখানে এসে হাজির হলে টোটোদের সমাজ জীবনে বড়ো পরিবর্তন আসে। এতদিন পর্যন্ত টোটোদের দলপতি ধনপতি টোটোর নামে যে যৌথ সম্পত্তি নথিভুক্ত ছিল তার একটা বিরাট অংশ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী সরকারি জমিতে পরিণত হলো। এইসব করতে গিয়ে টোটোপাড়ার আশি শতাংশের বেশি জমি থেকে টোটোদের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী ৯১ টি টোটো পরিবার নিজের জমিতেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল। এইরকম পাহাড়ি এলাকায় ভূমিহীন কৃষিনির্ভর জনজাতির পক্ষে জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। এর পাশাপাশি রয়েছে টোটোদের বিশিষ্টপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আধুনিকতা ও উন্নয়নের অভিঘাত।

আদি টোটো সমাজের গড়ন অনেকটা গ্রামীণ পরিষদের মতন। এই সমাজে ধর্মীয় প্রধান হলেন 'কাইজি'। এই পদ বংশাণুক্রমিক। সামাজিক রীতিনীতি বা আচরণ নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করতেন ইনি। গাপ্পু বা 'মণ্ডল' হলেন টোটো সমাজের বৈষয়িক ক্ষেত্রের প্রধান। চাষ বা পশুচারণ সংক্রান্ত জমিজমা নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে সমাধান করতেন তিনি। অবশ্য এই কাজে গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গেও আলোচনা করে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। 'পঞ্চায়েত'-এর কাজ হলো চৌকিদারি খাজনা নির্ধারণ ও আদায় করা। তাছাড়া ছোটোখাটো ঝগড়াঝাঁটি মেটানোতেও তার ভূমিকা থাকত।

পঞ্চায়েতের অধীনে সহকারী হিসেবে থাকতেন 'চৌকিদার'। 'নাম্পন' হলেন আদতে সংবাদবাহক। এর কাজ হলো কাইজি এবং মণ্ডলের নির্দেশ গ্রামে সবার মধ্যে প্রচার করা। এই সমাজে আরেকটি গুরত্বপূর্ণ পদ হলো 'পাও'। কারো অসুখবিসুখ হলে কবিরাজি ওষুধ দেওয়া বা মন্ত্রপাঠ করা, নতুন শিশুর জন্ম হলে নির্দিষ্ট দিনে তার নামকরণ করা, উৎসব অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করা, ইত্যাদি দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত পাওয়ের ওপর। এদের নামকরণ অনুষ্ঠানটি বেশ অন্যরকম। অনুষ্ঠানটির নাম 'মাদি পা ওয়া'। শিশুর জন্মের পর কোনো বিজোড় সংখ্যক দিনে (যেমন ৩ দিন বা ৫ দিন অথবা ৭, ৯, ১১, ১৩ এইরকম কোনো দিনে) নামকরণ করতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা যে ঘরে শিশুটি জন্মেছে পাও সেখানে ধীর পায়ে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করেন। সেদিন সকাল থেকে তিনি কোনো লবণ যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না। এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে একটি কাঠের পিঁড়ির উপর সাজিয়ে রাখা হয়। টোটোদের বিশ্বাস ও জীবনযাপনের মতোই সহজ এই উপকরণ। এর মধ্যে আছে এক খণ্ড কাঁচা হলুদ, কার্পাসের সুতো, সাতটা দূর্বা ঘাস এবং টেঁকে (স্থানীয় গুল্ম)-এর একটা ঝাড়। মন্ত্র পাঠ করে কার্পাসের মালাকে কাঁচা হলুদে রাঙিয়ে নেন পাও। সদ্যস্নাত শিশুটিকে সুতোর মালা পরিয়ে দেন তিনি। তারপর দেবতার কাছে শিশুটির জন্য আশীর্বাদ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে নির্দিষ্ট নামের প্রস্তাব করেন পাও।

এই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য তেমন নেই। বিধবাবিবাহ টোটো সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। পুত্র বা কন্যা সন্তান এখানে একই মর্যাদাসম্পন্ন। পুত্র পিতার সাহায্যকারী এবং কন্যাকে মাতার সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করে সমাজ। বিয়ে-কে টোটারা বলে 'বিহৌ'। এই সমাজে নিজগোত্র বা একই রক্তবংশের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিয়েতে টোটোপাড়ার সবাই নিমন্ত্রিত থাকে। অনুষ্ঠানের দিন সকলেই যথাসাধ্য চালডাল, ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থলেতে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হয়। বিয়ে আক্ষরিক অর্থেই সামাজিক অনুষ্ঠান, তাই দায়িত্বও সমাজের। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল টোটোদের এই সংস্কার প্রশংসনীয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে আগে গোমাংসের প্রচলন থাকলেও ইদানিং শুয়োর ও মুরগির মাংস বেশিই প্রচলিত। টোটো সমাজের যেকোনো অনুষ্ঠানেই স্থানীয় পানীয় 'ইউ' পান করার প্রচলন আছে।

মৃত্যুর পর কবরে মাটি চাপা দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই সমাজের কোনো বয়স্ক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উদ্দ্যেশ্যে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তার মর্মার্থ হলো- 'আমাদের সঙ্গে তোমার ইহজগতের সম্পর্ক ছিন্ন হলো। তোমার আত্মা যেন

হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছায়। পরজন্মে নাতিনাতনি হিসেবে তুমি আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসো’। ওদের এই সমাজ ব্যবস্থায় জীবন পাহাড়ি অরণ্যের মতোই সবুজ। শহুরে মালিন্য সেখানে আজও হুল ফোটাতে পারেনি।

দারিদ্রতা থাকলেও চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনায় টোটোরা আজও অভিযুক্ত হন না। এই সমাজে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা আজও খুব কম। যদিও ইদানিংকালে জনাদশেক ছেলে-মেয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্ডি পেরিয়েছে। টোটোদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও দীর্ঘকাল অক্ষর ছিল না। তাছাড়া বাংলা বা অন্য কোনো ভাষার অক্ষরে টোটোদের শব্দগুলোকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। এই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধনীরাম টোটো তৈরি করেছেন টোটো বর্ণমালা। এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকারের ২০২৩ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে ধনীরাম টোটো মহাশয়কে।

ধনীরাম টোটোর তৈরি টোটো বর্ণমালা:

তবে ইদানিংকালে জীবিকার বিবর্তন, রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক বিবর্তনের পাশাপাশি বাইরের মানুষজনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগ ও সংমিশ্রণের প্রভাবে ক্রমশই বদলে যাচ্ছে টোটোদের সমাজ জীবন। সংখ্যার নিরিখে অল্প হলেও কয়েকটি পরিবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। প্রথাগত ঘরবাড়ির কৌশল ত্যাগ করে টিন ও কাঠের বাড়িঘর এমনকি সম্ভব হলে পাকা ঘরবাড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে। পুরুষদের প্রথাগত পোশাক অ্যাং ডাং পরার প্রথা পুরোপুরি অবলুপ্ত, তবে মহিলাদের মাধ্যে বয়স্ক দু-একজন এখনো সেই পোশাক পরিধান করেন। বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে আজকাল টোটোদের মধ্যেও অনেক পরিমাণে বাংলা নাম খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া মোবাইল ফোনের হাত ধরে আধুনিকতা আজ এই সমাজেও শিকড় প্রসারিত করে ফেলেছে।

বহুস্বরের এই বহুমাত্রিকতা থাকা সত্ত্বেও টোটোপাড়া এখনো আর পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের থেকে আলাদা। পাহাড়ের ঢালে সুপুরি বাগান, একফালি মাঠের প্রান্তে ঝুরি নামা বুড়ো বটগাছ, পাহাড়ের ঢালে ছড়ানো ছোট ছোট বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া, লোকালয় ছাড়িয়ে পিছনে ভুটানের খাড়া পাহাড় এই সবকিছু নিয়েই এখানকার অনিন্দ্যসুন্দর আকষণীয় পরিবেশ। কিন্তু আধুনিক সুযোগসুবিধার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার না করে টোটো ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষা করা ও সেই সঙ্গে শহুরে উন্নয়ন চালিয়ে যাওয়া আদৌ কতটা পরস্পরের পরিপূরক? সময় এর যথাযথ উত্তর হয়ত দেবে।

তথ্যঋণ-

১। ‘টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধ, লেখক বিমলেন্দু মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘লোকশ্রুতি’ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২। ‘টোটো জনজাতির সমাজজীবন’ শীর্ষক প্রবন্ধ, লেখক ধনীরাম টোটো, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত ‘ডুয়ার্সের বনে বাদাড়ে গ্রন্থে সংকলিত’।

৩। বিপ্লব নায়ক, সত্যজিৎ টোটো ও ধনীরাম টোটোর লেখা ‘টোটোজনজাতির কথা’ বইটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত, প্রকাশক মাতৃভাষা।

মালদায় মতুয়াঃ নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোকায়ত ও নান্দনিক বিশ্লেষণ

ড. জীবনকুমার সরকার

মতুয়াঃ প্রথমে আমাদের জেনে রাখা যাক শব্দটির অর্থ সম্পর্কে। 'মত্ত' শব্দ থেকে 'মঞ্জুয়া' শব্দের উৎপত্তি বলে সকলেই প্রাথমিক ভাবে মনে করেন। 'ম'-তে আপন সত্তা এবং 'তুয়া' শব্দে আপন সত্তা বা আমি ব্যতিরেকে আমার মতো স্ব স্ব মনোভাবাপন্ন একই আদর্শ উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে বোঝায়। অর্থাৎ 'আমি' মতাটাকে বহুজন সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করা। আবার এটা বলা হয়ড়'মত্ততা' শব্দ থেকে কিংবা মাতোয়ারা' শব্দ থেকে মতুয়া শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ, মতুয়া আন্দোলনের কাছে এই মতটি এইভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যারা মানবপ্রেমে মাতোয়ারা, তারাই মতুয়া। দিনরাত যারা হরিচাঁদের মানবপ্রেমের আদর্শে মেতে থাকে তারাই মতুয়া।

মতুয়া আন্দোলনের উদ্ভবঃ প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ভারতে তৎকালীন সময়ে পারস্য থেকে একদল বর্বর অসভ্য জাতি বিশেষ খাইবার বোলান ইত্যাদি গিরিপথ দিয়ে ঢোকে। কালক্রমে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা আমাদের দেশের সরল-সুন্দর শ্রমজীবীদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বিভাজনের ধর্ম তৈরি করে। প্রথমে যার সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক নাম ছিলো বৈদিক ধর্ম, তারপরের স্তরে বৈদিক থেকে হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মই আজকে হিন্দু ধর্মের মোরকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এই দীর্ঘ কালপর্ব জুড়ে ভারতের আদিবাসস্থানের ভূমিপুত্ররা হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতিত হয়েছেন। শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্য- অত্যাচারের গ্লানি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন পর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী অনেক রাজনৈতিক যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে অনেক প্রতিবাদী ধর্ম ও আন্দোলন। সবচেয়ে বড় আন্দোলন ও প্রতিবাদের সূত্রপাত ঘটেছিলো গৌতম বুদ্ধের সময়ে। যা হোক, সেটা একটা আন্দোলনের দাবি রাখে।

উনিশ-বিশ শতক জুড়ে ভারতে যে তারা মনুবাদী বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে বাংলা থেকে উদ্ভূত মতুয়া আন্দোলন ছিলো সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন। বাংলার শূদ্র অমূল্য ব্রাত্য মানুষের প্রথম গণমুক্তির আন্দোলনের নাম মতুয়া আন্দোলন। হিন্দু ধর্মের বিভাজন ও জাত বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সকল মানুষকে মুক্তির স্বাদ এনে দেবার লক্ষ্যেই হরিচাঁদ ঠাকুর উনিশ শতকের শেষে তৈরি করলেন মতুয়া নামক এক নতুন ধর্মের। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধের

দামামা বাজিয়ে দিলেন-

"কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই ।"
- (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃঃ ১৩৮)

এই বাণীতে অখন্ড ভারতের বাংলার অস্পৃশ্য-পতিত-চণ্ডালরা মুক্তির আহ্বানে প্লাবিত হলো বিপুল গতিতে। তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌঁছে গেলো হরিচাঁদ ঠাকুরের পতি মুক্তির আহ্বান

"জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া এষ্টা।"
- ("শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত; পৃ. ২৩)

বাংলার খাল-বিল ডোবা-নদী-নালা-জলাশয় বিধৌত অঞ্চলের অস্পৃশ্য-ব্রাত্য-সর্বহারারা পেলেন তাদের পরিত্রাতাকে। মতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির নেশায় তারা মেতে উঠল।

মতুয়া ধর্মের স্তম্ভঃ অনেকে মতুয়া ধর্মের কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু জানেন মতুয়া ধর্মের পালনীয় নির্দেশ বা বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? হরিচাঁদ ঠাকুর নির্দেশিত ১২টি আড্ডাই মতুয়া ধর্মের মূল চাবিকাঠি - যা সকলের নজরে আসা দরকার,

১. উদার মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা।
২. প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্মের প্রসার।
৩. এক নারী নিয়ে সংসার প্রতিপালন ।
৪. প্রেম-ভক্তি-শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস।
৫. ধর্ম ও কর্মকে অভেদ কল্পনা।
৬. বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন।
৭. সংঘশক্তি ও সংগঠনের প্রতি একাগ্রতা।
৮. আর্থ-সামাজিক সংস্কার ।
৯. গৃহমুখী অর্থাৎ বদ্ধজ্ঞান নয়, মুক্তজ্ঞানের সাধনা।
১০. আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা নয়, সমষ্টিকেন্দ্রিক ভাবনার প্রসার।
১১. পরকাল নয়, ইহকাল সাধনা।
১২. দলিত-ব্রাত্য উপেক্ষিত শ্রেণির আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।

এমন সহজ-সরল ধর্ম পৃথিবীতে বিরল। এই ধর্মে কোনো বর্ণ-বৈষম্য নেই। জাতপাত নেই। ব্রহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বিভাজন নেই। স্বর্গ-নরক, গুরু শিষ্য, নারী-পুরুষ, উচ্চবর্ণ- নিম্নবর্ণ কোনো ধরনের ভেদাভেদ নেই। ছোঁয়াছুয়ি নেই। খাবার-দাবারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সব মিলিয়ে এমন

বস্তুবাদী ধর্ম আর একটিও নেই বললেই চলে।

মথুয়া ধর্মান্দোলনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা ভাববার মতো। তাই মতুয়াদের মুখে মুখে ঘোরে এই বাণী-

''খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই।

ছেলে-মেয়ে শিক্ষা দাও, এই আমি চাই।''

পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগুরু এমন কথা বলেছেন- আমাদের তা জানা নেই। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে মনুবাদী কোনো ধর্মগুরুরা বলেননি। কারণ, তারা জানতেন, ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মচর্চার বাইরে মুক্ত শিক্ষা বা জ্ঞান চর্চার কথা প্রচার করলে গুরুবাদী ব্যবসা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গুরুত্ব কমে যাবে। মতুয়া ধর্মের উৎসমূলেই রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের বিরোধিতা।

নৃতাত্ত্বিকও জাতিতত্ত্ব পরিচয়ঃ মতুয়াদের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতত্ত্বগত ব্যাখ্যায় এটা বোঝা যায়, প্রাক আর্য জনজাতির জীবনধারায় পরিপুষ্ট মতুয়া সম্প্রদায়। বিভিন্ন জনজাতির সংমিশ্রনণে গড়ে ওঠা বাঙালিরা সুদীর্ঘকাল ধরে উত্তর ভারতের আর্য-সংস্কৃতি প্রভাব মুক্ত ছিলো। ফলে অনার্য জীবন-সংস্কৃতির সুনিপুন উত্তরাধিকার বহন করছে বাংলার মতুয়া সমাজ ও নমঃশূদ্ররা। মতুয়া আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দিলে তাই প্রতিভাত হয়। বাংলার আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হলো নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের অবসান মিটিয়ে রাখি- মতুয়া আর নমঃশূদ্র কি এক ?

হরি-গুরুচাঁদের সময়ে মতুয়া আন্দোলনের উদ্ভব পর্বে বাংলার ৩৬টি অনুন্নত সম্প্রদায় যুক্ত ছিলো। অর্থাৎ অর্থাৎ অখন্ড ভারতে বাংলার মাটিতে মতুয়া আন্দালন ছিলো এক কথায় অনুন্নত সকল সম্প্রদায়ের মিলিত আন্দোলন। ৩৬ টি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্ররা সংখ্যায় অধিক। যার ফলে মতুয়া আন্দোলনের অগ্রভাগে তাদেরকে দেখা যায়। কালক্রমে মানুষ মতুয়া বলতে নমঃশূষদেরই বুঝে থাকে। এইটাও ঠিক, মতুয়া আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে নানারকম অধিকার আদায়, লড়াই সংগ্রামের একেবারে অগ্রভাগে নমঃশূদ্ররাই ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এ চিত্র আমরা লক্ষ্য করি, ব্রিটিশ ভারতেও এবং বর্তমান ভারতেও। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও। ফলে মতুয়া আন্দোলন আর নমঃশূদ্র আন্দোলন প্রায় সমার্থক। আর একটি কথা স্মরণ রাখতেই হবে- মতুয়া আন্দোলন কিন্তু নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলেই প্রথম শুরু হয়েছিলো এবং প্রবর্তক এই সম্প্রদায়েরই মানুষ।

এই কারণে মতুয়াদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানে নমঃশূদ্রদের

জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যাই প্রাধান্য পায়। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। হিন্দু সমাজ এত বর্ণে বিভাজিত, এত বর্ণনায় জর্জরিত যে, নিম্নবর্ণের কোনো সমাজেরই সুনিপুণ ইতিহাস পাওয়া খুবই কঠিন। বর্ণবাদীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। কেবলই প্রভুত্ব কায়েম রেখেছে। আর নিম্নবর্ণের দলিতরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষিত হতে হতে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করার ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে ইতিহাস রচনায় নিবিষ্ট হতে পারেননি।

প্রাচীন ভারতের এই জনগোষ্ঠীকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার মনুবাদীরা শোষণ-নির্যাতন করেছে। ধ্বংস করছে তাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে। তবু নানা ধরনের সহায়ক গ্রন্থ, মৌখিক পরস্পরাগত ইতিহাস এবং দেশি-বিদেশি গবেষকদের নানা লেখার কিছু কিছু সূত্র ধরে নমঃশূদ্র বা মতুয়াদের জাতিগত উৎস সম্পর্কে একাধিক মত তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে চারটি মতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

১. নমঃশূদ্র এবং প্রাচীন ভারতের চণ্ডাল একই জাতিবর্গের মানুষ।

২. আর্য বা ব্রাহ্মণদের একটি শাখা সময়ের নিরিখে নমঃশূদ্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

৩. প্রাচীনকালের চান্দাল জনগোষ্ঠীর থেকে চাণ্ডাল এবং তারপরে নমঃশূদ্র রূপে বিস্তার। (চান্দাল> চান্দেলা> চণ্ডীল) নমঃশূদ্র) এবং

৪. প্রাচীন বঙ্গ-জনগোষ্ঠীর যারা কোনোভাবেই সুদীর্ঘকাল কোনো ধর্ম পরিবর্তন করেনি, তারাই নমঃশূদ্র।

সরকারি দলিল-দস্তাবেজে নমঃশূদ্র শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার F. B. Peacock- এর একটি চিঠি থেকে (১৮ জুলাই ১৮৮১) - "F. B. Peacock, Commissioner, Presendeney Division, "The improvement of the Chandals who are in the chief agriculturist [in Narail Subdivision, in Jessore district] has led them to aspire to a superion status in the Hindu Caste System. They call themaches Namamudria and prefers to be Vaisnab (Letter No. 87, J. G. dated Alaputres the 18th July, 1881), Amal Administration Report: Presidency Division for 1880-81; উদ্ধৃত, Atul Krisna Biswas,"The Namasudra of Bengal (New Delhi: Blumoon Books, 2000), p. 44. এরপর আদমশুমারিতে প্রথম নমহশূদ্র নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৯১ সালে। তবে সেটা স্বতন্ত্রভাবে নয়। তার সঙ্গে চণ্ডাল কথা যুক্ত করা হতো। অর্থাৎ, লেখা হয়েছিলো নমঃশূদ্র অথবা

চণ্ডাল। অবশেষে ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের আন্দোলনের বদলে চণ্ডালত্ব ঘুচে যায়। ওই বছর থেকে শুরু হয় শুধু নমঃশূদ্র পরিচয়।

নমঃশূদ্রদের নামের পাশে 'চণ্ডাল' শব্দটির ব্যবহার নিয়েই মতবিরোধ আছে। একদল তাদের পূর্বের নাম চণ্ডাল স্বীকার করে নিলেও অন্যদল চণ্ডাল পরিচয় গ্রহণ করতে চান না। তাদের যুক্তি হলো- চণ্ডাল একটি আর্যভাষী জনগোষ্ঠী। যারা মূলত বসবাস করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। গদের পেশার সঙ্গেও বাংলার নন্দাশুদ্রদের পেশার কোনো মিল নেই। চণ্ডালদের পেশা হলো শ্মশানে মৃতদেহ পড়ানো এবং শ্মশান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বা ওই জাতীয় কাজ। বাংলার নমঃশূদ্রদের মূল পেশা কৃষিকাজ, মাছ ধরা ও নৌকা চালানো। তাহলে নমঃশূদ্রদের নামের পাশে চণ্ডাল' ব্যবহার শুরু করার প্রবণতা কোথা থেকে এলো। প্রথমত আমাদের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ আগমনের পূর্বে চণ্ডাল শব্দের ব্যবহারের কথা জানা যায় না। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য আগমনের পরেই 'চণ্ডাল' শব্দটি নিম্নবর্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা শুরু হয়। সেদিক থেকে 'চণ্ডাল' একটি গালিবাচক বিশেষণ বা শব্দ। হিন্দুধর্মের সব রকম শাস্ত্র গ্রন্থে চণ্ডালকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটা এমনভাবে শাস্ত্র দিয়েছে যে, পৃথিবীর সব ধরনের খারাপ গুণের অধিকারী হলো চণ্ডালরা। তাই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা বাংলার শ্রমজীবী ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী নমোদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বয়কট করার জন্য এই গালিবাচক শব্দ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। কিন্তু নমঃশূদ্র নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বাঙালি গবেষক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' নামক গ্রন্থে যা বলেছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ-

"ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রকৃতি উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো ইহারাও দৈর্ঘ্যে মধ্যমাকৃতি, মুখের গঠন মাধ্যমিক এবং নাসা তীক্ষ্ণ ও উন্নত; ইহাদের চোখ ও চামড়ার রঙও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই মতো, অথচ স্মৃতি- শাসিত হিন্দুসমাজে ইহাদের স্থান এত নীচে যে নরতত্ত্বের পরিমিত গণনার মধ্যে তাহার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়তো পাওয়া যাইবে জাত-সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।...

এইসব নরতত্ত্বগত পরিমিত-গণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উচ্চ-বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বর্ণের বাঙালি

দেহ-দৈর্ঘ্যের দিক হইতে মধ্যমাকৃতি; নমঃশূদ্রেরাও তাহাই ....

মুত্তাকৃতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্গ এবং নমঃশূদ্ররা যেমন গোলাকৃতি, উত্তর সংকর পর্যায়ের অধিকাংশ কহি তেমনই ।...

নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি- গণনার ফলাফল একটু চাঞ্চল্যকর। এ তথ্য অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি যে, দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইহারা উত্তর-ভারতের বর্ণব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য- কায়স্থদের চেয়েও বাঙালি নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। অথচ এই নমঃশূদ্রেরা আজ সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে ! আমরা তাহাদের চণ্ডাল বা চাড়াল বলিয়া জানি, এবং বৃহদ্ধীর্মপুরাণ রচনার কালেই ইহারা অন্ত্যজশ্রেণিভুক্ত। এই সামাজিক তথ্যের সঙ্গে নরতত্ত্বপ্রমাণগত তথ্যের যুক্তির ও ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যার কোনোও সম্বন্ধ এখনও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...

আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই, বাঙালি ব্রক্ষণদের সঙ্গে গাঙ্গেয় ভারতের ব্রক্ষণদের জনতাত্ত্বিক আত্মীয়তা বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের জলতাত্ত্বিক আত্মীয়তা অপেক্ষা কম; বরং বাঙালি ব্রাহ্মণদের আত্মীয়তা মধ্যভারতীয় অপ্রাশানদের মধ্যে বেশি।”

নীহাররঞ্জন রায়ের এই মন্তব্যে অনেক কিছুর ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে বিস্তার করার অবকাশ এখানে নেই। আলোচনার আরও ক্ষেত্র রয়েছে এই গদ্যে। সুতরাং, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের।

দেশভাগ ও মতুয়া ধর্ম: আমরা সাধারণত দেশভাগ বা ভারতভাগের কথা বললেও প্রকৃত অর্থে ভাগ তো হয় বিপ্লবী বাংলা আর পাঞ্জাব। ফলে জীবনযন্ত্রণার যা কিছু নরকের মতো শোনা যায়, তা বাঙালিরা আর শিখেরা ভোগ করেছে। তবু বাঙালিদের যন্ত্রণার ছবি নিদারুন কষ্টের শিখেদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, শিখেরা পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে ভারতে আমার সরকারি সহযোগিতায় অনেক কিছু আদায় করে নিলেও বাঙালি তেমন কিছু আদায় করতে পারেনি প্রতিশ্রুতি ছাড়া। তবুও ১৯৪৭-এর পরে পরেই যারা ভারতে এসেছেন দেশান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ থেকে, তারা অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পরে আসা কিংবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্বে এবং তারপরে আসা দেশান্তরিক মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই মতুয়া। এরা উচ্চবর্ণের শিশুদের সঙ্গে সব কিছু গুছিয়ে আসতে পারেননি। গোয়ালভরা গোরু, পুকুর ভরা মাছ, মাঠভরা ধানক্ষেত আর বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দো-পুরুষের ভিটেমাটি বিজরিত সোনার বাংলা ছেড়ে ভারতের

মাটিতে আসতে হবে - এটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। ফলে মতুয়ারা দেশ ভাগও চায়নি। এজন্য গুরুপদ ঠাকুরের যোগ্য উত্তরসূরী মতুয়া নেতৃত্বরা বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেননি। সে ইতিহাস আপনারা সকলেই জানেন। তবু বাংলা ভাগ হলো দিল্লির ব্রাহ্মণ্যবাদী অবাঙালি নেতাদের কৌশলে। সতীর দেহের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো বাঙালি আর বাংলা। দিল্লির মসনদ দখল করার মতো স্বপ্ন চিরকালের মতো মুছে গেলো বাঙালির।

দেশান্তরিত মতুয়ারা ভারতের প্রায় ১৮টি রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান ঝাড়খন্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় সবচেয়ে বেশি। সংখ্যাটা বেশ ভালো। কয়েক কোটি। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই মতুয়ারা আছেন | মালদা জেলায়ও কম নেই। গাজোল, বামনগোলা, হবিরপুর, ওল্ড মালদা এবং ইংরেজ বাজার ব্লকে মতুয়াদের সবচেয়ে বেশি বসতি। গাজোল, বামনগোলা এবং হরিপুর ব্লকের গ্রামগঞ্জে অসংখ্য মতুয়া দল, পাগল, গোঁসাই ও ভক্তদের দেখা মেলে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মালদা জেলা কমিটিও আছে। প্রায় ১০ টির মতো স্বীকৃত দল আছে মালদা জেলায়। সবচেয়ে বেশি দল আছে গাজোলে।

মালদা জেলায় মতুয়াদের পেশাঃ মতুয়াদের পেশা মূলত কৃষিকাজ, মাছ ধরা ও নৌকো চালানো। নদী-নালা, খাল-বিধোত বাংলাদেশের ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও যশোর জেলাগুলিতে এখনও নৌকো চালানোর মতো কিছু মানুষকে এই পেশায় নিযুক্ত দেখা গেলেও এ বঙ্গে এই চিত্রটা আর তেমন নেই। মালদা জেলায় যেমন খুব বৃহৎ নদী নেই, যে অঞ্চলে মতুয়াদের বসবাস। যেমন নেই আর খাল-বিল-মিল। পূর্বে যে-সব খাল-বিল-নালা এবং ছোটো ছোটো নদী টপকে যাতায়াত করতে হতো নৌকোতেই, সেসব জায়গাগুলোতে কালভাট, সেতু, বীজ ইত্যাদি হয়ে যাওয়াতে ওই পেশা বিলুপ্তির পথে বলা যায়।

কৃষিকাজে, মতুয়ারা ভীষণ দক্ষ ও পরিশ্রমী। ঘরের মেয়েরাও মাঠে নেমে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করতে সক্ষম। শ্রমের প্রতি অসম্ভব যত্নশীল। ধান উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বিখ্যাত এই বিশেষ সম্প্রদায়। গবেষকরা বলছেন- এশিয়া মহাদেশে যে এত বিচিত্র ধরনের ধান চাষ হয়, তার স্রষ্টা নাকি এই মতুয়া সম্প্রদায়। উল্লিখিত প্রধান ওই তিনটি পেশার পাশাপাশি আর একটি পেশার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। পেশাদার লাঠিয়ালগিরিতেও নমঃশূদ্র বা মতুয়াদের দক্ষতার কথা সবজনবিদিত। অসংখ্য লাঠিয়ালদের মধ্যে একজনের নাম করাই এই মুহূর্তে যথেষ্ট- যার

নামে বাংলায় একটি বিখ্যাত প্রবাদ চালু হয়েছে। মনে পড়ে সেই প্রবাদটির কথা- "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।" তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো নিধিরাম বিশ্বাস। নমঃশূদ্র সমাজের বিখ্যাত লাঠিয়াল | রাজা প্রতাপাতিদ্যের সব বিখ্যাত লাঠিয়ালই ছিলো নমরুদ সম্প্রদায়ের । তৎকালীন সময়ের বাংলায় নমঃশূদ্রদের লাঠিয়ালগিরি নিয়ে অনেক কিংবদন্তী চালু আছে। মালদাতেও বেশ কিছু লাঠিয়ালদের নাম জানা যায়। যেমন, কালাচাঁদ সর্দার ও সুধীর সর্দারের কথা জানা যায়। দুজনের কেউ আর বেঁচে নেই।

বর্তমানে পুরনো পেশার মধ্যে কৃষিকাজ ছাড়া শিক্ষায় অগ্রগতি হবার ফলে জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন এসেছে। "খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই / ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।"- মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই আহ্বানকে পাথেয় করে মতুয়ারা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গেছে। ফলে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পদে তাদের দেখা যায়। মালদা, বিভিন্ন গ্রামে গেলেই দেখতে পারেন শিক্ষা ও চাকরিতে মতুয়া বা নমঃশূদ্রদের অগ্রগতির কতটা পরিবর্তন হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমী এই সম্প্রদায়ে সঙ্গে উন্নয়নে যে কোনো অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা মুশকিল। মালদার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিয়ে গেলে দেখা যায়, কী পরিমাণ পরিশ্রমের দ্বারা সাফল্য অর্জন করেছে।

লোকধর্মঃ লোকধর্ম বলতে আমরা সাধারণ লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মকেই বুঝে থাকি। সেদিক দিয়ে মতুয়া ধর্ম একটি লোকধর্মই বটে। হরিচাঁদ ঠাকুর আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর মাসে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য প্রান্তিক জনসাধারণের মধ্যে বসেই এই ধর্ম তৈরি করেছিলেন। সেজন্য মতুয়া ধর্মকে বলা হয় নিম্নবর্গীয় বা দলিত মানুষের আত্মজাগরণ ও আত্নপ্রতিষ্ঠার ধর্ম। অন্যান্য জেলার মতো মালদা জেলার লোক সাধারণের মধ্যে মতুয়া ধর্ম এখন পর্যন্ত বহুলভাবে চর্চিত।

লোকভাষাঃ মালদা জেলার মতুয়াদের ভাষা মূলত বাঙালি। এ জেলার অধিকাংশ মতুয়ারা এসেছে পূর্ববাংলা ও বাংলাদেশের ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা থেকে। গ্রামে-গঞ্জে যেখানে এদের বসতি, সেখানে পারিবারিকভাবে তারা আঞ্চলিক ডায়ালেক্টেই কথা বলেন। শহরে যে-সব মতুয়ারা বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, বাঙালির সঙ্গে বরেন্দ্রি ও রাঢ়ির মিশ্রণ ঘটছে শহরমুখী মতুয়াদের মধ্যে এটা সময়েরও দাবি যেন। কারণ, দেশভাগ এদের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে।

লোকশিক্ষাঃ হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকাল ও তাঁর স্বসমাজ ছিলো প্রকালে আর

অমানিশার মধ্যে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধায় পরিপূর্ণ ছিলো বাংলার শ্রমজীবীরা। ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীরা এইসব শ্রম উৎপাদনকারী মানুষদের অস্পৃশ্য করে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছিলো। প্রথম বঞ্চিত করা হয়েছিলো শিক্ষা থেকে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথম বাংলার এইসব অস্পৃশ্য পতিত ব্রাত্য মানুষদের জন্য শিক্ষায় উদ্যোগী হলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার যখন ছিলো না, তখন হরিচাঁদ ঠাকুর হাতেনাতে কর্ম শিক্ষা দেবার উদ্যোগ নেন। জমি চাষ করা, নারীকে মর্যাদা দেওয়া, গৃহকাজে মন দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, শৌচ- অশৌচ নয়, অন্তরের শুদ্ধতাই বড়ো কথা, অহংকার ও আত্মগরিমা থেকে হওয়া বড় নয়, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, বদ্ধ জ্ঞান নয় — মুক্ত জ্ঞানের সাধনা, তীর্থ ভ্রমণ করে অর্থ ও সময় অপচয় না করা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি মত্তুয়া সমাজের মধ্যে মত প্রচার করেন। সেই মতো মতুয়ারাও ঘরে ঘরে তাঁর উপদেশ মেনে চলতো। এভাবেই লোকশিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও সুযোগ্যসন্তান মহাত্মা পুরুচাঁদ ঠাকুর।

মালদা জেলার মতুয়াদের মধ্যে হরি-গুরুচাঁদের এই ঐতিহ্য আছে। কৃষিকাজ ঘরের কাজ ইত্যাদিতে তা প্রমাণিত হয়।

লোকচিকিৎসাঃ অন্ত্যজ মানুষের মুক্তিদাতা হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যধিগ্রস্ত মানুষদের ধর্মের বাণী শুনিয়ে বিদায় করতেন না। বাংলার খাল-বিল-জলাভূমি ও বিপদসঙ্কুল এলাকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্রদের গ্রামে গ্রামে সে-সময় নানা অসুখে বিনা চিকিৎসায় বহু লোক মারা যেত এবং কষ্টভোগ করতো। হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যধিগ্রস্ত মানুষদের দুদর্শা নিবারণের জন্য লোকচিকিৎসা করতেন প্রাকৃতিক উপায়ে। অম্বল ও পিঠ রোগে খেতে বলতেন তেঁতুল পাতা সেদ্ধ করা জল, শিউলি (পূর্ববঙ্গের লোকেরা বলেন শেফালী) পাতার রস, ডায়েরিয়া ও কলেরায় পান্তাভাত, লবণ ও কাঁচা লঙ্কা খেতে বলতেন। যকৃত ভালো রাখার জন্য কাঁচা পেপের রস বাতাসা দিয়ে খেতে বলতেন। ন্যাবা ও যকৃতের পীড়ায় দিতেন কালমেঘের পাতার রস, ম্যালেরিয়ায় দিতেন কালমেঘের পাতার রস, গুলঞ্চ ও ছাতু খাওয়ার বিধান দিতেন।

আরও কত ধরনের লোকচিকিৎসা তাঁর ছিলো, তা ভাবা যায় না। যেমন, ঘন কাশিতে শ্বেত ও রক্তবাসক পাতার রস দিতেন। প্লীহা ও শোথ রোগে দিতেন ঘোষলে পাতার রস কৃমি দমনের জন্য দিতেন নিমপাতার রস ও জামপাতার রস এবং অদ্ভুত হলেও সত্যি কানা রোগে খেতে বলতেন খামির মেটে। মৃগী রোগীদের জন্য বলতেন- ব্রাহ্মী পাতার রস নাকে দিতে। সঙ্গে খেতে বলতেন কলমি শাক ও শুশনি শাক | মতুয়ারা গ্রামেগঞ্জে এইসব

লোকচিকিৎসাগুলো মোটামুটি মেনে চলে, যেখানে ডাক্তার অপ্রতুল। আবার মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধিতে কলমিশাক ও কালো জিরা খেয়ে থাকে মতুয়ারা। আর একটি বিষয় নমঃশূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত আছে, লোকচিকিৎসার মধ্যেই পড়ে তা। কার্তিক মাসে কালী পূজার আগের দিন ১৪ শাক ভাজা খাওয়ার রীতি। এতে নাকি যমের দৃষ্টি এড়ানো যায়। এটা আর কিছু নয়- -এই সময় বিশেষ করে আশ্বিন মাসে নদী-পুকুর-খাল-বিলের জল কমে যাবার ফলে দূষিত চেহারা নিতো। তাতে কলেরা রোগে অনেক মানুষ মারা যেত। তখন শরীর-স্বাস্থ্যকে সতেজ রাখার জন্য সব ধরনের শাক-সব্জি খাবার নির্দেশ স্বরূপ এটা প্রচলিত।

সংঘশক্তি ও একতা : মতুয়াদের সংঘ ও একতা বিষয়ে সকলের প্রায় জানা। সংঘশক্তি এদের খুবই মারাত্মক। ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই একবার মতুয়াদের সংগঠিত করে বিশালসংখ্যক নমঃশূদ্রদের একত্রিত করে "জোনাসুর কুঠি অভিযান এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।" ব্রিটিশ ভারতে এরকম অনেক ঘটনার নজির আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং অধিকার আদায়ের জন্য মতুয়ারা দারুণভাবে সংঘবদ্ধ। মহারাষ্ট্রে যেমন মাহারট, পাঞ্জাবে শিখ; তেমনি বাংলায় মতুয়া বা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী। সাধারণত, এই সম্প্রদায় যেখানে বসতি স্থাপন করে, সেখানে অনেকগুলো পরিবার মিলে বসতি গড়ে। দলবদ্ধভাবে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকার চেষ্টা করে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা পর্যন্ত লাঠি চালাতে পারে। মালদা জেলায় গাজোলে, বামনগোলায়, হব্বিপুরে এসব লক্ষ্য করা যায়।

লোকশিল্পে মালদার মতুয়া: লোকশিল্প চর্চায় এদের দক্ষতা নজিরবিহীন। অনেকগুলো বিষয়ের একটি বহুল চর্চিত ও দৃষ্টিনন্দিত। ঘরে ঘরে বিশেষ সময়ে বা উৎসবে আল্পনা দেওয়ার রীতি আছে। আতপ চাল ভালো করে বেঁটে জলে গুলিয়ে সাদা রঙের মতো করে প্রস্তুত করে হাতে সাধারণ ন্যাকড়া নিয়ে এমন করে ঘরে ঘরে আল্পনা দেয় যা দেখার মতো। বিস্ময় উদ্রেক করে। বিভিন্ন ধরনের নকশা কাটা হয়। এত বৈচিত্র্য সে-সব আল্পনায়, যা অন্য সম্প্রদায়ে বিশেষ দেখা যায় না।

তারপর কাঁথা বুননোও সমানভাবে দক্ষ। সাংসারিক কাজের অবকাশে ঘরের মা-মাসীমা –কাকিমা এমনকি ঠাকুমারা পর্যন্ত অনায়াসে, কাঁথা বুননের কাজে নেমে যায়। এমন কোনো নমঃশূদ্রদের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেখানে কাঁথা নেই। এরা কথায় বলে মাসের হাতের কাঁথা আর রান্না জীবনকে

সার্থক করে। শিশু জন্মানোর পর দেখা যায়, ঠাকুমাদের হাতের তৈরি কাঁথায় শিশুকে লালন-পালনের বহু চিত্র।

লোকপ্রযুক্তিঃ লোকপ্রযুক্তিতেও সুনিপুন। গৃহ নির্মণে এদের দক্ষতা আশ্চর্যজনক। এজন্য পদবিও তৈরি হয়েছে একটি 'ঘরামী'। অর্থাৎ, ঘর তৈরি করেন যারা। সেই থেকে ঘরামী উপাধি। ঘর বা গৃহ নির্মাণের জন্য যা যা একজন কাঠমিস্ত্রির প্রয়োজন, সেগুলোও নিজেরা নির্মাণ করতে সক্ষম। ঘর বাঁধতে বাঁধতে ঘরামী, আবার কাঠের কাজ করতে করতে মিস্ত্রি। লোহার কাজ করতে করতে কামার। ফলে কাঠমিস্ত্রি ও কামার' দুটো পদবিও এভাবে প্রাপ্তি হয়েছে। দা, শাবল, খুন্তি, বটি-দা, রামদা, নিড়ানি ইত্যাদি তৈরিতে এরা সক্ষম! নমঃশূদ্র গ্রামে ঢেঁকির ব্যবহার দেখা যায় প্রবল। শীতকালে পিঠা খাবার যে ধুম লেগে যায় বাঙালির ঘরে ধরে, তার জন্য চালের গুঁড়ো প্রয়োজন পড়ে। যখন কলের মেশিন ছিলো না, তখন এই হাতে তৈরি প্রযুক্তি ঢেঁকিই একমাত্র অবলম্বন ছিলো। নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মানোর ফলে এ চিত্র আমি শৈশবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করেছি। মা-কাকিমা ও ঠাকুমার সঙ্গে ঢেঁকিতে পা মিলিয়ে কাজ করেছি। আমার ঠাকুমা ঢেঁকির মেরামত করতেও জানতেন। ঢেঁকির মতো এই প্রযুক্তি আর বিশেষ দেখা যায় না। এছাড়া আছে বড়শি সহযোগে ছিপ তৈরি করা মাছ ধরার জন্য। দুয়ারি, বানানি, বিভিন্নরকম জাল তো আছেই। বেতের তৈরি ধামা, বাটি, বসার চেয়ার ও টুল প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

লোকক্রীড়াঃ লোকক্রীড়ার মধ্যে মালদায় এদের দেখা যায় নৌকা বাইচ, কাবাডি, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় অংশ নিতে। অনেক লৌকিক ক্রীড়ার মধ্যে নৌকা বাইচটা অন্যতম। বামনগোলা ব্লকের টাঙ্গন নদীতে প্রতিবছর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় বেশ জাঁকজমক করে। ওই অঞ্চলের বেশ কিছু দলের সর্দারদের নাম জানা যায়। তারা হলেন জনার্দন ঢালি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, অনিল বালা, বলাই সরকার, কার্তিক মণ্ডল, হরষিত সরকার, লক্ষ্মণ বলা প্রমুখ। শুনলে অবাক হবেন ১৯৮৫ - ৮৬ সালে একবার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় মেয়েরও একটি নৌকা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলো। নমঃশূদ্র সমাজ ব্যতীত বাঙালি মেয়ে ছাড়া এরকম ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের কথা ভাবা যায় না। বামনগোলা ছাড়াও আগ্রা হরিশ্চন্দ্রপুরেও নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এক সময় হতো। ওখানেও নমঃশূদ্রদের বসতি আছে অনেক। তবে এই লোকক্রীড়া নদীতে পর্যাপ্ত জল আগের মতো না থাকায় বাইচ করার মতো নৌকা তৈরির প্রবণতা কমে গেছে। কারণ, নদীতে জল না থাকলে এই জাতীয় নৌকোগুলো

সংরক্ষণ করা কঠিন।

লোকউৎসব ও লোকাচার: জেলায় একটি বড়ো সম্মেলন ও উৎসব হয় পাকুয়ায়। প্রতিবছর অঘ্রাণ গ্যাসের শেষ বুধবার শুরু হয় এবং শুরু থেকে মোট ৫ দিন চলে মতুয়া ধর্মের ওপর আলোচনা, সংগীত পরিবেশন, দল-বণ্ঠন, মতো বিনিময় ও নানা ধরনের কর্মসূচি। প্রচুর মতুয়া ভক্ত, পাগল, গোঁসাই ও অতিথিদের সমাগম ঘটে। লোকাচারগুলির মধ্যে অন্যতম দু'একটির কথাই এখানে তুলে ধরা সমীচীন হবে বলে মনে করছি। যেমন, প্রথমেই বলতে গাশসের কথা। এটা নমঃশূদ্রদের ঘরে ঘরে পালিত হয়। আশ্বিন মাসের শেষ দিন রাতে এটি পালন করা এবং পরের দিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের প্রথম দিন সকালে এটি শেষ করা হয়। সারা রাত ধরে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বন্দনা করা হয়। যেখানে বসে নিবেদন করা হয়, সেখানে থাকে বাড়ির ব্যবহৃত নানারকম দ্রব্য। সঙ্গে বাড়ির পড়ুয়া বইও রাখা হয়, যাতে পড়াশুনায় ছেলে-মেয়েদের ভালো সুমতি হয়। সাত রকমের শাক সাজিয়ে রাখা হয় । রাখা হয় কাঁচা হলুদ, নিমপাতা ইত্যাদি। মাত শাক ঘণ্ঠ করে খাওয়া হয় এবং কাঁচা হলুদ আর নিমপাতা বেটে সকলেই গায়ে স্নান করেন। তাতে নাকি আর সারা বছর শারীরে আরো কোনো রকম চর্মরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। মালদায় এই লোকাচার একটু বড়ো করে হয় কোথাও কোথাও। যেমন, পার্বতীডাঙায় সুখ হীরার দালনার উত্তম সাধু, শালুকার হরষিত মাধু, মঙ্গলবাড়ির মহা-নন্দা কলোনীর মায়া বেদ্যর বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয়।

ভিটাকুমুর বলেও আর একটা রিলুয়ানে নমোদের, এটা ফাল্গুন মাসের যে কোনো দিন শুরু করা যায়। তবে যে কোনো দিন শুরু করলেও মাসের শেষ দিন শেষ করা হয়। মাটি দিয়ে মঠের মতো করে উঠোনের একপাশে, বিশেষ করে যেখানে তুলসী গাছ থাকে, সেখানে ভিত তৈরি করা হয়। ভিতের শীর্ষে একটি কুলগাছের ডাল পুঁতে রাখা হয়। এটাকেই ভিটাকুমুর ঠাকুর বলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন মেঠো ফুল দিয়ে পুজো করা হয়। তবে দুটি ফুল এই ঠাকুরের নিবেদনে খুবই ব্যবহার করা হয়- শিমুল আর পলাশ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের সামনে সমবেতভাবে একটা ছড়া পড়া হয়। লেখার এই মুহূর্তে ছড়াটি উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। সম্ভব হলো না।

নমঃশূদ্রদের আর একটি সারা বছরের লোকাচার আছে। তার নাম বাস্তপুজো। প্রতিদিন এটা করা হয়। স্নান করার পর ঘরের মেয়ে-বউরা এই পুজো করে প্রতিদিন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজানোও এদের প্রাচীন প্রথা।

পদবি: নমশূদ্র বা মতুয়াদের মধ্যে অসংখ্য পদবি লক্ষ্য করা যায়। যদিও

মতুয়াদের মূল পদবি প্রথম দিকে ছিলো ‘বিশ্বাস’ ও ‘মণ্ডল’। কালক্রমে এত পদবি এই সম্প্রদায়ের দেখা যায়, যা আর কোনো বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নেই। পদবিগুলো দেখে নেওয়া যাক বিশ্বাস, মণ্ডল, সরকার, চৌধুরি, ঘোষ, ঠাকুর, বৈরাগ্য, রায়, দাস, ভদ্র, কাঞ্জিলাল, কবিরাজ, গোস্বামী, কোদালিয়া, বাড়ই, বারুই, বারুরি, মিস্ত্রি, স্বর্ণকার, কর্মকার, বৈদ্য, ঘরামী, গায়েন, মজুমদার, সিকদার, শাখারু, শাঁখারী, বাগচী, কীর্তনিয়া, অধিকারী, হালদার, টীকাদার, ঢালি, ভোজ, সূধা, সিংহ, সদার, সেন, সাফুই, হাওলাদার, প্রামানিক, করাজি, গোলদার, শুকুল, দত্ত, বসু, ভৌমিক, মহন্ত, মৈত্র ইত্যাদি। মালদা জেলায় সব ধরনের পদবির মতুয়াই আছে।

সামাজিকতা ও আতিথেয়তাঃ মতুয়াদের চরিত্রের আর একটি বড়ো বেশিষ্ট্য হলো সামাজিকতা ও আতিথেয়তায় তারা খুব পারঙ্গম। আত্মীয় প্রীতি এদের বেশি। আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এলে মতুয়ীরা খুব খুশী হয়। তাদের সেবাযত্নের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন পরিবারের সকলে। নতুন অতিথি বা আত্মীয়কে বাড়ি থেকে বিদীয় দেবার মুহূর্তে নতুন জামাকাপড় দেবার রীতি দেবার আছে।

দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য খাবারঃ মতুয়াদের কাছে খাদ্য-খাবারে নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই। যে-টুকু যা বিধি-নিষেধ কোনো কোনো পরিবারে পাওয়া যাবে, তা এসেছে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের প্রভাবে। মতুয়াদের শুচি-অশ্রুচি, ছোঁয়াছুঁয়ি, স্পৃশ্য- অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই মতুয়াদের কাছে গুরুত্ব পায়। প্রতিদিন ভাত-মাছই এদের প্রধান খাদ্য। মাছ খেতে খুব পছন্দ করেন মতুয়ারা। প্রতিদিন আহারে সাধ্যমতো এরা মাছ খাবেই। অন্যান্য খাবার তো আছেই। মেয়েদের হাতের রান্না খুব সুস্বাদ হয়। কলাইয়ের ডাল এদের বাড়িতে খেলে নাকি রান্নার স্বাদ বোঝা যায়? সম্ভ্যান্ত মতুয়া বা স্বচ্ছল নমঃশূদ্রদের বাড়ির রান্নাঘরটাই নাকি হোটেল।

মতুয়া সঙ্গীতঃ বাংলা সঙ্গীতের ধারায় মতুয়া সঙ্গীত বলে একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে। সুর-তাল-ছন্দ ও ভাষা কিংবা বক্তব্যের দিক দিয়ে এই সঙ্গীতের মৌলিকত্বকে সহজেই চেনা যায়। আজ দুশো বছর ধরে হাজার হাজার সঙ্গীত রচিত হচ্ছে এবং গীত হচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সিডি বা ক্যাসেটের মাধ্যমে গান মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে অনায়াসে। অসংখ্য মতুয়া সঙ্গীত শিল্পী আছেন বাংলায়। আমাদের জেলাতেও বেশ কিছু শিল্পীর সন্ধান মেলে। উল্লেখযোগ্য দু’জন মতুয়া সঙ্গীত শিল্পী এ জেলার মান বাড়িয়েছে। তাঁরা হলেন আনন্দ বিশ্বাস ও প্রকাশ বিশ্বাস। মতুয়া ভারধায়পুষ্ঠ কবিগান এক অনন্য মাত্রা বহন করছে আজ।

মতুয়া সাহিত্যঃ মধ্যযুগে যেমন চেতনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিলো প্রথম বাংলা সাহিত্যে জীবনীকাল, তেমনি অধুনিক যুগে এবং বাংলা সাহিত্যের এখনও পর্যন্ত শেষ দুটি জীবনী কাব্য তৈরি হয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) ও 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। অদ্ভূত অনেকেই মতুয়া ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য সৃজন করছেন। সারা দেশব্যাপীই মতুয়া সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় একশো পত্রিকা প্রকাশ হয়। লেখক সংখ্যাও কম নয়। উপন্যাস- ছোটোগল্প- কবিতা-প্রবন্ধ- ছড়া- নাটক প্রভৃতিতেই পরিসর খুঁজে নিয়েছে মতুয়া সাহিত্য এবং এই সম্প্রদায়ের লেখকেরা। মেইন স্ট্রিমের সাহিত্যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোককেরা কেউ কেউ যথেষ্ট প্রভাব ইতিমধ্যে রেখেছেন। মালদা থেকে এই ভাবধারায় প্রকাশিত হয় দুটি পত্রিকা- 'শব্দভাষ' ও 'প্রত্যয়'। মতুয়া সাহিত্যে মালদা জেলায় একজনই দক্ষতার সঙ্গে লিখে চলেছেন। তিনি অনিকেত মতুয়া। তাঁর প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হয়েছে।

টোটো জাতির জীবন ও জীবিকা

অভিজিৎ সরকার

গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়েই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নানান জাতির বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। আজ যে জাতির সম্পর্কে আলোচনা করবো সে এক বিরল জাতি বলা যেতে পারে। এর কারণ হচ্ছে এই টোটো জাতি সম্পর্কে আজও অনেকেরই অজানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর প্রান্তের ভুটান সীমান্তে এক ছোট্ট গ্রামে এদের বাস। পাহাড়ের কোল থেকে নেমে পড়ছে তোর্ষা নদী। অনান্য সময় নদী মন্থর বেগে চললেও বর্ষার সময় এই নদী তার পুনঃযৌবন লাভ করে। টোটো যা নিজের এলাকা ছাড়া আর কোথাও তাদের সেভাবে চোখে পড়ে না। টোটো উপজাতির নিজস্ব কোনো লিপি নেই তবে অনেকে বর্তমানে বাংলা লিপি ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বাংলা ও নেপালী দুই ভাষাতেই সমান পারদর্শী। টোটো জাতিরই একমাত্র বাস বলে সেই এলাকা টোটো পাড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের সন্নিকটে এই গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। সাথেই রয়েছে ভুটানের সীমানা। আর সেই সীমন্ত বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদিং পাহাড়, এই পাহাড়েই ঢালেই তাদের বাস।

টোটোদের জীবন ও জীবিকা স্বাভাবিক লোকের জীবন জীবিকা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। টোটোদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই বেশি। তারা তাদের জীবন যাপনের জন্য কৃষিকাজকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কৃষি কাজের পাশাপাশি এরা পশুপালন করে থাকে। সকাল হতে না হতেই তারা বেরিয়ে পড়ে গবাদি পশুদের নিয়ে পাহাড়ি জঙ্গলে পশুদের খাবারের সন্ধানে। সেই পাহাড়ের ধরে টোটোরা কমলালেবুর চাষ করে থাকে। বহু আগে সেখান থেকে টোটো চাষিরা উচ্চমানের কমলালেবু উৎপাদন করত। বর্তমানে কমলালেবুর বাগান সেভাবে আর লক্ষ্য করা যায় না।

টোটোরা তাদের বসবাসের জন্য বাড়িগুলোকে মাটি থেকে ৫-৬ ফুট উঁচু মাচার উপর তৈরি করে থাকে। কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি বন্য উপকরণ দিয়ে তারা তাদের বাসগৃহগুলিকে নির্মাণ করে থাকেন। এই এই বাসগৃহগুলির নিচে গরু, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপালন করে থাকে। চাষ-বাসের উপর তারা নির্ভরশীল হলেও তারা চাষ আবাদের ক্ষেত্রে তারা অতটা দক্ষ নন। জমির অভাব অথবা জমি থাকলেও জমির উর্বরতার অভাব তাদের খাদ্য শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। জঙ্গল থেকে তারা বিভিন্ন ফল, রান্নার জন্য

জ্বালানি, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। খাদ্যের জন্য এখনো তারা বনের ওপরই নির্ভরশীল।

টোটোদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। টোটোরা অন্য বর্ণে বিবাহ করে না। অতীতে সেখানকার ছেলে মেয়েরা অন্যান্য বর্ণের ছেলে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতো না, তবে বর্তমানে সেই কালো মেঘ ঘুঁচিয়ে তারা সকলের সাথেই মেলামেশা করে থাকে। টোটোরা প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসে। তারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও তাদের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে।

ভুটান সীমান্ত লাগোয়া এই বিরল জাতির কথা আজও অনেকেরই অজানা। আমরাও অজানা ছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য তাদের সাথে মিশে যাওয়া, তাদের সম্পর্কে জানা সত্যিই এক অপূর্ব অনুভূতি। তারা-ও তো উত্তরবঙ্গবাসী কিন্তু তাদের আমরা আজও সেভাবে আপন করে নিতে পারিনি। আশাকরি করি পরবর্তী দিনে এই ক্ষুদ্র টোটো উপজাতি পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় তারাও একদিন উন্নতির চূড়ায় পৌঁছে যাক এবং আমরাও যেনো তাদের উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে আপন করে নিতে পারি।

আলিপুরদুয়ার, ভারত।

উত্তরের শোলাশিল্প

মনামি সরকার

পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা কোচবিহার। জেলা কোচবিহারে রয়েছে পাঁচটি মহকুমা। এর মধ্যে অন্যতম সীমান্তবর্তী মহাকুমা দিনহাটা। দিনহাটার ১ নং ব্লকের অন্তর্গত ভেটাগুড়ি, ভেটাগুড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে বালাডাঙ্গা গ্রামের মালিকাটারিচর মালিপাড়া। গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা, খেতের আল, বাঁশের সরু সাঁকো পার হয়ে পৌঁছতে হয় এই মালি পাড়ায়। ৩৪ ঘর মানুষ রয়েছেন এই পাড়ায়। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে মালি মহেন্দ্র নাথ মালাকারের সঙ্গে আরো ৭ ঘর মালি পরিবার এই এলাকায় আসেন। তারাই সংখ্যায় বেড়েছেন। এছাড়াও তুফানগঞ্জ এর ১নং ব্লকের ধলপল অঞ্চলে বেশ কয়েক ঘর শোলাশিল্পীর বাস রয়েছে।

পুরান মতে মহাদেব হিমালয় কন্যাকে বিবাহের সময় শ্বেত মুকুট পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মুকুটের উপাদান হিসেবে মহাদেবের ইচ্ছেতেই জলাশয় এক ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়, সেটাই শোলা গাছ। কিন্তু এত নরম বস্তু দিয়ে মুকুট প্রস্তুতে দেব শিল্পী ব্যর্থ হলে শিবের ইচ্ছেতেই এই জলাশয় থেকে জন্ম হয় এক সুকুমার যুবকের। সেই যুবক শোলা দিয়ে মুকুট প্রস্তুত করে। তাকে মালাকার বলে আখ্যায়িত করা হয়। এখন যারা শোলাশিল্পের সাথে যুক্ত তারা মালাকার নামে পরিচিত এবং হিন্দু সমাজভুক্ত। দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা হলেও এই শোলাশিল্পীদের ইষ্ট দেবতা শিব।

মালাকাররা বংশানুক্রমিকভাবেই এই শোলাশিল্পের সাথে যুক্ত। এই কাজ শেখার জন্য এদের বিশ্বাস কোনো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না। এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মকে দেখি এই কাজ রপ্ত করে। মাটির উঠোনে আসন পেতে বসে পরুষদের পাশাপাশি বাড়ির মেয়ে বউরাও এই কাজ করে।

শোলা মূলত কক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত কোনো চাষবাস যত্ন ছাড়াই এরা জলাভূমিতে বেড়ে ওঠে। শোলা গাছের যে অংশ দিয়ে কাজ করা হয় সেই অংশটা পুকুরের জলের নিচে থাকে, সেগুলি ৩-৪ ফুট লম্বা হয়। সব শোলা দিয়ে কাজ করা যায় না। শোলারশিল্পীর জন্য মূলত ভাত শোলা ব্যবহার করা হয়। আগে নিজের এলাকা থেকে শোলা সংগ্রহ করে কাজ করত মালিকাটারির শোলশিল্পিরা। কিন্তু এখন আর ভালো মানের শোলা হয় না বলে নিম্ন আসামের বিভিন্ন জায়গা থেকে শোলা কিনে এনে কাজ করতে হয়।

'শোলা শিল্পের মূল উপাদান শোলা। আকর শোলার বাইরের আবরণটা

মেটে রংয়ের আর ভেতরটা সাদা। পাতলা ধারালো ছুরি দিয়ে উপরের মেটে রংয়ের ছালটা ছারিয়ে নিয়ে ভেতরের সাদা অংশটা বার করে নেওয়া হয়। তারপর প্রয়োজন মত শোলা দন্ডটাকে টুকরো করে নেওয়া হয়। তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাতলা পাতের মতো টুকরো বার করা হয়। সেই পাতকে আবার জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁচি দিয়ে কেটে নানা আকার দেওয়া হয়। শোলার তৈরি জিনিসগুলোকে সুদর্শন করার জন্য শিল্পীরা রং, জোরি চুমকি ব্যবহার করে থাকে। এই পাতলা পাতগুলোকে না না আকারে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে নানা জিনিস তৈরি করা হয়। শোলার জিনিস বানাতে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। ছোট একটা কাঁচি, ধারালো ছুরি এক টুকরো পাথর এর জন্য যথেষ্ট।

শোলাশিল্পীরা মূলত দেব-দেবীর শোলার গয়না, ফুল, মালা, মুকুট বানায়। এছাড়াও বিষয়ে, অন্নপ্রাশন এর শোলার মুকুট, মালা সারা বছরই কমবেশি বানায় ওরা। তবে মনসা পূজোর পরে শ্রাবনের শেষ বায়না আসতে শরু করে। ব্যস্ততা বাড়ায় ওদের ঘরে। দুর্গা পুজোর আগে দিন-রাত জেগে মায়ের জন্য গয়না, মুকু, চূড়া, কোমর বন্ধনি, বিজয়া দশমীর ফুল ইত্যাদি বানায় ওরা। ওদের বানানো জিনিসগুলো পৌঁছে যায় শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ইসলামপুর, আসামের কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও, গৌহাটিতে।

এছাড়া শোলা দিয়ে ফুল, পাখি, বজরা, বিভিন্ন সৌধ নিপুন শৈল্পিক দক্ষতায় গড়ে তোলে তারা। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে, সৌখিন মানুষের বাড়িতে শোভা বর্ধন করে চলেছে মালাকারদের এই শিল্পকর্ম। শুধু দেশেই নয় বিদেশের মাটিতেও যথেষ্ট প্রশংসিত এই শোলাশিল্প। তুফানগঞ্জ এর মেয়ে সোমা মালাকার শোলা দিয়ে তার হস্তশিল্পের জন্য রাজ্য স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

সাদা শোলার চালা, শোলার মুকুট, গয়না মাঝখানে দুর্গা মূর্তি, কি অপরূপ তার দৃশ্য। মায়ের এমন সাজকে "ডাকের সাজ" বলে। বনেদি পুজোগুলোতে সাধারণত এই ডাকে সাজ দেখা যায়। ইতিহাস বলে, শেষ পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম এই সাজে দুর্গা মূর্তি দেখা যায়। আর এই শোলার সাজের উপকরণ ডাক যোগে জার্মানি থেকে এসেছিল বলে শোলা দিয়ে দেবীর এই সাজকে ডাকের সাজ বলা হয়। একটা সময় এই ডাকের সাজ খুব জনপ্রিয় ছিল।

তবে সময়ের সাথে সাথে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। শোলার গয়নার জায়গা নিয়েছে বিদেশি জোরি, রং, ধাতুর অলংকার। চাহিদা কমেছে

শোলার গয়নার। রোজগারের তাগিদে মালাকারদেরও অনেকে পেশা বদল করেছে। কারণ কাজ অনুযায়ী তারা সঠিক মজুরি পায় না, মেলে না কোনো সরকারি অনুদান। সব মিলে হারাতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী এই হস্তশিল্প।

তবু মাটি কামড়ে পড়ে আছে এখনো ধীরেন্দ্রনাথ, যুথিকা, ঊষা রানী মালাকাররা পূর্বপুরুষের পেশাকে ভালোবেসে। দিনহাটার ভেটাগুড়িতে শোলাশিল্পকে কেন্দ্র করে বর্তমানে প্রায় ৫০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

আবার নতুন করে আশার আলো দেখছে শোলাশিল্পিরা।

জীবন ও জীবিকায় তামাক
অভিজিৎ দাশ

এপার, ওপার দুই পার বঙ্গের উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সাফল্যের সাথে তামাক চাষ করা হচ্ছে। এপারের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে অবস্থিত দুটি জেলা- কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় তামাক চাষের ঐতিহ্য আছে। অবশ্য এখন পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদিত তামাকের সিংহভাগ (৭৫ থেকে ৮০%) কোচবিহার জেলায় উৎপন্ন হয়। রংপুর জলপাইগুড়ির তামাক চাষের মূল কিছু এলাকা স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান (এখনকার বাংলাদেশের) অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য অংশে তামাক চাষ কমে যায়। কোচবিহার জেলার মূল তামাক চাষের এলাকা বর্তমানে দিনহাটা মহকুমায় অবস্থিত। দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার মানসাই নদীর কাছাকাছি এলাকায় প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। দিনহাটার আদাবাড়ি, বারবাংলা, চামটা এই চাষে বিখ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে- 'আদাবাড়ির পাত, বারবাংলার জাত'। অর্থাৎ আদাবাড়ির তামাক পাতা আর বারবাংলার তামাকের জাত অর্থাৎ গুণে সেরা। মানসাই তীরে সোনালি ভার্জিনিয়া তামাক উৎপাদিত হয়। মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, মেখলিগঞ্জে ভালো আবাদ হয়। কোচবিহার রাজ্যে দশ রকম তামাক চাষের কথা জানা যায়। যেমন- চামা বা কুলা পাতি, শকুনি চামা, দাড়াইচ মেনি, বড়ো মেনি, ছোট মেনি, পটুয়াখুলি, ভেলেঙ্গি, সিন্দূরখাটুয়া, ঢাড্ডি, নাওখোলা। দেশি জাতের তামাক ছাড়াও উৎকৃষ্টমান এবং বেশি উৎপাদনের জন্য বিদেশি তামাক চাষের চেষ্টা রাজ উৎসাহে করা হয়। এ ব্যাপারে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টা করেছেন। মহারাজকুমার নিত্যেন্দ্রনারায়ণ লিখেছেন, "Tobacco is a principal crop of Cooch Behar; and with a view to introduce in the State scientific methods of curling as followed in the other countries, under the instruction of MZ father His Late Highness Maharaja Sir Nripendra Narayan Bhul Bahadur (1863-1911) went to Cornell University, New York where I specialised in agriculture for sometime; and to Cuba, West Indies, where observe the method of the culture, curing and manufacture of the famous. Havana tobacco." তার সাথে ইন্দুভূষণ মজুমদারকেও পাঠানো হয়েছিল। তারা মেসিডোনিয়া, এশিয়া মাইনর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের তামাক উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মহারাজার এই সক্রিয়তা কোচবিহারে তামাকের উন্নত জাত উৎপাদনে তার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে প্রকাশ করে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারে প্রথম পরীক্ষামূলক তামাকের খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মি. প্যাটারসনকে কাউয়ার ডেরায় ১০০ বিঘা জমিতে এই খামারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাকে ৮০ মণ তামাক, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও শ্রমিক দেওয়া হয়। শীতলকুচি, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহারে ছোট খামার তৈরি হয়েছিল। প্যাটারসনের মৃত্যু হওয়ায় স্পেনীয় মি. মন্টফোর্ডের দায়িত্বে ওই খামারগুলি আসে। অবশ্য তিনি ম্যানিলা প্রথায় চাষের দায়িত্ব আগেই পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের সমস্যায় তাকে এ স্থান ছাড়তে হয়। এরপর রাজ্যের কৃষি ও বন বিভাগ হোম ফার্মের মাধ্যমে পার্শিয়ান তামাক উৎপাদনের চেষ্টা করলে তা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। পরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভে কোচবিহার শহর সংলগ্ন নীলকুঠিতে আবার পরীক্ষামূলক খামার স্থাপিত হয়। বিদেশি পদ্ধতিতে এখানে উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রথম দিকে সাফল্য পেলেও পরে প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদন মার খায়। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইন্দুভূষণ মজুমদার। এভাবে বারে বারে তামাকের মানউন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনোত্তরকালে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'র‍্যাপার অ্যান্ড হুকা টোবাকো রিসার্চ স্টেশন' দিনহাটায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় এই সংস্থার নাম পরিবর্তিত হয়ে 'দিনহাটা টোবাকো রিসার্চ সেন্টার' হয়েছে। স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত জাতের তামাক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উন্নতমান ও অধিক উৎপাদনশীল জাত উৎপাদন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। আবার অন্য উন্নতমানের তামাক এখানে চাষ করা যায় কিনা তা দেখাও তাদের কাজের অঙ্গ। এখানে বর্তমানে 'মোতিযহারী' এবং 'জাতি' নামের তামাকই প্রধানত উৎপন্ন হয়। হুকা, খৈনি, চুরুট, বিড়ি ইত্যাদিতে এখানকার তামাক ব্যবহৃত হয়। ।

রংপুর বাংলাদেশের প্রধান তামাক উৎপাদক অঞ্চল। এ ছাড়া কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় তামাক উৎপন্ন হয়। রংপুরে 'মোতিহারী' ও 'জাতি' তামাক বেশি উৎপন্ন হয়। কোচবিহার জেলার চেয়ে রংপুরের তামাকের মান অনেক ভালো। রাজ আমল থেকে কোচবিহারে রংপুরের চেয়ে উন্নতমানের তামাক উৎপাদনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এই ফসলকে অবলম্বন করে দুই বঙ্গে একই রকম জীবিকার পরিচয় মিলে।

দিনহাটায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র চুরুট কারখানাটি বেশ কয়েক বছর উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিল। কৃষিজ ফসল হিসেবে তামাক প্রতি বছরই কৃষকদের মুখে হাসি ফোটায়। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগাক্রমনে চাষ মার খায়। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে তামাকের চাষ বেশি লাভজনক।

তামাক চাষের সাথে সাথে অনেক জীবিকা বা পেশা জড়িয়ে আছে। তেমনই একটি হলো 'আইটেনদারী'। আইটেনদাররা শুকনো তামাক পরপর গুছিয়ে আটি তৈরি করে। ওই গোছানো আটি বাঁধার কাজ যত দৃষ্টিনন্দন হবে তামাকের দাম তত বেশি পাওয়া যাবে। সেদিক থেকে আইটেনদাররা তামাক ব্যবসায়ীদের কাছে সম্পদ বলে বিবেচিত হয়।

প্রথমে জমিতে তামাক গাছ থেকে তামাক পাতা কেটে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তামাক শুকানোর দু'রকম পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে একটি হলো হাতের বিশেষ কায়দায় পত্রফলক কুঞ্চিত করা এবং দ্বিতীয়টি হলো ফলক টানটান করে মেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া।

বড়ো গৃহস্থরা বাড়িতে এবং ব্যবসায়ীরা গুদামে তামাক স্তূপ করে রাখেন। থরে থরে তামাক সাজিয়ে স্তূপ (গাদি) করে রাখা হয়। তা 'জাগ দেওয়া' নামে পরিচিত। পাট পচিয়ে আঁশ বের করার জন্য জাগ দেওয়া হয়। আর তামাক জাগ দেওয়া হয় পাতার রং ও গন্ধ আনার জন্য। এ কাজে দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন হয়। না হলে ইপ্সিত রং বা গন্ধ পাওয়া যাবে না, দামও বেশি হবে না। তামাক জাগ দেওয়া এক শ্রেণির মানুষের জীবিকা। মাঝে মাঝে গাদি ভাঙার কাজ করতে হয়। সাধারণত এই দুই ক্ষেত্রে একই শ্রমিক কাজ করে। গাদি ভাঙার সময় ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়। মধ্যেই শ্রমিকরা কাজ করে। এ ঝাঁঝালো গন্ধ ১০০ মিটার দূর থেকেও পাওয়া যায়। গন্ধে নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, চোখের জল চলে আসে। শরীরের ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে তবু বেঁচে থাকার জন্য তারা এই জীবিকা নির্বাহ করে।

এ অঞ্চলে তামাককে নির্ভর করে বহু খৈনি তৈরির Attempt (ক্ষুদ্রশিল্প) গড়ে উঠেছে। খৈনির জন্য পাতা টুকরো টুকরো করে কেটে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। তামাকের টুকরো থেকে গুঁড়ো ও নোংরা আলাদা করার কাজ করে মহিলা দিনমজুররা। গন্ধ ও উড়ে আসা গুঁড়ো থেকে নাক-মুখ ঢাকতে তারা কাপড় জড়িয়ে নেয়। ওই মহিলারা কুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোংরা ঝাড়ে। একদিকে তামাকের গন্ধ এবং পরোক্ষ নেশা, অপরদিকে নাক বন্ধ থাকায় অল্প অক্সিজেনে প্রশ্বাস নেওয়ার কাজ দীর্ঘক্ষণ ধরে চালিয়ে যায় বলে মহিলারা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নার্ভসহ নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসুখে ভুগতে শুরু করে। এমনকি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। নাক, মুখ, চোখ বন্ধ থাকায় প্রশ্বাসের জন্য বেশি হাওয়া পাওয়া যায় না। এতে ফুসফুসের উপর চাপ বাড়ে। ফুসফুসসহ হৃদপিন্ডে ক্ষতির কারণ হয়। অনেকে খৈনি ছোট ছোট পলিপ্যাকে ভরে রাখে। খৈনির নেশা তুলনায় অনেক সস্তায় করা যায়। এজন্য

এই নেশার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। অনেক শিক্ষিত ছেলে বেকারত্ব ঘুঁচিয়ে খৈনি কারখানায় লাভের মুখ দেখছে। অল্প পুঁজির ব্যবসা হিসেবে খৈনি তৈরি বেশ লাভজনক ব্যবসা।

তামাক দিয়ে বিড়ি বোধ হয় সবচেয়ে বেশি তৈরি করা হয়। দুই বঙ্গেই বিড়ি শিল্প খুব প্রাচীন, লাভজনক, জনপ্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদিন প্রচুর বিড়ি বিক্রি হয়। এজন্য অনেক বিড়ি ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে। ফ্যাক্টরি থেকে গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে বিড়ির পাতা ও মশলা পাঠানো হয়। গৃহকাজের অবসরে মহিলারা বিড়ি তৈরি করে ভালোই রোজগার করে। বিড়ি সেঁকার কাজ করে পুরুষরা। কেউ কেউ মশলা তৈরি করে। অননেকে বিড়ি প্যাকেটবন্দী করে। এই কাজগুলি প্রতিটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। টিবি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

তামাকের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নেওয়া, তা রোদে শুকানো, গুটিয়ে ঘরে তোলার কাজ সাধারণত কৃষিজীবী পরিবারের ছোট-বড়ো সবাই মিলে করে থাকে। তামাকের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলিতেও শিশুদের ব্যবহার করা হয়। দু মুঠো ভাতের জন্য, পরিবারে আয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য অনেক শিশুকে কাজে নামতে হয়। সস্তায় তাদের শ্রমকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কচি শরীরে তামাকের প্রভাব তাদের বিপদজনক পথে টেনে নিয়ে যায়। তাদের শ্রমকে চুরি করে একশ্রেণি মুনাফা লুটছে। আর শিশুরা ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর শিশুরাই শুধু বলি কেন? তামাকের নিকোটিনের হাত থেকে বড়োদেরও রেহাই মেলে না। তবু জীবন বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া তারা কোনো উপায় দেখতে পায় না।

ভেটাগুড়ি, কোচবিহার

জীবন জীবিকার বিবিধ পাঠ

অভিবাসী শ্রমিক বনাম টেকসই উন্নয়ন

মো: আহসান হাবিব

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডর অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কর্মক্ষম যুবসমাজ, যাদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমবাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলে বাংলাদেশ উন্নয়নের গতি আর অনেকগুন বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রেণি বৈষ্যমের কারণে এই তৃতীয় বিশ্বে মানুষে মানুষে বিভেদ অনেক, সেই সাথে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে মানুষ আজ দারিদ্রতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, আর এই কারণেই আদিকাল থেকে মানুষ স্থান পরিবর্তন করে উন্নত জীবনের স্বপ্নকে পুঁজি করে অভিবাসনের নামে মানব পাচারের শিকার হচ্ছে। আবার বর্তমান বাস্তবতায় রিক্রুটিং এজেন্সি নিযুক্ত দালাল কর্তৃক স্বপ্নের বিক্রয় করে যে প্রতারণার ব্যবসা চলছে, সেখানেও শুধু অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ও রেমিটেন্স হিসাব করে সরকারি মন্ত্রণালয় বসে থাকবে তা হতে পারে না!

একথা অস্বীকার করছি না যে বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ব্যুরো যা আমাদের কাছে (বিএমইটি) নামে পরিচিত তারা ভিসা যাচাই, বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ, স্মার্টকার্ড, চাকরির চুক্তিপত্র যাচাইসহ বহুমুখি কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনের জন্য যে কাজ করছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। তারপরও প্রাণের টানে কিছু প্রশ্ন আজ করতে চাই, অভিবাসী শ্রমিকদের জীবন উৎসর্গ করে নিজের পরিবার ও মাতৃভূমির জন্য অদম্য ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের কারণে যে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স বাংলাদেশে প্রেরণ মাধ্যমে অর্থনীতি আজ সচল রয়েছে, তা উপলব্ধি করে সরকার কি তাদের পরিবার ও সন্তানদের জন্য কোনো কর্মসূচি নিয়েছেন?

অভিবাসী শ্রমিক ভাই ও বোনেরা বিদেশে কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখিন হলে বাংলাদেশী দূতাবাস ও লেবার এটাচিগুলোতে এই জাতীয় বীরদের সাথে অশোভন আচরণ করে, যেখানে লেবার এটাচিগুলোতে জনবান্ধব ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার কর্মদক্ষতা ও সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ কি করতে পারে না?

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, পূর্ণবাসন ও সামাজিকভাবে একীভূত করণে করতে প্রকল্প গ্রহণ ও মধ্যপাচ্যের দেশগুলোতে নারীকর্মদের জন্য "ডরমেন্টটির" ব্যবস্থায় নিশ্চিত করতে সরকার কি কর্ম কৌশল নিচ্ছেন?

বিদেশগামী শ্রমিকদের মেডিক্যাল চেকআপের সহায়তার জন্য 'গামকা' কে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে চেকআপ সেন্টার স্থাপনে জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মন্ত্রনালয় কি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

এয়ারপোর্ট এ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এ অবস্থান ও কর্মী সংখ্যা এতই নগন্য যে অভিবাসী শ্রমিকরা যাত্রা পথে বিভিন্ন সহায়তার উঠতে জন্য কোথ ায় যাবে তা বুঝে উঠতে পারে না, এই কারণে ভিজিবিলিটি নিশ্চিত করে কর্মীদের অভিবাসী শ্রমিক বান্ধব করে তুলতে হবে। এখনও অধিকাংশ সম্ভাব্য অভিবাসীরা "ফ্রি ভিসা" বলে যে কোনো ধরনের ভিসা নেই তা জানে না এবং বৈদিশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ বিষয়ে দেশের প্রতিটি থানায় কর্মরত পুলিশবাহিনী ও আইনজীবি সংগঠনগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কী কী কর্মসূচি নিয়েছেন?

বাংলাদেশ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও সার্ভিস লি. (বোয়েসেল) মাধ্যমে লোক প্রেরণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করতে হলে সরকার কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না?

অভিবাসী শ্রমিকদের সন্তানদের সামাজিক ও পারিবারিক কারণে আজ বিপথগামী তাই এই সকল অবস্থার উন্নয়নে এবং সরকারের সাথে দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোকে ব্যাপক কর্মসূচির জন্য কী কী উদ্যোগ নিচ্ছেন?

সরকার শুধু অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিটেন্স না গুণে ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও শোভন কাজের জন্য বিভিন্ন দেশের শ্রম উন্নয়নে অভিবাসন নীতি ও শ্রম অভিবাসন উন্নতরকরণে জনসংখ্যা সে অভিশাপ তা আর্শিবাদ হয়ে উঠবে। তাই অভিবাসী শ্রমিকদের ত্যাগ ও বিনির্মিত জাতি গঠনে তাদের অবদানকে মাথায় রেখে জাতীয় বীর হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে।

নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতালদের সংগ্রামী জীবন

মোস্তাজিরুর রহমান

পলাশী প্রান্তরে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় তখন মীরজাফর তাদের পাপেট নবাব হিসেবে সুবাহ বাংলার নবাবি শুরু করে এবং সুবাহ বাংলার প্রতিটি জনপদে স্বাধীনতার সুর্য অস্তগামী হয় বাদ পড়ে না ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমুহও।

উপ মহাদেশের সবচেয়ে পুরনো নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা অন্যতম। এদের গায়ের রঙ কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কোঁকড়ানো কালো, ওষ্ঠ-পুরু, মাথা লম্বাটে, থ্যাবড়ানো নাক প্রায় দশ হাজার বছর পুর্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে এই সংগ্রামী নৃ-গোষ্ঠী তিমুর, ইন্দোনেশিয়া হয়ে ব্রক্ষদেশ ও আসামের ভেতর দিয়ে এই অস্ট্রো-এশিয় জনগোষ্ঠীর ভারত উপমহাদেশে আগমন ও বিস্তার। সাঁওতালরা বৃহৎ দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর একটি উপজাতি এবং ভাষাগত দিক থেকে কোলারিয়ান শ্রেণির। দামিন এ কোহ একটি ফারসি শব্দ যার অর্থ হলো পর্বতের পাদদেশ। এই অঞ্চলের বর্তমানে সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত। বীরভুম রাজাদের অত্যাচারে ১৮০৯ সাল নাগাদ সাঁওতালরা বীরভুম ছেড়ে গোদ্দা মহকুমা অঞ্চলের বনাঞ্চল পরিস্কার করে বসবাস আরম্ভ করে। ১৮৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ৪২৭টি সাঁওতালি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সবচেয়ে বড় সাঁওতাল জনপদটি গড়ে ওঠে বিহারের ভাগলপুর, ছোট নাগপুর, পালামৌ, মানভুম বাংলার বিরভুম, বাকুড়া, মেদিনীপুর এবং বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ মঅঞ্চলে। সাঁওতালরা প্রকৃতির সন্তান তারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহে স্বাধীন। প্রকৃতিগতভাবেই সাঁওতালরা শিকারি জাতি। বন জংগলের কাছাকাছি এলাকায় তারা বসতি গড়ে তোলে এবং বন বাদার জংগল ঘুরে তীর ধনুক দিয়ে শিকার করে তাদের দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা করে নেয়, মূলত তারা কৃষিকাজ করলেও তাদের কিছু অংশ চা বাগানের কাজ, কুলির কাজ কেউবা আবার মাটি কাটার কাজের সাথেও সম্পৃক্ত। জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে কিছু বাছ বিচারও আছে। সব গোত্রের লোক আবার সব ধরনের পেশায় যেতেও পারে না। সাওঁতাল সমাজ নানা গোত্রে বিভক্ত তাদের গোত্রকে বলা হয় টোটেম। এদের সমাজ ব্যবস্থায় মোট ১২টি গোত্রের সন্ধান মিলে-

১. কিস্কু

২. হাঁসদা
৩. মুর্মু
৪. হেমব্রম
৫. মারান্ডি
৬. সরেন
৭. টুডু
৮. বাস্কি
৯. বেসরা
১০. পাউরিয়া
১১. গুয়াসরেন
১২. চোঁড়ে

এছাড়াও এদের উপগোত্রের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১০০টি।

সাঁওতালরা প্রভুভক্ত হলেও স্বাধীনচেতা। এবং তাদের নিজেদের গোত্রের মধ্যে কিছু বদ্ধগত ট্যাবু থাকলেও তাদের উপর যখন বাইরের কেউ আক্রমণ করে তখন তারা ভুলে যায় তাদের যাবতীয় সীমাবদ্ধতাও। তারা নিজেরা তাৎক্ষণিকভাবে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রতিরোধ গড়ে ঐক্যবদ্ধভাবে।

এবার ফিরে যাওয়া যাক একটু পিছনের দিকে কী ঘটেছিল ইংরেজি ১৭৭৮ সন পরের দিনগুলোতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মুঙ্গের পৌঁছলেন অগস্ট ক্লিভল্যান্ড নামক ইংরেজ ভদ্রলোক। জঙ্গলমহলের অর্থনীতির জন্য এ এক নতুন পর্ব। ক্লিভল্যান্ড আদিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে কথাবার্তা বলার জন্য তাঁদের ভাষাই শিখলেন না একাত্ম হতে তাঁদের কৃস্টি সংস্কৃতির সঙ্গেও মিশে গেলেন। আদিবাসীরাও যেন ক্রমশ নিজেদের করে নিতে শুরু করলেন এই বিদেশিকে। কৃষকদের খাজনা মওকুফের জন্যও ক্লিভল্যান্ড সাধ্যমতো চেষ্টা করতে শুরু করলেন। কিন্তু, এগুলো ছিলো শুধুই লোক দেখানো, আদিবাসীদের বন্ধু হতে নয়, ক্লিভল্যান্ড এসেছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের চর হয়ে আদিবাসীদের বীর নায়ক তিলক মাঝিকে হত্যা করতে।

পাহাড়িয়া এবং সাঁওতাল দুই উপজাতির মানুষই তিলকাকে নিজেদের মনে করেন আজও। বাংলার নবাবদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ার পর শোষণের মাত্রা যেন অসহ্য হয়ে উঠতে থাকল। আর এর মধ্যেই এসে পড়ল ভয়ঙ্কর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সারা বাংলা নাকাল সেই দুর্ভিক্ষে। আর সাঁওতাল পরগণা ও জঙ্গলমহলে ক্ষুধার জ্বালার সাথে বেড়ে গেল দ্রোহের আগুন। ঠিক এ রকম সময়ে মানুষ আসা করেছিল,

বাড়তি সাহায্য না পেলেও কোম্পানি নিশ্চই খাজনা মওকুফ করবে। অথচ বাস্তবে ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। ব্রিটিশ কোম্পানি সাহায্য তো দূরে থাক বাড়িয়ে দিল খাজনার পরিমাণ। তিলকা মাঝির নেতৃত্বে জোট বাঁধল পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠী। জঙ্গলমহল লুঠ করে সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করে তোসাখানা গড়েছে ব্রিটিশ কোম্পানি। তিলকা মাঝি তার অনুসারী সহযোদ্ধাদের নিয়ে নামলেন যুদ্ধে। অস্ত্র বলতে সঙ্গে থাকা কিছু তীর-ধনুক আর প্রবল জাতিপ্রেম ও অসীম সাহস। তাই আদিবাসীদের সেই তীর ধনুকের সামনেই হার স্বীকার করল ব্রিটিশ কর্মচারীদের বন্দুক-পিস্তল। তোসাখানার অর্থ নিয়ে বণ্ঠন করে দিলেন অভুক্ত সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া মানুষদের মধ্যে। পুলিশের খাতায় ডাকাত সর্দার লেখা হলেও বস্তুত আদিবাসী মানুষদের কাছে তিলকা মাঝি জাতীয়তাবাদী যোদ্ধাপুরুষ। এর পর ইংরেজরা একাধারে তিলকা মাঝির সন্ধানে যেভাবে অভিযান চালানো শুরু করে তেমনি তিলকার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাওতাল ও পাহাড়িয়াদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ। আদিবাসীদের মাঝে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতা পেতে শুরু করে। ব্রিটিশরা পরগণা পরগণায় গড়ে তোলে তাদের সেনা ছাউনি। অসহায় আদিবাসীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হলো। তবু অত্যাচারের মুখেও কেউ তিলকাকে ধরিয়ে দিলেন না। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য স্বজাতির উপর এমন অত্যাচার মেনে নিতে পারেননি তিলকা। তিনি নিজেই ব্রিটিশ সেনাদের মোকাবিলা করার জন্য যুবকদের নিয়ে তৈরি করলেন বাহিনী। ততদিনে কোম্পানি সৈন্যদের হাতে এসেছে আরও উন্নত অস্ত্র আর আদিবাসীদের সেই তীর-ধনুকই ভরসা। ১৭৭৮ সাল, রামগড় ক্যান্টনমেন্টের সেই যুদ্ধে পরাস্ত হলো ব্রিটিশ বাহিনী।

ক্লিভল্যান্ড নানা ধরনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন, তার সেই প্রলোভন সত্ত্বেও তিলকা মাঝি ফাঁদে পা দিলেন না। এভাবে তিলকাকে ধরা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সরাসরি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন ক্লিভল্যান্ডও। যে আদিবাসীরা এতদিন ধূর্ত ক্লিভল্যান্ডকে নিজেদের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা অবাক হলেন। তারা সকলেই এবার তিলকার হাতকে শক্তিশালী করার মানসে এক হলেন। ১৭৮৪ সালে ঘটে গেল ভাগলপুরের রক্তক্ষয়ী লড়াই। কোম্পানির অনেক সেনা শহিদ হলো অসংখ্য আদিবাসী। তিলকার ছোঁড়া তীর শরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো ক্লিভল্যান্ডের। এর পর টনক নড়ল ব্রিটিশ প্রশাসনের। ব্রিটিশরা বুঝতে পারলো এত সহজে সাঁওতালদের শায়েস্তা করা সম্ভব নয়, তাই ভয়ানক নিষ্ঠুর লেফট্যানেন্ট জেনারেল আয়ার ক্রুটকে দায়িত্ব দেওয়া হলো নির্বিচারে সমস্ত আদিবাসীদের হত্যা বা বলপ্রয়োগ

করে বিদ্রোহ দমন করতে। তিনমাসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলল, তবুও তিলকাতে ধরতে পারেনি আয়ার ক্রুর মতো নিষ্ঠুর জেনারেল। এরপর ব্রিটিশদের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক অনুসারীর দেয়া তথ্য মতে তিলকাকে নিরস্ত্র অবস্থায় পেয়ে তাকে প্রচলিত আইনে বিচার না করে পাঁচটা ঘোড়ার পিছনে বেধে টানা হলো পুরো ভাগলপুর। তিলকা মাঝির বিদ্রোহের পর কেটে যায় আরো ৮টি দশক। কোম্পানির শত অত্যাচার সহ্য করেও মুখ বুঝে সহ্য করে গেছে এই বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী, দেখা মিলেনি তেমন কোনো সাহসী যোদ্ধার। ততদিনে বৃটিশদের সাথে দেশি মুনাফাখোর, সুদখোর মহাজনীদের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে রমরমা। ১৭৯৩ সাল লর্ড কর্নওয়ালিশের ভুমি সংস্কার ব্যবস্থাপনায় প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাঁদের প্রাচীন স্থানান্তর চাষ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৮ সনে মহাজনদের অত্যাচারে সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা দামিন ই কোহ এলাকার তিনটি গ্রামের সাঁওতালরা পরিবারসহ পালাতে বাধ্য হয়। অত্যাচারের এই অবর্ণীয় অবস্থা দেখে ভগনাডির নারায়ন মুরমুর চার ছেলে ছেলে সিধু কানহু, চাঁদ ও ভৈরব প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। সিধু কানহু, চাঁদ ও ভৈরব সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির জন্য বৃটিশরাজ ও তাদের দোসর মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিলেন। সাঁওতাল আদিবাসীসহ মুক্তিকামী জনতার মাঝে সাঁওতাল বিদ্রোহের এই দুই বরপুত্র সিধু ও কানুর আহ্বান এমনভাবে সঞ্চারিত হলো যে তারা মানসিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এরপর সিদ্ধান্ত অনুসারে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে ৪০/৫০ জন সাঁওতাল যুবকদের নিয়ে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে পড়েন ও এক পর্যায়ে বিদ্রোহী সিধু কানুর সশস্ত্র দল ঘটনাস্থলে বৃটিশ পুলিশের সদস্য দারোগা মহেশ এবং মানিক রায় নামের একজন সুদখোর মহাজনকে হত্যা করে। এ ঘটনার পর ভাগলপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় দ্রোহের আগুন লেলিহান শিখার মতো চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং আরো মহাজনসহ শ্রেণি শত্রুরা সাঁওতালদের হাতে নিহত হতে শুরু করে। ১৮৫৫ সালের ১৭ই আগস্ট বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সাঁওতালেদের আত্মসমর্পনের জন্য আহ্বান তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে শতশত সাঁওতাল বিদ্রোহীদের হত্যা শুরু করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। সিধু কানুদের গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। কানু সঙ্গীদের নিয়ে পলায়নের সময় ১৮৫৫ সালের ৩০ নভেম্বর ধরা পড়েন। কানুর বিরুদ্ধে লুণ্ঠন, হত্যা, অত্যাচার ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে ১৮৫৬ সনে জানুয়ারি মাসে স্পেশাল কমিশনার ইলিয়টের এজলাসে

বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। কোম্পানি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মেজর বারোস্কে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু পিরপৈন্তির কাছে বারোসের বাহিনী সাঁওতালরা ভৈরব ও চাঁদের নেতৃত্বে পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণ করে সর্বস্ব লুঠ করে গোলায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকুড়ের কুখ্যাত মহাজন দীনদয়ালকে হত্যা করে। ১৮৫৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল। বীরভূমের বহু এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বয়ং বড়লাট ডালহৌসি আসরে নামেন। পনেরো হাজারের বেশি সুশিক্ষিত সেনাদল পাঠানো হয়। জমিদার, মুর্শিদাবাদের নবাবরা সৈন্য, হাতি, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।

কোম্পানির বিশাল বাহিনী সাঁওতালদের গ্রামগুলি ওপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করে। বারহাইত বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ভগনাদিহিতে নিষ্ঠুরভাবে নিরাপরাধ সাঁওতাল শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধসহ বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রায় তেরোটা খন্ডযুদ্ধে বহু বিদ্রোহী সাঁওতাল বীরের মতো যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছিল। ভাগলপুরের যুদ্ধে চাঁদ ও ভৈরব প্রাণ দেন ।

সিধু, কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা পুনরায় মরণপণ লড়াই শুরু করে। ভাগলপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। সিধু ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো সিধু, কানুকে ধরিয়ে দেবার জন্য বিপুল অর্থমূল্যের পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কানু ধরা পড়েছিল ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে। কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাকী বিদ্রোহীদের হাতির পায়ে পিষে ফেলে বাঁ গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বহু বিদ্রোহী সাঁওতালকে গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এ বিদ্রোহে প্রায় ৩০ হাজার আদিবাসী প্রাণ। হারান। সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারত ভুভাগের ইতিহাসে এক অগ্নিঝড়া সোনালী ইতিহাস। এই বিদ্রোহ বৃটিশ সাম্রাজ্রবাদের বিরুদ্ধে প্রথম উচ্চারন প্রথম প্রতিবাদ। বৃটিশ শাসন শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দ্রোহের এই অগ্নিশিখা সে সময়ে বিহার,উড়িষ্যা এবং পূর্ববঙ্গের বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। মুলত সাঁওতাল বিদ্রোহই উপমহাদেশের মানুষের মনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আত্মঅধিকার চেতনা তৈরি করেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা বিদ্রোহ গড়ে তোলে। সাঁওতালদের মতে, ১৮৫৫

সালে সাঁওতালরা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল রাজস্বের চাপ, মহাজনি শোষণ, ব্যবসায়ীদের শোষণ, নীলকরদের শোষণ, সরকারি কর্মচারীদের, অত্যাচার রেল কর্মচারীদের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা ও অধিকার আদায়ের জন্য। ব্রিটিশদের পরিচালিত মিশনারীদের দিয়ে জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে এ রূপান্তর করার চেষ্টা সাধারন সাঁওতালদের যুদ্ধের জন্য ক্ষুব্ধ করে তোলে। অপরদিকে সিধু কানুর প্রবল জাত্যাভিমান ও সাঁওতাল জাতীয়তাবাদ ক্রান্তিকালে সাঁওতাল আদিবাসীদের মাঝে প্রবল আশার সঞ্চার করে। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশ সৈন্য ও তাঁদের দোসর ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর ও মহাজনদের বিভিন্ন নিয়মনীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। সাঁওতাল বিদ্রোহের সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হলেও বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের ক্ষুদ্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাদের বসবাসের জন্য রাজমহল ও দামিন-ই-কোহ এলাকাসহ বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত অংশ নিয়ে একজন ডেপুটি কমিশনারকে নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামের একটি নতুন স্বতন্ত্র সংরক্ষিত জেলা গঠন করে যেখানে কোম্পানির কোনো আইনবিধি কার্যকর হবে না বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সাঁওতাল পরগণায় পুলিশ বাহিনীর বদলে মাঝি পরগণাইত প্রভৃতি সাঁওতাল গোষ্ঠীপতিদের বিশেষ অধিকার ও বিচারিক ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকার স্বিকার করে নেয়া হয়। মহাজনদের দেওয়া সব ঋণ বাতিল হয় এবং সাঁওতালরা অর্জন করে জমির মালিকানা। শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারীদের প্রবেশাধিকার বন্ধ না হলেও মহাজনদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয় তিন বছরের জন্য, প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও বৃটিশরাজ তদের রাজস্ব আদায়ে কোনো পরিবর্তন আনেনি। সুসজ্জিত বৃটিশশক্তির বিরুদ্ধে দেশিয় তীর ধনুকের এই যুদ্ধসমুহ তিলকা মাঝি, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবদের সকল স্বপ্ন বা আত্মদানের উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও ভারত উপমহাদেশে তাঁদের আত্মদানের ফলে ঘটে যাওয়া বিদ্রোহই পরবর্তীতে ব্রিটিশবিরোধী সকল আন্দেলনের বীজ বুনে দেয়। ভারত উপমহাদেশ তার ২০০ বছরের পরাধীন কলোনিয়াল জীবন থেকে পায় স্বাধীনতার সুখের আস্বাদন।

বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্ম বা পতিতাবৃত্তি

দেলোয়ার হোসেন রংপুরী

নামকরণ

যৌনকর্মীদের আভিধানিকভাবে পতিতা, বেশ্যা, নটি, মাগী, রক্ষিতা, খানকি, ভ্রষ্টা, জারিণী, গণিকা, কুলটা, ছেনাল, দেহপসারিণী, বারবণিতা, কুম্ভদাসী, রূপজীবা, গণেরুকা, বারাঙ্গনা, বারবধূ, রূপোপজীবিনী, দেহোপজীবিনী, বারবিলাসিনী, হট্টবিলাসিনী, নগরবধূ, নটিনী, যৌনকর্মী ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এছাড়াও বন্ধকী, বারাঙ্গনাসহ পেশাদার যৌনকর্মীর বাংলায় প্রায় ৩০০টি প্রতিশব্দ আছে। যেহেতু প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে জীবিকা বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে সেহেতু আধুনিক যুগে এই পেশায় জড়িতদের আভিধানের কোনো হীন নামে অভিহিত না করে পেশাজীবী যৌনকর্মী বা পেশাদার যৌনকর্মী বলে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও 'যারা দারিদ্র, প্রতারণা, জবরদস্তি, অসহায়ত্ব এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার শিকার হয়ে অর্থ বা উপঢৌকনের বিনিময়ে যৌন কর্মকান্ডে লিপ্ত তথা নৈতিকতা পরিপন্থী পেশায় নিয়োজিত হয়' তাদের বাংলাদেশ সরকার 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়ে' হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

পেশার ইতিহাসঃ খ্রিস্টপর্ব ৩০০ সালে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যৌনকর্মীদের কথা উল্লেখ রয়েছে, যেখানে তাদের বার্ষিক আয় ১,০০০ পণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক রচনা বাৎস্যায়নের কামসূত্র অনুসারে প্রাচীনকালে যৌনকর্ম ছিলো একটি বিকশিত কলাবিদ্যা। রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি স্বীকৃত পেশা হলেও এটি সর্বদা সম্মানজনক পেশা ছিলো না। মহাভারতের উল্লেখ অনুসারে একজন যৌনকর্মী ভালো প্রকৃতির হলে পরজন্মে উচ্চতর জন্মগ্রহণ করতে পারেন। বৌদ্ধ ধর্মেও এই একই মত পোষণ করা হয়েছে। জৈন লেখক হেমচন্দ্রের লেখায় বলা হয়েছে 'রাজা নন্দ' যৌনকর্মীর গর্ভজাত এক নাপিতের সন্তান। বৌদ্ধ গ্রন্থেও আম্রপালি, সালাবতী, সামা, সুলমাসহ বিভিন্ন যৌনকর্মীর বর্ণনা পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি গ্রন্থে প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করেছেন যে দুর্গাপূজার সময়ে ব্যবহৃত দশ ধরণের মাটির মধ্যে পেশাদার যৌনকর্মীর বাড়ির দরজার মাটি অপরিহার্য, কারণ যৌনকর্মীরা এই সমাজকে নির্মল রাখেন। একসময়ে বাংলাদেশের বেদে নারীরা যৌনপেশায় নিযুক্ত ছিলেন, যদিও এখন তারা অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এ পেশায় আর নিযুক্ত হন না। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বাংলার স্বীকৃত পেশার তালিকা দিতে

গিয়ে শুঁড়ি ও বারবনিতার কথা বলেছেন।

ফিরে দেখা: সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে সুবাদার ইসলাম খাঁর (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) আমলে পূর্ব বাংলায় বাইজি বা তাওয়ায়েফ সংস্কৃতির প্রথম বিস্তার ঘটে। যারা নাচ-গান করতো তাদের কাঞ্চনী বলা হতো। বাইজিরা মনোরঞ্জন করতো মূলত খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, গজল ইত্যাদি গান এবং কত্থক ইত্যাদি নাচ পরিবেশন করে। সত্যেন সেনের তথ্যমতে, বাইজিরা গানের ভাব প্রকাশ করতো নাচের মুদ্রায় এবং হাত, মুখ, চোখ, নাক ও ঠোঁটের অভিব্যক্তিতে। তাদের এ আসর পরিচিত ছিল মেহিফল বা মুজরা নামে। আসরে বাইজিরা পেশওয়াজ, চুড়িদার পাজামা, ওড়না ও পায়ে চিকন ঘুঙুর পরতো। তাদের দেখাশোনা করা, বাজনা বাজানো এবং নতুন গ্রাহক জোগাড় করার জন্য থাকত নিজস্ব সফরদার। পরবর্তীতে ঢাকার নায়েব নাজিম নুসরাত জং (১৭৮৫-১৮২২খ্রি.), শামসুদ্দৌলা (১৮২২-১৮৩১খ্রি.), কামরুদ্দৌলা (১৮৩১-১৮৩৬ খ্রি.), এবং ঢাকার নবাব আবদুল গনি (১৮৪৬-১৮৯৬খ্রি.) ও খাজা আহসানুল্লাহর (১৮৯৬-১৯০১খ্রি.) সময় এই সংস্কৃতির আরো বিকাশ ঘটে। এসময়ে কলকাতা ও ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে আসা বাইজিদের অনেকে ঢাকায় থাকতে শুরু করে এবং শহরে স্থায়ী বাইজিপাড়াও গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যে বারবনিতাদের রন্ধন পারদর্শিতার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।

ঢাকায় মুজরা করতে আসা বাইজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মালকা জান (১০৬টি গজলের রচয়িতা বহুভাষী সঙ্গীতপ্রতিভা), গওহর জান (মালকা জানের মেয়ে, যিনি নাচের ফাঁকে পোশাক বদলানো প্রচলন করেছিলেন এবং কলকাতার ফ্যাশনে ব্যপক প্রভাব রেখেছিলেন), নূরজাহান, সিদ্ধেশ্বরী, জানকি বাই (ছাপ্পান ছুরি), জদ্দন বাই (মালকা জানের শিষ্যা ও ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নার্গিসের মা), কোহিনূর ও ইন্দুবালা। এদের মধ্যে গওহর জান (১৮৭৩-১৯২৯) ছিলেন উপমহাদেশে গ্রামোফোন রেকর্ডে কণ্ঠদানকারী প্রথম শিল্পী। হরিমতী গ্রমোফোন রেকর্ডে নজরুল গীতি গেয়ে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। আরেক বাইজি দেবী বাই ঢাকার প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র দ্য লাস্ট কিস-এ (১৯৩১) অভিনয় করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বাইজি খ্যাতি অর্জন করেছিলো তার মধ্যে ছিলো লখনৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলাবাদক মিঠুন খানের নাতি সাপান খানের স্ত্রী সুপনজান। ঢাকায় নবাব গণির দরবারে নিয়মিত মনোরঞ্জন করতো পিয়ারি বাই, হীরা বাই ও ওয়ামু

বাই। ঢাকার অন্য খ্যাতিমান বাইজিদের মধ্যে ছিলো বাতানি, জামুরাদ, পান্না, হিমানি, আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, কানী, আবছন প্রমুখ। এ ছাড়া কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসতো মালকাজান বুলবুলি, মালকাজান আগরওয়ালি, জানকী বাই, গহরজান, জদ্দন বাই, হরিমতী প্রমুখ। ১৮৭০ দশকে ঢাকার শাহবাগের বাগানবাড়িতে নবাব গণির আমন্ত্রণে মুশতারি বাই গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলো সেকালের প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আবদুল গফুর খান ও আবদুল গাফফার নাসকানকে। কলকাতায় তার গান মুগ্ধ করেছিলো রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে আর কাজী নজরুল ইসলামকে। রেডিওতে তার গান শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ঝুলন উৎসবের সময় ধনী বণিকদের বাড়িতে নিয়মিত মেহিফলের আয়োজন হতো। ১৮৭৫ সালে আবদুল গণির নবাবি খেতাবপ্রাপ্তির সময় থেকে উনবিংশ শতকের শেষ অবধি প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকারা শাহবাগের নবাবি প্রাসাদে নাচ-গান করে মনোরঞ্জন করতেন। তাঁদের নওয়াব এস্টেট থেকেই মাসিক বেতন দেওয়া হতো। হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকা পাঁচাস বারাস পেহলে নামক গ্রন্থে আন্নু, গান্নু ও নবাবিন নামে তিন বোনের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নবাবিন সবচেয়ে কমবয়স্কা ও সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন। এই তিন বোন ১৮৮০-এর দশকে ঢাকার নাটক মঞ্চায়নের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৮৮০-এর দশকে শাহবাগে এলাহীজান নামে আরেক বাইজির করুণ পরিণতির বর্ণনা করেছেন হাকিম হাবিবুর রহমান।

উনিশ শতকের পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে নদী তীরবর্তী শহর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে, যথেষ্ট মাত্রায় পেশাজীবী যৌনকর্মের প্রচলন ছিল। জেমস টেলরের আ স্কেচ অফ দা টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস অফ ঢাকা এবং ড. অশ্বিনী তাম্বের দা ইলুসিভ ইন্ট্রিগ: আ ট্রান্সন্যাশনাল ফেমিনিস্ট অ্যানালিসিস অফ ইউরোপিয়ান প্রস্টিটিউশন ইন কলোনিয়াল বোম্বে গ্রন্থ অনুসারে ভারতবর্ষ জুড়ে ইংরেজ সৈন্যদের ৬০% যৌনরোগে আক্রান্ত হবার পর ১৮৬৪ সালে প্রবর্তিত ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যৌনকর্মীদের নিবন্ধন শুরু হয়। ১৭৮৫ থেকে ১৮৩৫ সালের পর পর্যন্ত ঢাকায় সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পালন করা টেলরের তথ্য অনুসারে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেও ঢাকায় সংগঠিত যৌনকর্মের অস্তিত্ব ছিলো।

উনিশ শতকের শুরুতে বিত্তশালী সম্প্রদায় ও জমিদারশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় বাইজিবৃত্তি একটি লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছিল। ২২

নভেম্বর ১৯০৩ সালে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার তথ্যমতে, এক নর্তকীর নবজাত সন্তানের অন্নপ্রাশন উৎসবে খরচ হয়েছিল ২৫ হাজার টাকা, যখন এক মণ চালের দাম ছিল চার টাকা। ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালুর জন্য ১৮৭৪ সালে নওয়াব আবদুল গনির আহ্বানে সাড়া দিতে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন বাইজি রাজলক্ষ্মী ও আমিরজান। তারা ৫০০ টাকা করে দান করেছিলেন। আর্থিক সচ্ছলতার কারণে বাইজিদের উচ্চ সামাজিক অবস্থান থাকলেও সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতেন তারা। ত্রিপুরার মহারাজার রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ বাইজির নাম নূরজাহান। এ নূরজাহান ৪০-৪২ বছর বয়সে অবসর নিয়ে কুমিল্লার মাঝিগাছা গ্রামে মহারাজার দেয়া জমিতে বসবাস শুরু করেন। এ সময়ে তিনি মাঝিগাছা গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেও স্থানীয় মুসলমানরা 'নটির মসজিদে' নামাজ পড়তে রাজি হয়নি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিলসহ বেশ কিছু ভবন মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যেগুলোতে বাইজি নাচের ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত মুজরা হতো আহসান মঞ্জিলের রংমহল, ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে। পরবর্তীতে নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ইশরাত মঞ্জিল ভবনটি নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরে এ ভবনেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এটিকে সংস্করণ করে ঢাকার প্রথম আন্তর্জাতিক হোটেলে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে ভবনটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হিসেবে পরিচিত। একসময়ে এটি ছিলো ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ যা সাধারণ মানুষের কাছে পিজি হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল।

ড. আবুল আহসান চৌধুরী অবিদ্যার অন্তপুরঃ নিষিদ্ধ পল্লীর অন্তরঙ্গ কথ কতাগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন নিজের রোজনামচায় যৌনপল্লি যাবার কথা লিখেছেন। মরমি কবি হাসন রাজা আর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত যৌনপল্লি যেতেন। যৌনকর্মী সুকুমারী দত্ত মুগ্ধ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী নাট্য রচয়িতা এবং প্রথম নারী অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারের চারজন নারী অভিনেত্রীর একজন। তার মঞ্চ নাম ছিলো গোলাপ সুন্দরী। অপর তিনজন ছিলেন জগত্তারিণী, এলোকেশি ও শ্যামা।

পেশায় সবাই যৌনকর্মী। পরবর্তীতে তিনি সুকুমারী নামেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ও এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করেন।

বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তির হালহকিকত: বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি সামাজিকভাবে সবচেয়ে ঘৃণিত পেশা। বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্ম (পতিতাবৃত্তি) আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হলেও বৈধ। আইন অনুসারে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা আদালতে ঘোষণা দিয়ে পেশাদার যৌনকর্মে নিয়োজিত হতে পারেন। বিশ্বের স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি যেখানে ১৮ অথবা তারও বেশি বয়সের নারীদের জন্য পতিতাবৃত্তি বৈধ। তবে পেশাদার যৌনকর্মের ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে বৈরিভাব সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ, ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।' সংবিধানে পতিতাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত ও এই পেশা বন্ধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও আইনে ১৮ বছর বয়স হলে কোনো নারী আদালতে ঘোষণা দিয়ে পেশা হিসেবে যৌনকর্ম বেছে নিতে পারেন। বাংলাদেশ পৃথিবীর স্বল্পসংখ্যক দেশগুলোর একটি যেখানে পেশাদার যৌনকর্ম একই সাথে বৈধ এবং অবৈধ। টানবাজার ও নিমতলী যৌনপল্লি উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ১৯৯৯ সালে ১০০জন যৌনকর্মী বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সহায়তায় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করলে আদালত ২০০০ সালের রায়ে পেশাদার যৌনকর্ম বৈধ বলে ঘোষণা দেন। পিটিশনের রায়ে বলা হয়, নারী যৌনকর্মী অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের হলে এবং যৌন ব্যবসাই তার একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে তিনি বৈধভাবে এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রায়ে আরো বলা হয় যে, যৌনপল্লি উচ্ছেদের সরকারি উদ্যোগটি অবৈধ।

রাষ্ট্র বনাম বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (২০০০) মামলার এই রায়ে আরো বলা হয় যে জীবন ও জীবিকার স্বাধীনতা এবং আইনের সুরক্ষার সাংবিধানিক অধিকার যৌনকর্মীদের জন্যেও প্রযোজ্য এবং তাদের জীবিকার অধিকার হরণ করা বেআইনি। উচ্চ আদালত আরো বলেন যে, অনৈতিক কার্যক্রম দমন আইন ১৯৩৩ (যাকে পতিতা আইনও বলা হয়) এবং ১৮৬০-এর দন্ডবিধি অনুসারে যৌনপল্লি পরিচালনা ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌনকর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ হলেও পেশাদার যৌনকর্ম কোনো আইনেই নিষিদ্ধ নয়। তবে পেশাদার নারী যৌনকর্ম বৈধ হলেও পেশাদার পুরুষ যৌনকর্ম অবৈধ।

বাংলাদেশে সাধারণত তিন ধরণের যৌনকর্মী দেখা যায়ঃ হোটেলভিত্তিক, পার্ক ও উদ্যানে ভাসমান এবং যৌনপল্লিভিত্তিক। নানারকম বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্মীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পেশা গ্রহণের প্রধান কারণের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অবিবাহিতা তরুণীদের স্বল্প বেতনের চাকরির জন্য ক্রমবর্ধমান শহরমুখী অভিবাসন এবং পারিবারিক বিপর্যয়। বাংলাদেশের পেশাদার যৌনকর্মীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষিশ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, মৎস্যজীবী ইত্যাদি পরিবার থেকে আসে এবং বাকিরা অনেকেই আসে ক্ষুদ্র আয়ভুক্ত রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চালক, মাঝি ইত্যাদি পরিবার থেকে। বর্তমানে স্বচ্ছল পরিবারের নারীদেরও এ পেশায় দেখা যায়। ১৯০১ সালে সরকারি হিসাব মতে ঢাকা যৌনকর্মীর সংখ্যা ছিলো ২১৬৪। বাংলাদেশের স্থানীয় কিছু বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) হিসাবে মতে একুশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে প্রায় এক লাখ নিবন্ধিত যৌনকর্মী ছিল। ২০১৫-১৬ সালের সরকারি পরিসংখ্যান মোতাবেক বাংলাদেশে রয়েছেন এক লাখ দুই হাজারের মতো যৌনকর্মী। বাংলাদেশে যৌনকর্মীদের সংগঠন সেক্সওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ-এর হিসেবে ২০১৭ সালে সারা দেশে ২৫ হাজার ভাসমান এবং যৌনপল্লিগুলোতে ৭০ হাজার বৈধ যৌনকর্মী ছিল। তাদের তথ্য অনুসারে ২০২০ সালে তাদের তালিকায় ৬৫ হাজারেরও বেশি যৌনকর্মী থাকলেও দেশে মোট যৌনকর্মীর সংখ্যা এক লাখের বেশি। বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে নারী যৌনকর্মীর মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ বলেও ধারণা করা হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর হিসেব মতে ২০১৪ সালে যৌনকর্মীদের ৫ শতাংশ হোটেলে, ৪১ শতাংশ ভাসমান ও ৫৪ শতাংশ যৌনপল্লীতে অবস্থান করছিলেন।

ইউনিসেফ-এর হিসাবে পেশাদার যৌনকর্মে জড়িত রয়েছে প্রায় ১০ হাজার শিশু। বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণ-এর এক জরিপে বলা হয়েছে, পথশিশু বা টোকাইয়ের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪ লাখ, যাদের অর্ধেক থাকে ঢাকার রাস্তায়। রাস্তায় বসবাস করা মেয়েশিশুদের মধ্যে ১৯% বাধ্য হয়ে দেহ ব্যবসা করে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নীর তথ্য মতে, ২০১৪ সালে সারাদেশে অন্তত ২০ হাজার শিশুকন্যা রাস্তায় পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলো। সেক্সওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক-এর মতে বাংলাদেশের পেশাদার যৌনকর্মীদের অনেকের বয়সই ১৮ বছরের নিচে যাদের বড় একটি অংশকে জোর করে এই পেশায় নামানো হয়েছে। বিশ ও একুশ শতকে বেশ কিছু যৌনপল্লি উচ্ছেদ

করা হলেও ২০২০ সালে বাংলাদেশে ১৪টি নিবন্ধিত যৌনপল্লি ছিলো। পেশাদার নারী যৌনকর্ম বৈধ হলেও পেশাদার পুরুষ যৌনকর্ম অবৈধ, যদিও বিভিন্নস্থানে তার প্রচলন রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ যৌনকর্মী আছে যাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌনকর্মী রয়েছে বলে জানা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্ম সামাজিকভাবে সবচেয়ে ঘৃণিত পেশা। এ পেশায় জড়িতরা সামাজিকভাবে ঘন ঘন নিগ্রহের শিকার হন। প্রায়ই পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে হোটেলে বেআইনি পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে এবং পতিতা ও তাদের গ্রাহকদের উভয়কে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেয়। যৌনকর্মীদের অনেকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হলেও তেমন কোনো নাগরিক সুবিধা তাদের নেই। বয়স হয়ে গেলে তাদের অনেকেই নিদারুণ সমস্যায় পড়েন। এমনকি নির্বাচনের সময় তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করে আলাদা লাইনে আলাদাভাবে ভোট নেয়া হয়। একসময়ে যৌনকর্মীদের জুতা পরারও অনুমতি ছিলো না। প্রথাগতভাবে একজন যৌনকর্মীর মৃত্যুর পর কেবল তার সহকর্মীই তার দেহ স্পর্শ করতে পারে। তাকে কোনো সার্বজনীন কবরস্থানে দাফন করা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। এজন্যে সাধারণত তাদের মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলা অথবা নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতারা দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক কাজের অপরাধে যৌনকর্মীদের জানাজা পড়ানোর প্রবল বিরোধিতা করে আসছেন। ২০২০ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো দৌলতদিয়া পতিতালয়ের যৌনকর্মী হামিদা বেগমের মৃত্যুর পর এনজিও ও গোয়ালন্দ থানার সহায়তায় প্রচলিত রীতি ভেঙে ধর্মীয় রীতি মোতাবেক জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাজায় প্রায় ২০০ জন যোগ দিয়েছিলেন। পরে মিলাদ মাহফিল ও কুলখানিতে আরও ৪০০ জন যোগদান করেন। কিন্তু এই জানাজা পড়ানোর দায়ে দৌলতদিয়া রেলস্টেশন মসজিদের ইমাম গোলাম মোস্তফা সামাজিকভাবে নিগৃহীত হন ও পরবর্তীতে আরো কোনো যৌনকর্মীর জানাজা না পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তা সত্ত্বেও তিনি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে একই বছরের ২০ ও ২২ ফেব্রুয়ারি রিনা বেগম ও পারভীন নামের আরো দু'জন যৌনকর্মীর জানাজা পড়ান।

বাংলাদেশের যৌনকর্মীরা অত্যন্ত দরিদ্র সামাজিক অবস্থার শিকার। বাংলাদেশের যৌনপল্লিগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার সরকারি উদ্যোগ নেই। এগুলোতে পায়াকট বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের

উদ্যোগে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। বাইরের কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে যৌনকর্মীদের নিজেদের প্রকৃত নাম-পরিচয় গোপন রাখতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর আরো শিক্ষার জন্য যৌনকর্মীদের সন্তানদের তেমন কোনো সুযোগ নেই। পতিতালয় বহির্ভূত বিদ্যালয়ে তাদের ভর্তি নিতে চায় না। সন্তানদের স্কুলে ভর্তি, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, ব্যাংক হিসাব খোলা, মৃত্যুসনদ সংগ্রহ বা বিকল্প পেশায় যোগদান করতে গেলে পরিচয়পত্রে পতিতালয় লেখা থাকায় সমাজের মানুষেরা যৌনকর্মীদের নিচু নজরে দেখে বলে জাতীয় পরিচয়পত্রে দৌলতদিয়া যৌনপল্লির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে যৌনকর্মীসহ স্থানীয় প্রায় সাড়ে ৫ হাজার অধিবাসী ' দৌলতদিয়া পতিতালয়'-এর বদলে 'দৌলতদিয়া বাজার পূর্বপাড়া'-র বাসিন্দা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

যৌনপল্লিঃ বাংলাদেশে পেশাদার যৌনকর্ম আইনগতভাবে বৈধ হলেও যৌনকর্ম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যৌনকর্মীদের নাম নিবন্ধন করে তাদের সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বসবাসের এই জায়গাগুলোকে নটিপাড়া, বেশ্যাপাড়া, মাগীপাড়া বা নিষিদ্ধপল্লী বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণত জনবহুল শহর কিম্বা ব্যবসাকেন্দ্রের আশেপাশে এসব যৌনপল্লি গড়ে ওঠে। সভ্যতার আদিতে নৌপথেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নদী বা সাগরতীরে গড়ে ওঠে বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র, নৌবন্দর, শহর বা গঞ্জ। আর এসব জনবহুল শহর কিম্বা ব্যবসাকেন্দ্রের আশেপাশে গড়ে ওঠে যৌনপল্লি। একসময় এদেশের অধিকাংশ শহর ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে 'নিষিদ্ধপল্লি' নামের প্রায় শতাধিক যৌনপল্লির অস্তিত্ব ছিল। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবেও এগুলোকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে আস্তে আস্তে জনমত গড়ে ওঠে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম লীগ নেতাদের উদ্যোগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যৌনপল্লি উচ্ছেদের হিড়িক পড়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে ঢাকার কুমারটুলি, গঙ্গাজলি ও পাটুয়াটুলি, নারায়ণগঞ্জের টানবাজার, মাগুরা, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, ফুলতলা, রংপুর, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর যৌনপল্লিসহ বেশ কিছু যৌনপল্লি উচ্ছেদ করা হয়েছে। এরমধ্যে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার, ঢাকার ইংলিশ রোড, মাদারীপুর, খুলনার ফুলতলা এবং টাঙ্গাইল যৌনপল্লির যৌনকর্মীদের মারপিট ও নির্যাতন করে এক রাতের মধ্যে উচ্ছেদ করা হয়।

সেক্সওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক-এর দেয়া তথ্য অনুসারে ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে ঢাকার তিনটি যৌনপল্লি কুমারটুলি, গঙ্গাজলি ও পাটুয়াটুলি

উচ্ছেদ করা হয়। পরে একে একে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার (১৯৯৯ খ্রি.), মাগুরা (২০০৩ খ্রি.), মাদারীপুর (২০১৩ খ্রি.), টাঙ্গাইল (২০১৪ খ্রি.) ও ফুলতলা যৌনপল্লি (২০১৫খ্রি.) উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকিতে আছে জামালপুর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর সিঅ্যান্ডবি ঘাট ও রথখোলা এবং বাগেরহাট যৌনপল্লি। এছাড়াও জামালপুর, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর সিএন্ডবি ঘাট, রথখোলা ও বাগেরহাট যৌনপল্লি একাধিকবার উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বানিশান্তা সহ বাংলাদেশের আরো কয়েকটি যৌনপল্লি উচ্ছেদের হুমকির মুখে রয়েছে।

রাজনৈতিক দলাদলির কারণেও যৌনপল্লি উচ্ছেদের মুখে পড়ে। শুধু স্বাধীন বাংলাদেশেই নয়, স্বাধীনতার আগে চট্টগ্রামে জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি রফিক উদ্দীন ছিদ্দিকী আর সাধারণ সম্পাদক ফজলুল কাদের চৌধুরীর মধ্যে দ্বন্দ্বে জয়লাভ করতে ফজলুল কাদের চৌধুরী স্থানীয় মুসলমানদের নিয়ে রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকার যৌনপল্লিটি উচ্ছেদ করেন যাতে রফিক উদ্দীন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন বলে জানা যায়। এদিকে অভিযোগ রয়েছে যে কান্দুপট্টিতে ছাত্রনেতা তিব্বত, বানিশান্তায় শ্রমিক নেতা আইউব এবং টানবাজারে যৌনকর্মী জেসমিন হত্যাও হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ১৯৮৫ সালে অপ্রাপ্তবয়স্কা শবমেহের হত্যাকে কেন্দ্র করে টানবাজার যৌনপল্লি উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে অভিযান বিফল হয়। এরপর তৎকালীন দুটি রাজনৈতিক দল (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয় পার্টি) টানবাজার যৌনপল্লি থেকে চাঁদা তোলা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের এ বিরোধের অংশ হিসেবে ১৯৯১ সালের অক্টোবরে টানবাজার যৌনপল্লি উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও বিফল হয়। একপক্ষের অভিযোগ রয়েছে যে যৌনপল্লির জমি দখল করতেই ধর্মের কথা তুলে যৌনপল্লি উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ করা যৌনপল্লিগুলোর মধ্যে কয়েকটি যৌনপল্লি বর্তমানে বহুতল বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কয়েকটি যৌনপল্লি আইনি লড়াইয়ের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি অনুমোদনে নিবন্ধিত পতিতালয় বা যৌনপল্লির সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে ৭টি যৌনপল্লি রয়েছে ঢাকা বিভাগে, ৬টি খুলনা বিভাগে ও একটি রয়েছে বরিশাল বিভাগে। দৌলতদিয়া যৌনপল্লি, কান্দুপট্টি, টানবাজার যৌনপল্লি, সন্ধ্যাবাজার যৌনপল্লি ও গাঙ্গিনাপাড় যৌনপল্লির পাশাপাশি চট্টগ্রামের সদরঘাটের বিলুপ্ত যৌনপল্লিটি বাংলাদেশের অন্যতম নামকরা যৌনপল্লি। ২০২০ সালে বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের

কারণে অবরুদ্ধকরণ-এর সময়ে বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ১১টি যৌনপল্লিতে খাদ্য ও অর্থসাহায্য দিয়েছে।

জেলা ভিত্তিক অনুমোদিত যৌনপল্লি:

খুলনা জেলা: খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা যৌনপল্লিতে রয়েছে প্রায় ৯০ জন যৌনকর্মী। তাছাড়াও ২০২০ সালে এখানে থাকতো ৬৫ জন শিশু ও ৭০ জন পুরুষ। একশ' বছরের বেশি আগে মোংলা সমুদ্রবন্দর-এর কাছে পশুর নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌনপল্লিটি। ২০১৯ সালে এ যৌনপল্লিতে অবস্থানরত ৫০ শিশুকে স্কুলগামী করতে তাদের জামাকাপড়, শিক্ষা উপকরণ ও প্রতি মাসে নগদ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। বানিশান্তা ঢাংমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যৌনপল্লির মায়েদের সমাবেশ হয়েছে শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে। ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান-এর আঘাতে এ যৌনপল্লির অধিকাংশ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

যশোর জেলা: যশোর শহরে যৌনপল্লির ইতিহাস ৫০০ বছরের পুরনো। মোগল সম্রাট আকবর-এর সময় থেকেই যৌনপল্লি ছিল জমজমাট। ব্রিটিশ যুগে সেখানে তিনটি যৌনপল্লি ছিল। কলকাতা থেকে নিয়মিত জমিদার মন্মথ নাথ রায় যেতেন ফূর্তি করতে। জানা যায় তার জন্যে যৌনকর্মী যেতো চাঁচড়ার রায় পাড়ার ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে। বর্তমানে যশোর শহরে ঝালাইপট্টি ও মারওয়াড়ি মন্দির এলাকায় দু'টি যৌনপল্লিতে প্রায় ১২০জন যৌনকর্মী আছে।

বাগেরহাট জেলা: বাগেরহাট শহরে ঘোষপট্টির কাছের যৌনপল্লিতে থাকে প্রায় ৪০ জন যৌনকর্মী। ২০২০ সালে এখানে ছিল তাদের ৪৪ জন সন্তান।

রাজবাড়ি জেলা: দৌলতদিয়া ঘাটের যৌনপল্লিটি দেশের মধ্যে বৃহত্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম যৌনপল্লি। এটি পৃথিবীর বড় কয়েকটি পতিতালয়ের মধ্যে একটি। বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু সেখানে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার খদ্দেরকে খুশি করতে নিয়োজিত থাকে। এখানে প্রায় ১,৫০০ জন নিবন্ধিত যৌনকর্মী রয়েছে। ১৯৮৮ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত বলা হলেও দৌলতদিয়ায় বহুকাল আগে থেকেই পেশাদার যৌনকর্মের প্রচলন ছিলো।

ফরিদপুর জেলা: ফরিদপুর শহরের হাজী শরিয়তুল্লাহ বাজার সংলগ্ন রথখোলা যৌনপল্লি এবং ডিক্রীরচর ইউনিয়ন-এর সিএন্ডবি ঘাট যৌনপল্লিতে সরকারি হিসাবে প্রায় ৩০০ যৌনকর্মী রয়েছে। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যাটি দ্বিগুণও হতে পারে।

পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালীর যৌনপল্লিতে প্রায় ২০০ ঘর আছে। ২০২০ সালে সেখানে ১৩০জন যৌনকর্মী এবং মাসি ও শিশুসহ মোট ২০০ লোকের

বসবাস ছিল।

টাঙ্গাইল জেলা: টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হেমনগর বাজারে একসময়ে ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ বাইজিপল্লি। রসিকরা সেখানে শুধু কামপ্রবৃত্তি নয়, গুণি বাইজির গান ও নাচের আসর উপভোগের জন্য যেতো। বর্তমানে টাঙ্গাইল শহরের কান্দাপাড়া যৌনপল্লি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম যৌনপল্লি। একবার উচ্ছেদ হওয়া টাঙ্গাইল যৌনপল্লি পুনরায় চালু করার আন্দোলন হয়েছে। পুনরায় চালু হবার পর এখানে ৮০০ জন নিবন্ধিত যৌনকর্মী রয়েছে। লাঠি নিয়ে যৌনপল্লিটি পাহারা নিরাপত্তা দেয়।

ময়মনসিংহ জেলা: ময়মনসিংহের গাঙ্গিনাপাড়ে ব্রিটিশ আমলের পুরনো যৌনপল্লিটিতে প্রায় ৩০০ যৌনকর্মী আছে। তাছাড়াও ২০২০ সালে গাঙ্গিনাপাড় যৌনপল্লিতে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাসহ ১০টি বাড়িতে যৌনকর্মীদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় এক হাজার মানুষ বসবাস করত বলে জানা গেছে।

জামালপুর জেলা: জামালপুরের রাণীগঞ্জ যৌনপল্লিতে ২০২০ সালে সরকারি হিসেবে ৯৭ জন সক্রিয় যৌনকর্মী, ৫০ জন বৃদ্ধা ও ২ জন পাহারাদার ছিল। বেসরকারি হিসেবে ছিল দু'শতাধিক যৌনকর্মী। পল্লীর নয়টি বাড়িতে ১৭৪টি ঘর রয়েছে যার প্রতিটিতে একজন করে যৌনকর্মী অবস্থান করে।

চট্টগ্রাম জেলা: কর্ণফুলী নদী তীরে প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো চট্টগ্রামের সাহেবপাড়ার যৌনপল্লি। এককালে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যৌনপল্লি ছিল বর্তমান রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকায়, বাজারটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেড় থেকে দুই হাজার যৌনকর্মী ছিলো সেখানে। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই নাবিকেরা জাহাজ থেকে নেমে খোঁজ করতেন যৌনপল্লিটির। পাকিস্তানি আমলে উচ্ছেদ হওয়া যৌনপল্লিটি পরবর্তীতে বন্দরের কাছে মাঝির ঘাটে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অবশ্য সেটাও উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা: ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে যৌনপল্লির মধ্যে গঙ্গাজলি ও সাঁচিবন্দর ছিল বিখ্যাত। ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলীর মোড় থেকে ওয়াইজঘাট নামে যে পথটি বুড়িগঙ্গার দিকে চলে গেছে তার নাম একসময়ে ছিল গঙ্গাজলি। নাট্যকার সাঈদ আহমেদ লিখেছেন যে মহেশ ভট্টাচার্যের হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের কাছে কালীমন্দিরের উল্টোদিকে গঙ্গাজলি ছিল দোতলা প্রশস্ত বাড়ি। নিচতলায় থাকতো বাইজিদের কাজের লোকেরা। বাইজিরা থাকত বাঁকওয়ালা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। বাইজিদের খাস কামরা সাজানো থাকত শানশওকতে। তাতে ছিলো ফরাশ বিছানো। ঘর আর বারান্দায় পাতা

থাকত ইজিচেয়ার। গঙ্গাজলির অধিকাংশ বাইজি ছিলো বৈষ্ণব। প্রতিদিন সকালে দলবেঁধে বুড়িগঙ্গায় স্নান সেরে তাদের বুকে গামছা জড়িয়ে কোমরে পিতলের কলসি নিয়ে সিক্তবসনে দলবেঁধে রাস্তাদিয়ে ফিরে আসার বর্ণনা দিয়েছেন সাঈদ আহমেদ এবং শিল্পী পরিতোষ সেন। ১৯৮০ সাল থেকে ঢাকার কুমারটুলি, গঙ্গাজলি ও পাটুয়াটুলি যৌনপল্লি উচ্ছেদ করা হয়েছে। ঢাকা শহরে কান্দুপট্টি ও ইংলিশ রোডেও যৌনপল্লি ছিল।

নারায়ণগঞ্জ জেলাঃ নৌবন্দর নারায়ণগঞ্জে টানবাজারে ছিল বড় একটি যৌনপল্লি ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান টানবাজার থেকে যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করলে তারা ছড়িয়ে পড়েন শহরের রাস্তায় রাস্তায়। আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিলেন তারা। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই যৌনপল্লিটি ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের নিমতলা যৌনপল্লিও একই সময়ে উচ্ছেদ করা হয়।

১৯৮৫ সালে টানবাজার যৌনপল্লির দৌলতখান ভবনে নরসিংদীর এক গ্রামের ১২-১৩ বছরের মেয়ে শবমেহেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করতে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অত্যাচার করে মৃতপ্রায় অবস্থায় টানবাজারের বাইরে রাস্তায় ফেলে রেখেছিলেন অভিযুক্ত মালিক মমতাজ মিয়া এবং দালাল সর্দারনি। তাকে রাস্তার মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ-এ নিয়ে যাবার পর সেখানে ৩৫ নং ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি সারাদেশের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগায়। তার মৃত্যু নিয়ে লেখক ইমদাদুল হক মিলন টোপ উপন্যাস লেখেন, এবং কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর লেখা গানে কণ্ঠ দেন শিল্পী ফকির আলমগীর। জাহানারা আরজুর কবিতা "শবমেহের তোমার জন্য" অবলম্বনে শবমেহের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ইসমাইল হোসেন।

কুমিল্লা জেলাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে সমবেত বিপুল সংখ্যক বিদেশি সৈন্যের প্রয়োজনে কুমিল্লা শহরের ছোট যৌনপল্লির পাশাপশি দাউদকান্দির গৌরিপুর বাজারের পাশে আরেকটি যৌনপল্লি স্থাপন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশকে মানব পাচারের একটি অন্যতম উৎস, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে যৌনপল্লিগুলো নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি যৌনপল্লিকে ঘিরে জোর করে যৌনকর্মী বানানোর একটি চক্র সক্রিয় থাকে। চক্রটি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের সেখানে এনে বিক্রি করে দেয়। বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে প্রতিজন নারীকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। এছাড়াও যৌনপল্লিগুলো

থেকে অনেক নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়। এখানকার মেয়েদের ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার করা হয়, যাদের অধিকাংশই পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। একাধিক দাতব্যসংস্থা তাদের অনুসন্ধানে এসব যৌনপলল্লিতে সাত বছরের শিশুকেও যৌনকর্মী হিসেবে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এমন প্রমাণ পেয়েছে। কিশোরীদের শরীর বড় করার জন্য ট্যাবলেট খাওয়ানোর ঘটনাও ঘটে। যৌনপল্লিগুলো মাদক সেবনের বা মাদক ব্যবসার নিরাপদ স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পায়াকট বাংলাদেশের মতে যৌনকর্মীদের মধ্যে নিরাপদ যৌনতা বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যের অভাব থাকায় এ যৌনপল্লিগুলোতে এইচআইভি/এইডস, সিফিলিস এবং গনোরিয়ার মতো যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে যা জনস্বাস্থ্যকে ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বেসরকারি সংস্থা অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানুর তথ্য অনুসারে, এসব যৌনপল্লিতে যৌনকর্মে নিযুক্ত শিশুকন্যারা হতাশা, মাদকাসক্তি, বিভিন্ন যৌনরোগ, অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতি ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ পতিতাবৃত্তিকে সমর্থন করে না। পতিতাবৃত্তিকে জঘন্য অপরাধ ও পাপকর্ম হিসেবে ঘৃণা করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. কে এম এ আজিজ, 'যৌনকর্মী' বাংলাপিডিয়া

২. অনুপম হায়াৎ, 'বাঈজী' বাংলাপিডিয়া

৩. রানা চক্রবর্তী, 'পতিতাবৃত্তির উৎস সন্ধানে', লিটলম্যাগ, ১৮ এপ্রিল, ২০২০

৪. মোঃ আসিফুর রহমান ভূঁইয়া, 'প্রাচীন এক মসজিদ, অথচ নামাজ হয়নি কোনদিন', দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

৫. রাজবাড়ি প্রতিনিধি, প্রথা ভেঙ্গে তৃতীয়বারের মতো যৌনকর্মীর জানাজা সম্পন্ন, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

৬. Havocscope। "Number of Prostitutes in Bangladesh – Havocscope"

বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায়- মেথর

জয়ন্তদেব

মেথর বা সুইপার যাদের আধুনিক নাম বলা হয়ে থাকে পরিচ্ছন্ন কর্মী। এই সম্প্রদায় সমাজের মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে অবস্থান। এই দলিত সম্প্রদায় ভারতের উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, থেকে অবিভক্ত পাকভারতের সময় বাংলাদেশে আগমন ঘটে। মূলত: দলিত সম্প্রদায় সমাজের মুল স্রোত থেকে জীবনযাপন আলাদা ও যথেষ্ট বিছিন্ন। তাদের জীব-যাত্রারমান, জীবিকানির্বাহ, সমাজে চলাচল ও আলাদা। এই শ্রেণির ভেতর মুচি, ডোম, মালো বাদক, মেথর, রজদাস, রাজবংশী, কৈবত্য কলু, নাপিত এই সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালি দলিত বা অস্পৃশ্য বোঝায়। উল্লেখিত সম্প্রদায় ব্যতিত যেমন: চর্মকার, মালাকার, কামার, কুমার, জেলে, পাটনী, কায়পুত্র, কলু, কোল, কাহার, পাত্র, ভগবানীয়া, মানতা, মাহাতো, কর্মকার, শব্দকর, সন্ন্যাসী, হাজরা প্রভৃতি সম্প্রদায় সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার। দলিত শব্দের দ্বারা ভারত-এর এমন কিছু জাতিগত গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা সচরাচর নিপীড়িত এবং অনগ্রসর জাতিরূপে চিহ্নিত। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় দলিত শব্দের অর্থ হচ্ছে ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন। দলিতদের অনেকে হিন্দু ধর্মের চারি বর্ণ ব্যবস্থা থেকে আলাদা বলে। দলিতদের বেশিরভাগ বর্তমানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

'হরিজন' শব্দটি কমবেশি আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। যাদের সহজ বাংলায় মেথর বা সুইপার বলা হয়, কাগুজে ভাষায় তারাই হরিজন। অবশ্য ব্যাপক অর্থে শুধু মেথর-সুইপার নন, ডোম অর্থাৎ যারা অপঘাতে মৃতব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাটাছেঁড়া করেন, তারাও হরিজন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের হিন্দু সমাজে জাত-পাত-বর্ণ প্রথা একটা সময় ছিলো ভয়ংকর চেহারায়। কর্মের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য নিদারুণ কঠোর অবস্থানে চলে গিয়েছিলো। যারা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করতেন, মেথর হিসেবে তারা ছিলেন ঘৃণার পাত্র। চন্ডাল বলে একটি শ্রেণি আবির্ভূত হয়েছিলো, যাদের কাজ ছিলো গলিত-পঁচা-বেওয়ারিশ লাশ পরিষ্কার ও স্থানান্তর করা। এক সময়ে মহাত্মা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী ঘোষণা করেন, যেহেতু ঈশ্বর পবিত্রতা পছন্দ করেন, তাই এই মানুষগুলো ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। তাদের মাঝেই দেবতা বিদ্যমান, সেজন্য তারা হরিজন। হরি যে জন। বাংলাদেশের আলোচ্য হরিজন সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস করেন প্রায় প্রতিটা জেলায় ও শহরে। এদেশে তাদের প্রথম আগমন

ঘটেছিলো রেলওয়ের মাধ্যমে এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যাল শহর হবার পরে এই সম্প্রদায়কে পরিচ্ছন্ন করা, আবাসিক এলাকার বাসাবাড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করা, রেললাইনে কাটা পড়া মরদেহ সরানো ইত্যাদি কাজের জন্য উড়িষ্যা থেকেই মূলতঃ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আনা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একই পেশায় নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের। পৌরসভাসমূহে কাজ পান তারা। বছরের পর বছর একই পেশায় যুক্ত থাকার কারণে তাদের মধ্যে একটি ধারণা জন্মে যায় যে, তাদের পেশাই আসলে এটা। তারা জাত সুইপার, জাত মেথর, জাত ঝাড়ুদার, জাত ডোম। অন্য কোনো পেশায় প্রবেশের সুযোগও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের জন্য সীমিত ছিলো। একদিকে শিক্ষার অনগ্রসরতা, আরেক দিকে অন্য পেশায় কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের না নেওয়ার কারণে সুইপার-মেথর-ডোমরা একই পেশায় পড়ে থেকেছেন বহু বছর। গত কয়েক বছরে অবশ্য এই ধারা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। হরিজন সম্প্রদায়ের সন্তানরা লেখাপড়া শিখছেন, বিভিন্ন পেশায় যাচ্ছেন। হরিজন ও দলিতরা কর্ম ও পেশার ভিত্তিতে নির্ধারিত সম্প্রদায়। রাস্তা পরিচ্ছন্নতার কাজ, নর্দমা পরিষ্কার, মশক নিধন ইত্যাদি কাজ করেন তারা। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এরা সকলেই প্রচলিত অর্থে হরিজন নন। অনেক বাঙালি এবং ইসলাম ধর্মানুসারীও থাকেন এখানে যারা বগুড়া পৌরসভায় পূর্বোল্লিখিত পেশায় যুক্ত। এখানকার সুইপার-মেথর-ঝাড়ুদাররা কেউ চাকরি করেন বাংলাদেশ রেলওয়েতে, কেউ বগুড়া পৌরসভায়, কেউ অন্য কোনো বড় সরকারী প্রতিষ্ঠানে। চাকরি করেন না এমন কিছু সুইপার মেথর-ঝাড়ুদারও থাকেন এখানে। রোজ সকালে ঝাঁটা আর বালতি হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন তারা। বাসা-বাড়িতে কাজ পেলে তাদের রোজগার হয়। নতুবা নেই। মানুষের শৌচাগার সাফ করেন তারা, অথচ তাদের শৌচকাজের সুবিধা অতি অপ্রতুল। আলাপ হলো দুই তরুণের সাথে, যারা রোজ সকালে বালতি-ঝাঁটা হাতে কাজের সন্ধানে বের হন। সপ্তাহের ছয়দিন ভাত আর সবজি জোটে, রোজগার ভালো হলে মাসে দুই বা তিনদিন মাছ-ডিম-মাংস রান্না হয়। তবে যারা চাকরি করেন, তারা যে বেতন পান, সেটা একেবারে মন্দ নয়, আবার বর্তমান বাজারদর অনুপাতে পর্যাপ্তও নয়। বগুড়া পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীর তিন ধরনের ভাগ রয়েছে। একটি স্থায়ী, যারা পৌরসভায় স্থায়ী কর্মচারি। সপ্তাহে তারা ছুটিও ভোগ করেন। আর রয়েছে মাস্টার রোল এবং আউটসোর্সিঙের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত। এরা কোনো ছুটি পান না। সকাল ছয়টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত এক দলের ডিউটি থাকলেও

অমানবিক ব্যাপার হলো, মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ডিউটি করা একদল কর্মীও আছেন। যেখানে বাস করতেন ডোম পেশায় যুক্ত মানুষরা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাদের ঘরবাড়িগুলো নিজের উপার্জন থেকে পাকা দালানঘর করেছে। হরিজনদের ডোমরাই অপঘাতে বা অস্বাভাবিকভাবে মৃ তব্যক্তির শরীর কেটে ময়না তদন্তের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির কাজে সহযোগিতা করা। কোনো ডোম তার পেশার কারণে মদ পান করলেও তা প্রকাশ্যে নয়, এবং মাতলামির ঘটনাও ঘটেনা। যদিও এর উল্টো ঘটনা দেখা গেছে সুইপার-মেথরদের পাড়ায়। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত এই অংশটিই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি করেন। তাঁরা এই কাজ না করলে সমাজের 'ভদ্রলোকেরা' কেউ সমাজে বসবাস করতেই পারতো না। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের অন্য নাগরিকদের মত সমমর্যাদা নিশ্চিত করা দরকার। পাশাপাশি সমাজের মানুষগুলোকের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একটা সময় ছিলো, যখন মেথররা আলাদা থালা ও গ্লাস-কাপ নিয়ে রেস্টুরেন্টে যেতেন, সেখানে সেই পাত্রে খাবার-পানি-চা ঢেলে দেওয়া হতো, রেস্টুরেন্টের বাইরে মাটিতে বসে তারা খেতেন। এই অমানবিক নিষ্ঠুর নিয়মটি অবশ্য এখন কমে গেছে অনেকাংশে।

বগুড়া শহরে চারটি হরিজন পল্লী রয়েছে। হাসপাতাল নিকট হরিজন আবাসিক এলাকায় তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, হাসপাতাল পরিষ্কার ও লাশ কাটার কাজ তাদের। সিংহভাগ ছেলেরা অনিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করছে। তাদের মূল কাজ ছিল সে সময় সার্ভিস ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা যা বর্তমানে বিলুপ্ত, ফলে কাজের পরিধি হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা জীবনের সিংহভাগ ঝরে যায়। অপর কলোনীগুলো রয়েছে চকসুতরাপুর হরিজন কলোনী, শিববাটি ও রেলওয়ে হরিজন কলোনী। সব কলোনীতে আলাপ করে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পঞ্চম শ্রেণি অব্দি পড়ালেখা করে। মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যন্ত এবং সম্মান শ্রেণিতে পড়াশুনা নিতান্ত কম। শিক্ষা গ্রহনের ক্ষিত্রে এ সম্প্রদায়র ছেলে মেয়েরা নিজেদের পদবী পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। সামাজিকভাবে এখনো কেহ কেহ ছি:ছি; করে, বিদ্রুপ করে। তবে সে অবস্থা আগের চেয়ে কমে গেছে। তাদের বর্তমান কাজের সূত্র প্রধানত বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো বাড়ি স্যুয়েলেজ লাইন পরিস্কার করা এই কাজের জন্য তারা সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকে। সরকারী অনুদান অনিয়মিত যা জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি নগন্য। তারা জানায়, পরিচ্ছন্নকর্মী হিসাবে এখন অন্য

সম্প্রদায়ের লোক করছে ফলে তাদের কাজের পরিধি কমে যায়। একটি দুটি করে পাকা ঘর যা সদস্য তুলনায় কম।

তাদের নিয়মিত পুজা হয়। নিত্যপূজার ভেতর রয়েছে কালীপূজা আর বাৎসরিক দূর্গা পূজা হয়। পূজায় ব্যক্তিগত চাঁদা ও কমিশনারবৃন্দ আর্থিক সহায়তা করে থাকে। পূজাতে কমবেশী সবাই নতুন জামা পরিধান করে নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী। শূকরের মাংস তাদের প্রধান খাবার তবে সম্প্রতি এই প্রাণি বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে। খাসী ও মুরগীর মাংস কোন কোন পরিবার খায় বলে জানা গেল। তাদের বিবাহ রীতি হিন্দুবিবাহ প্রথা অনুসরণ করা হয় এবং বিবাহে চুয়ানী বা বাংলা মদ সাধ্যমত উপহার বা আচার/প্রথা হিসাবে রয়েছে বাধ্যতামূলক।

বর্তমানে বদলে গেছে সমাজ বাস্তবতার চিত্র। তাদের কাজে এখন অন্য সম্প্রদায়ের লোক যুক্ত হচ্ছে ফলে তাদের আগামী ভবিষ্যত ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছে অনেকে। সমাজে তাদের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারী উদ্দ্যোগ আবশ্যক নইলে তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।